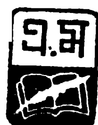
নেপাল পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Nepal Parva
(*A Bengali Travelogue*)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীসুধীর মৈত্র
স্কেচ ও মানচিত্র লেখকের আঁকা
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

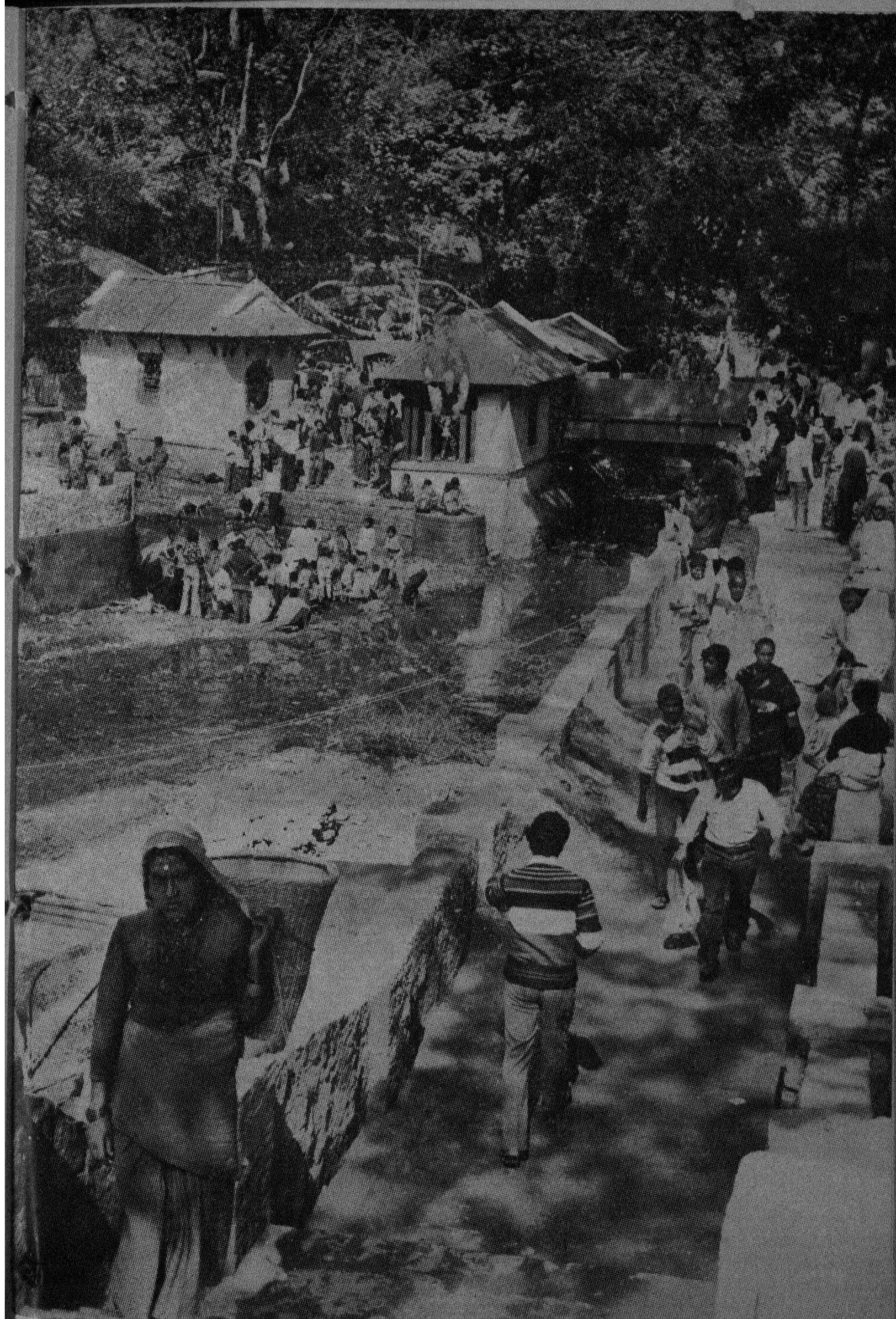
শ্রীবিমল মিত্র

বন্ধুবরেষু

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্ ।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥

—অথর্ব বেদ, ১।৬।৩

অমৃতময় হোক আমার ইহজীবন,
পরজীবনও হোক অমৃতময় ।
যেন অমৃতময় হয় আমার কথা,
আমি যেন নিজেও হতে পারি অমৃতময়

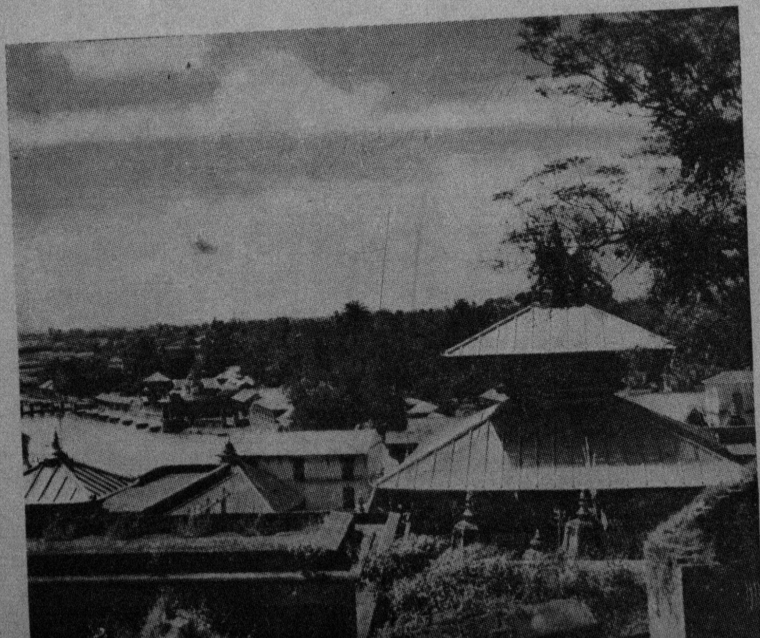


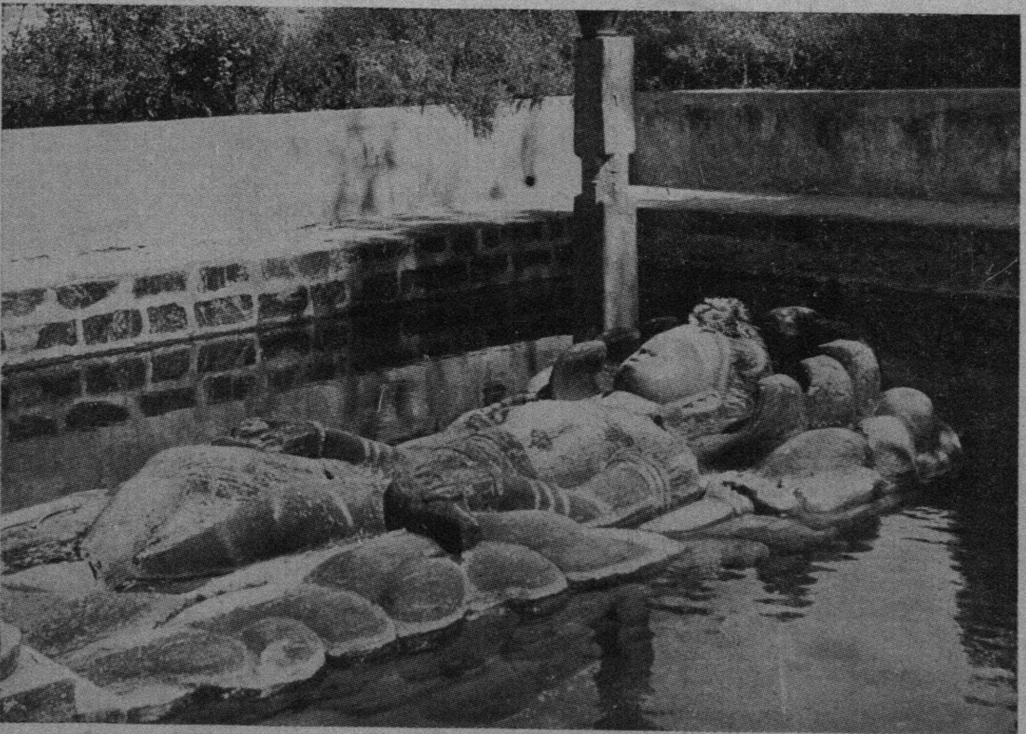
দক্ষিণ কালীর মন্দির

ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

উপরে—স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির প্রাঙ্গন, নিচে—পশুপতিনাথের মন্দির

ফটো—লেখক





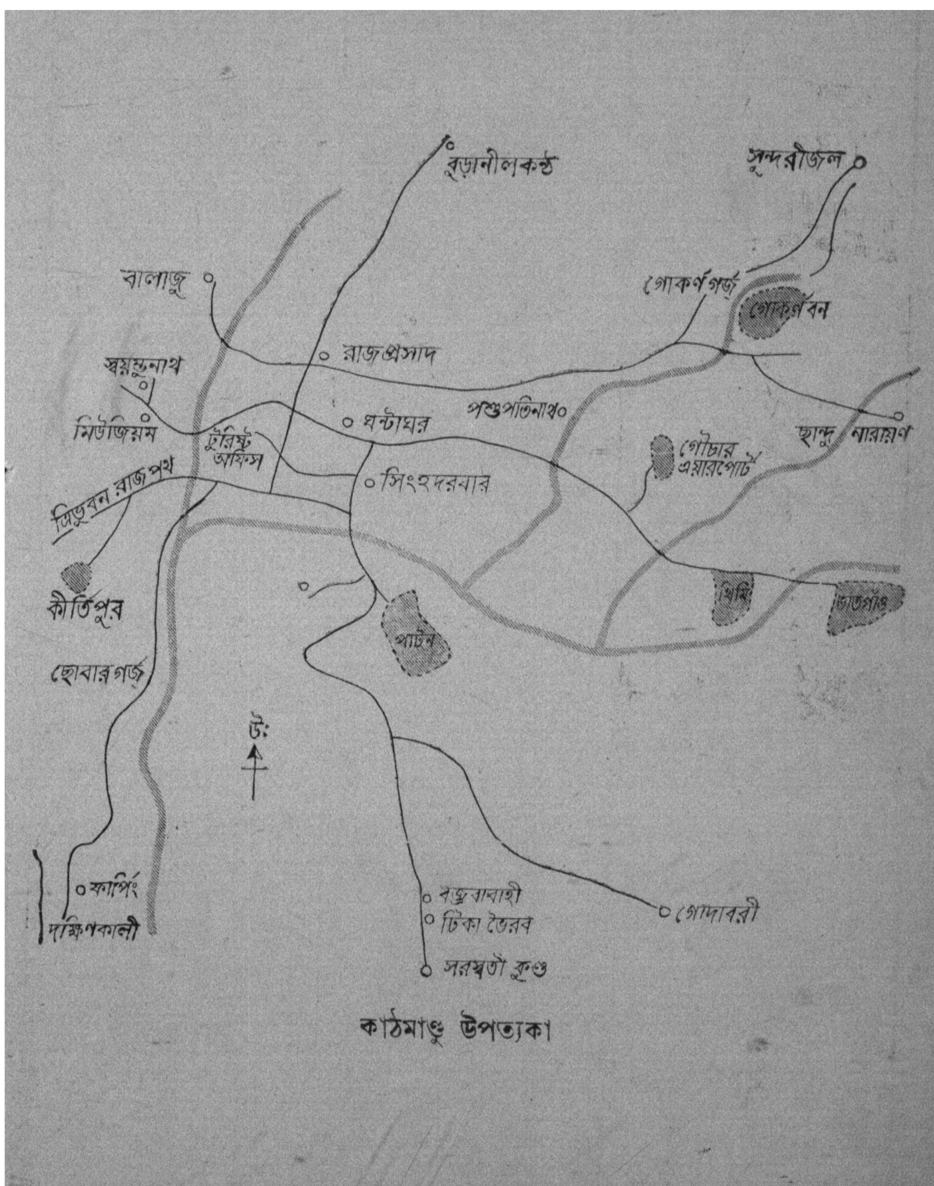
বুড়া নীললণ্ঠ ফটো—লেখক

উপরে—স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির শিখর
নিচে—হনুমান ঢোকার নিকটে সব্জির দোকান ফটো—লেখক

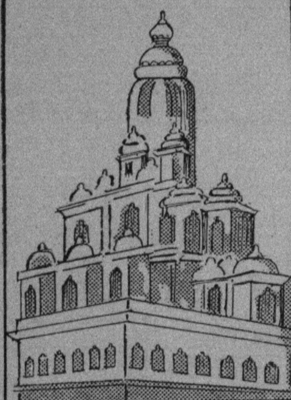


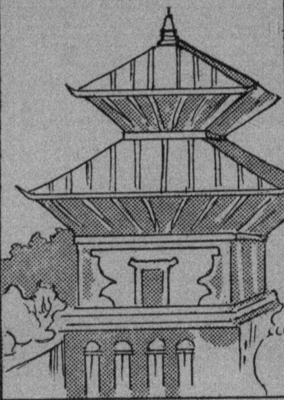


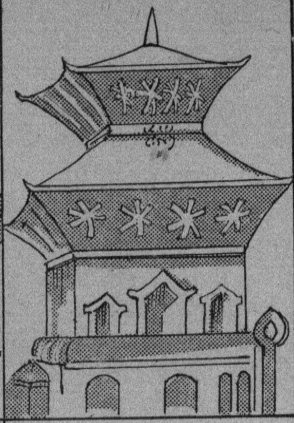
র—পোখরা থেকে অন্নপূর্ণা ও মচ্ছপুছরে শৃঙ্গ, নীচে—পোখরা উপত্যকায় ফেওয়াতাল
ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র


বুড়ানীলকণ্ঠ
সুন্দরীজল
বালাজু
গোকর্ণগর্জ
গোকর্ণবন
রাজপ্রসাদ
স্বয়ম্ভুনাথ
পশুপতিনাথ
ঘন্টাঘর
মিউজিয়ম
টুরিষ্ট অফিস
ছান্দু নারায়ণ
গৌচার এয়ারপোর্ট
সিংহদরবার
ত্রিভুবন রাজপথ
থিমি
ভাতগাঁও
কীর্তিপুর
পাটন
ছোবারগর্জ
উঃ
ফার্পিং
বজ্রবারাহী
টিকা ভৈরব
গোদাবরী
দক্ষিণকালী
সরস্বতী কুণ্ড

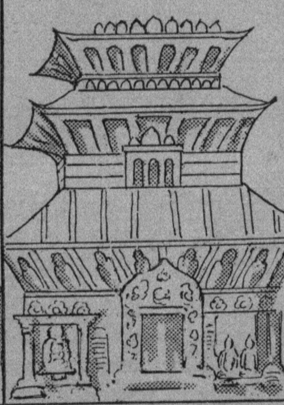
কাঠমাণ্ডু উপত্যকা

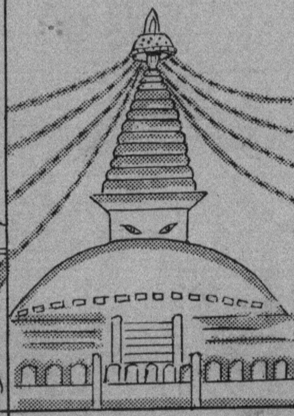


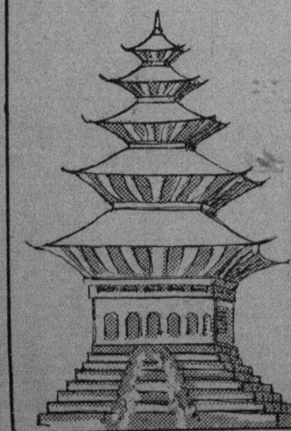




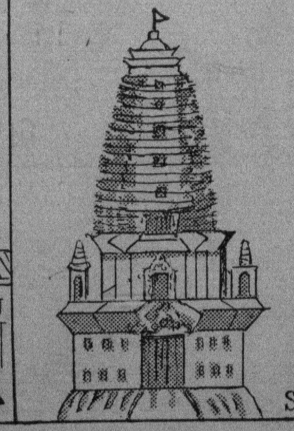












কৃষ্ণ মন্দির পশুপতিনাথ ছাঙ্গু নারায়ণ

স্বয়ম্ভুনাথ হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার বোধনাথ

হনুমান ঢোকা মহাবৌদ্ধ

১

অনেক সময়েই জীবনে এমন সুযোগ এসে যায় যা আগে থেকে ভাবা যায় না। এ রকম সুযোগ যে আসতে পারে, তা কল্পনা করাও যায় না অনেক সময়েই। শৈশবে শুনেছিলুম যে সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। একবার তা হারালে সে সুযোগ আর ফিরে আসে না, তার জন্যে পস্তাতে হয় সারা জীবন। ঠিক এই ভাবেই এসেছিল আমার নেপাল ভ্রমণের অভাবনীয় সুযোগ। দ্বিধা ছিল, সঙ্কোচ ছিল, অসুবিধাও ছিল নানা রকমের। অর্থের অভাবও ছিল একটা বড় অন্তরায়। তবু আমার ভবঘুরে মন এই সুযোগ হারাতে চায় নি অবহেলা করে। সৌজন্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আপত্তির পর রাজী হয়ে গিয়েছিলুম ভ্রমণেরই দুরন্ত আগ্রহে।

কিন্তু এই নেপাল ভ্রমণের কথা এত দিন আমি সযত্নে গোপন রেখেছিলুম। শুধু গোপন রাখা নয়, এমন কথা বলেছিলুম যা মিথ্যা বলার মতোই গর্হিত। মগধ যাত্রার প্রাক্‌কালে বলেছিলুম যে বড়-দিনের ছুটির পর ফিরেছিলুম পুরী থেকে, তার পর আর কোথাও বের হই নি। পূজোর ছুটির জন্যে যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম, তখন আমার গণৎকার বন্ধু মনোরঞ্জন এসেছিল যাত্রার বার্তা নিয়ে।

এই কথা বলেই কি আমি বোঝাতে চাই নি যে বড়দিনের পর পুরী থেকে ফেরার পরে পূজো পর্যন্ত আমি আর কোথাও বের হই নি? এ তো শুধু বলা নয়, ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেছে এই কথা। এখন অস্বীকার করবার কোন পথ নেই। যা বলেছি তা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু কেন এমন করেছি, তার কোন কারণ আজ খুঁজে পাচ্ছি না।

শিবরাত্রির দিন কয়েক আগেই আমি নেপাল যাত্রা করেছিলুম।

আর কয়েক দিন পরেই এসেছিলুম ফিরে। কিন্তু এই নেপাল ভ্রমণের কথা গোপন রাখবার উদ্দেশেই যে মিথ্যা বলেছিলুম, তাতে আজ আমার কোন সন্দেহ নেই। কেন লুকিয়ে ছিলুম, তার কারণ ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে মনে একটা লজ্জা বোধ ছিল প্রচ্ছন্ন অবস্থায়। ভেবেছিলুম যে এই ভ্রমণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে হয়তো কোন কেলেঙ্কারির কথাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। সেদিনের সেই ঘটনাকে কেলেঙ্কারি ভেবেছিলুম কেন, তা মনে নেই। সব মানুষেরই একটা আত্মাভিমান আছে, তা তার কাছে সত্যের চেয়েও বড়। তাই তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে সে মিথ্যা দিয়েও সেই সত্যকে আড়াল করতে চায়। পাছে কেউ জেনে ফেলে বা সন্দেহ করার সুযোগ পায়, তাই সত্য গোপন করেও ক্ষান্ত হয় না, এমন ভাবে মিথ্যা বলে যে সত্য নির্ণয়ের আর কোন অবকাশই থাকে না। আমিও বোধহয় তাই করেছিলুম। কতকটা অকারণেই মিথ্যা বলেছিলুম।

মিথ্যা ভাষণে যে সব সময়ে দোষ হয় না, মহাভারতের সেই কথা মনে পড়ছে। যুধিষ্ঠির একদিন অর্জুনকে বলেছিলেন তাঁর গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করতে। মনে মনে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে কেউ তাঁকে এই রকমের অপমান করলে তাঁকে তিনি বধ করবেন। তাই সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অর্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলেন। সামনে ছিলেন কৃষ্ণ, তিনি অর্জুনকে ভৎর্সনা করে বললেন, যেখানে মিথ্যা সত্যের মতো হিতকর ও সত্য মিথ্যার মতো অহিতকর, সেখানে সত্য না বলে মিথ্যা বলাই উচিত।—

বিবাহকালে রতি সম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্ব ধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

কিন্তু আমার বেলায় এই নিয়ম খাটে না। বিবাহ কাল, রতি সম্প্রয়োগ, প্রাণ সংশয়, সর্বস্ব নাশের আশঙ্কা বা কোন বিপ্রের জন্য

আমি মিথ্যা বলি নি। এই পাঁচ রকমের কোন একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

মহাভারতেই দানব রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার মুখেও আমরা একই রকমের একটি শ্লোক পেয়েছি। নিজের কর্ম দোষে তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর দাসী হয়েছিলেন। দেবযানী চন্দ্রবংশের রাজা যযাতিকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন এবং যযাতি দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা ও দাসীদেরও এনেছিলেন নিজের কাছে। শর্মিষ্ঠাকে রেখেছিলেন অশোক বনে। সখী দেবযানীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে দেখে শর্মিষ্ঠা ভাবলেন যে তাঁর পতি নেই এবং তিনি বৃথাই যৌবনবতী হয়েছেন। তাই তিনি স্থির করলেন যে তিনিও নিজে পতি বরণ করবেন। এক দিন অশোক বনে রাজা যযাতিকে দেখে তিনি প্রেম নিবেদন করলেন স্পষ্ট ভাষায়। যযাতি বললেন, তুমি যে সব বিষয়ে অনিন্দিতা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায় আহ্বান করতে শুক্রাচার্যের নিষেধ আছে। এই কথার উত্তরেই শর্মিষ্ঠা বললেন, মহারাজ, পরিহাসে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহ কালে, প্রাণ সংশয়ে ও সর্বনাশের আশঙ্কায়—এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।—

> ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
> ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
> প্রাণাত্যয়ে সর্ব-ধনাপহারে
> পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

কিন্তু আমি কার মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করেছিলুম? যার কাছে আমার লজ্জা পাবার কথা, তার কাছে তো সবার আগে সব কথাই আমি স্বীকার করব ভেবেছিলুম। করেছিলুমও তাই। আর তারই আন্তরিক আগ্রহে এই নেপাল ভ্রমণের কথা আজ লিখতে উদ্যত হয়েছি।

এইটুকুই আমার এই ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা।

২

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি, তখন আচমকা একটা ডাক শুনে থমকে দাঁড়াতে হল। হাওড়া থেকে উত্তর-পাড়ায় এসেছিলুম ট্রেনে, তারপর হেঁটে বাড়ি ফিরছিলুম। কী ভাবছিলুম মনে পড়ছে না, তবে একটু অন্যমনস্ক ছিলুম নিশ্চয়ই। তাই ডাক শুনে চমকে উঠেছিলুম।

সামনেই হারানিধির চায়ের দোকান। যে ছেলেটা রোজ ভোর-বেলায় আমাকে চা দিয়ে যায়, সেই ছেলেটাই বলে উঠেছিল : ঐ যে, বাবু আসছে।

পরক্ষণেই শুনেছিলুম একটা পরিচিত গলার ডাক : একটু দাঁড়া গোপাল, আমি আসছি।

চেয়ে দেখলুম, আমার স্কুলের বন্ধু বিনয়। হারানিধির দোকানে বসে চা খাচ্ছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে। দু তিনটে চুমুকে চায়ের গেলাস শেষ করেই জিজ্ঞেস করল : কত হয়েছে ?

আমি তার হাত ধরে টেনে আনলুম, আর হারানিধির দিকে চেয়ে বললুম : আমার অ্যাকাউণ্টে।

বিনয় আপত্তি করে বলল : না না, তুই পয়সা দিবি কেন ?

হেসে বললুম : আর তোকে চা খাওয়াতে হবে না বলে।

বাড়ি পৌঁছে দরজার তালা খুলে বাতি জ্বাললুম। দিনের বেলাতেও আলো কম। এখন তো অন্ধকার নামছে। এই অন্ধকারের ভয়েই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার চেষ্টা করি। ঘরে বাতি জ্বালতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তা না হলে নানা রকমের ভয়, অসুবিধাও অনেক। সবই অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে।

বিনয় আমার অগোছাল সংসারটা দেখে নিল এক নজরে, তারপর বলল : সবই সেই রকম আছে দেখছি।

বললুম : বদলাবাব মতো তো কোন কারণ ঘটে নি !

বিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : হুঁ।

আমি এই দীর্ঘশ্বাসের অর্থ বুঝি। সে আমাকে জানে। আমার অবস্থাও জানে। এই নিয়ে আলোচনাও করেছিল। তার ধারণা, দোষটা আমারই। দেশে আমাব মতো রোজগার করে অনেকেই, কিন্তু আমাব মতো নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কেউ করে না। আমার চেয়েও নিঃস্ব ব্যক্তিব সংখ্যা দেশে কম নয়, কিন্তু তারাও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসাব করে। সংসারে অভাবটা বড় নয়, স্বভাবের দোষেই অভাব বড় হয়ে ওঠে জীবনযাত্রায়। তাই আমার এই অবস্থার জন্যে সে আমাকেই দায়ী করে। দুঃখও পায় আমার জন্যে। আজও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার অফিসের থলেটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেই বিনয় বলল : তুই নাকি একটা বই লিখেছিস ?

কে বলল তোকে ?

শুনলুম।

আমাকে নীরবে থাকতে দেখে বলল : কিছু পেয়েছিস, না নিজের পয়সাই জলে গেছে ?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। কোন উত্তর না দিয়ে বললুম: আমার কথা থাক, তুই তোর নিজের কথা বল্। মাসিমা কেমন আছেন ?

বিনয় বলল : মাকে মজঃফরপুরের ট্রেনে তুলে দিয়ে তোর কাছে এলাম।

মাসিমা একা গেলেন ?

না, একা নয়। বড় মাসিমা এসেছিলেন, মাকে নিয়ে গেলেন।

বিনয়কে অনেকগুলো প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারলুম।

তার মাসতুতো বোন মাধবীর বিয়ে হচ্ছে মজঃফরপুরে, তাই তার মাসিমা বড় ছেলে হাবুলকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন গয়না কিনতে। বিনয়ের মাকে নিয়ে গেলেন। বিনয় পরে যাবে। বিয়ের দু একদিন আগে পৌঁছলেই তার চলবে। বিনয় বলল : তোর কাছে এসেছি কেন জানিস ?

কেন ?

তোরও নিমন্ত্রণ আছে। বড় মাসি তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।

আমাকে আবার কেন ?

তোকে না-ই বা কেন ? মা তো কথায় কথায় বলে, গোপালের মা নেই, আমরা না দেখলে ওকে দেখবে কে !

বিনয়ের মা সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন। এ পাড়ায় যখন ছিলেন, তখন তাঁর হাতের রান্না অনেক খেয়েছি। সেই সময়েই আলাপ হয়েছে বড় মাসির সঙ্গে, মাধবী ও হাবুলদার সঙ্গেও। এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবার পরেও তাঁরা আমাকে মনে রেখেছেন। তাই মাঝে মাঝে যেতে হয় তাঁদের কাছে। মাঝে মাঝে না গেলে অনেক অভিযোগ শুনতে হয়। তাই বিনয়ের কথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

কিন্তু আমার বাধা ছিল নানা রকমের। তার মধ্যে টাকার টানা-টানিটাই সবচেয়ে বড় বাধা। পুরীতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। সে ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারি নি। ছুটি পাওনা নেই। অফিস কামাই করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, মাইনে কাটা যায়। তার ওপর নিজের কাজ। থিসিসের কাজ শেষ করেও পুরোপুরি শেষ করতে পারছি না। গাইড রাগ করছেন, দেরির জন্যে তাঁর কাছেও কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। আর দেরি করব না বলে কথা দিয়েছি তাঁকে। তিনি চান না যে সারা জীবন আমি কেরানীগিরি করি। কোন কলেজে চাকরির জন্যে এখন থেকেই দরখাস্ত করতে বলছেন। এই সব

কথা ভেবে বললুম : না ভাই, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিনয় রেগে উঠে বলল : কেন সম্ভব নয় শুনি। তোর এখন রাজকার্যটা কী ?

বললুম : রাজকার্য হলে বাধা ছিল না. বাধা কেরানীর কাজ বলেই। এক কথায়, চাকরিটা চলে যেতে পারে।

চাকরিটা গেলেই তুই বেঁচে যাবি।

কেন ?

সারা জীবন কেরানীগিরি করবি বলেই কি তুই এম. এ. পাস করেছিলি ! কেন যে মবতে এই কাজ করছিস তা আমরা বুঝি না।

হেসে বললুম : ভাল কিছু পেলে কি এই কাজ করতুম ! তোদের মতো হোমবা-চোমরা হয়ে বসতুম কোন—

বিনয় বাধা দিয়ে বলল : থাক আব বলতে হবে না। আমি তোর আপত্তি শুনতে আসি নি, এসেছি নোটিশ দিতে। আগামী শনিবার যাত্রার জন্যে তৈবি হয়েই অফিসে যাবি। বিকেল সাড়ে চারটেয় হাওড়া থেকে নর্থ বিহার এক্সপ্রেস ধরতে হবে। মা এই ট্রেনেই গেলেন, পৌঁছবেন ভোর সাড়ে ছটায়। আমি দুখানা টিকিট কেটে রাখব।

অনুনয় করে বললুম ; ভাববার একটু সময় দিবি না ?

সময় আবার কিসের জন্যে ?

আমি পয়সার কথা ভাবছিলুম। কিন্তু বন্ধুকে সে কথা বলা যায় না। বন্ধুর কাছে অভাবের কথা বললে বন্ধু বিচ্ছেদ হতে পাবে, আত্মীয় বিচ্ছেদ তো অনিবার্য হয়ে ওঠে। যার অভাব আছে পয়সার, সে আমাদের সভ্য সমাজে অস্পৃশ্য, তার ছায়া মাড়াতে আতঙ্ক হয় আত্মীয়-বন্ধুর। তাই তাঁদের কাছে সুকৌশলে গোপন করতে হয় নিজের অভাবের কথা। তাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে আত্মীয়তা ও বন্ধুতা। কাবুলিওয়ালার মতো অনাত্মীয়ই আমাদের মতো দরিদ্রের বন্ধু। তার কাছে হাত পাততে আমাদের লজ্জা নেই, লজ্জা নেই উপেক্ষা বা

অপমানেও। বিনয় আমার বন্ধু বলেই তাকে আমার অভাবেব কথা বলতে পারলুম না। বললুম : আমি ছুটির কথা ভাবছিলুম -

বিনয় বলল : তোদের আবার ছুটির ভাবনা কিরে! আমি তোকে একখানা মেডিকেল সার্টিফিকেট যোগাড় করে দেব।

আমি জানি যে সবাই এই রকমই ভাবে। দায়িত্বহীন চাকবিব আবার ছুটির ভাবনা কী! অফিসে না গেলেই ছুটি, তাব নাম ফ্রেঞ্চ্ লীভ। আর মেডিকেল সার্টিফিকেট দিলে তো কথাই নেই, স্বয়ং ভগবানও আর মাইনে কাটতে পাববে না। তবু আমি ইতস্তত করছি দেখে বলল : বড় মাসি বলেছে, গোরখপুব থেকে রাঙা মাসি আসবে নীরাকে নিয়ে। আমাদের বাড়িতে নীরাকে দেখেছিস তো! এই বছর বি. এ. পাস করেছে, আর আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। এখন দেখলে নাকি চোখ ফেরাতে পারবি না।

আমার বুকের ভেতর থেকে একটা বেদনা ঠেলে উঠল। কিন্তু বিনয়কে আমি কিছু বলতে পারলুম না। বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিলুম আমি। সে কথা বুঝতে পেরেছি দেরিতে। এই জন্যেই তো বড়দিনের সময়ে পুরীতে পালিয়ে গিয়েছিলুম। এখনও আত্মগোপন করে আছি। আর আমি নতুন করে নিজেকে জড়াতে চাই নে। তাই হাসবার চেষ্টা করে বললুম : তোরা তো আমাকে চিনিস বিনয়, আমাকে এ সবের ভেতর জড়াস নে।

বিনয় একটুও বিচলিত হল না, বলল : হাবুলদা কী বলেছে জানিস?

কী?

তোকে নেপালের লোভ দেখাতে বলেছে। মজঃফরপুর আর নেপাল হল কলকাতা আর বালিগঞ্জের মতো। না, বালিগঞ্জ নয়, এই ধর্—কী বলব? বারাসত, কিংবা গঙ্গাসাগর বলতে পারিস। আর সামনেই তো শিবরাত্রি! এখন আর পাসপোর্ট ভিসা, এমনকি কোন

আইডেনটিটিরও দরকার হবে না। পশুপতিনাথের যাত্রা বললেই নেপাল রাজ্যের দরজা খোলা।

আমি চমকে উঠলুম এই কথা শুনে। ভ্রমণের নেশা আমার বুকের রক্তে সহসা দোল দিয়ে গেল। মুখের কোন পরিবর্তন এল কিনা জানি না, বিনয় বলে উঠল : হাবুলদা দেখছি ঠিকই বলেছে। তাহলে ঐ কথাই রইল। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটের ট্রেন, আধঘণ্টা আগেই তোর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দেখা হবে। ঠিক আছে?

বলে বিনয় উঠে দাঁড়াল।

আমি না বলতে পারলুম না, বললুম : নেপালের লোভ তো দেখাচ্ছিস, কিন্তু ব্যবস্থা হবে তো?

বিনয় বলল : আলবাৎ হবে। আমরা রোববার পৌছব। বিয়ে সোমবার। মঙ্গলবারই আমরা নেপালের পথে। কাঠমাণ্ডু না দেখে ফিরব না, এই কথা রইল। হাবুলদাই সব ব্যবস্থা করবে বলেছে।

বিনয়কে আমি স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলুম।

৩

ঘবে আমার মন টিঁকল না। মুক্তির আনন্দে পাখা মেলেছে মন। মুক্তি এই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নেই, মুক্তি আছে উদার অসীম আকাশের নিচে। সেই আকাশ নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে মানুষকে ঘর ছাড়া করে। অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে যে শান্তি পাওয়া যায় না, তা আছে প্রকৃতির অকৃপণ দানে। সেই দান গ্রহণ করে মানুষ ধনী হয় না, হয় বৈরাগীর মতো শান্ত সুখের অধিকারী। সংসারের মানদণ্ডে নিঃস্ব হয়েও সে ভোগের বাসনায় নির্লিপ্ত। ত্যাগেই সে সব কিছু ভোগ করে। ঘরেব বাইবে আমি সেই ভোগের রূপ দেখি, মুক্তির মধ্যে পাই আনন্দের সন্ধান। ঘবের দরজা বন্ধ করে আবার আমি বেরিয়ে পড়লুম।

না, নিরুদ্দেশের পথে নয়, অনির্দিষ্ট কালের জন্যও নয়। সোজা চলে এলুম আমাদের লাইব্রেরিব মুকুন্দবাবুর কাছে। এই কয়েক দিনে নেপাল সম্বন্ধে কিছু পড়ে ফেলব। পুরনো ও নতুন বই যদি কিছু থাকে সব। কিন্তু মুকুন্দবাবু আমাকে হতাশ করলেন। বললেন: পয়সার অভাবে নতুন বই অনেক দিন কেনা হয় নি, আর পুরনো বইও কিছু নেই। তবে বিশ্বকোষে নেই, এমন কথা তো হতে পারে না। বিশ্বকোষে নেপাল শব্দটাই আগে পড়ে দেখুন। তারপর ভারতকোষ। হিমালয়ান কিংডম নামে একখানা চটি ইংরেজী বইও আছে। তাতে নেপাল ভুটান ও সিকিমের কথা। ভূগোল আর ইতিহাস আপনার জানা হয়ে যাবে।

এই জন্যেই মুকুন্দবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ বা কার্ড রাখার দরকার হয় না। তিনিই সব। তাঁর কাছেই

সব জানা যায়। মুকুন্দবাবুরা আছেন বলেই আমরা এখনও করে খাচ্ছি। তাঁরা না থাকলে আমরা কার কাছে যাব জানি না।

এই বিশ্বকোষ থেকে আমি কত কথা জেনেছি তার শেষ নেই। বাইশ খণ্ডের এই কোষ গ্রন্থ রচনার কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে বাইশটি সংখ্যায় সম্পূর্ণ এর প্রথম খণ্ডে অ বর্ণটি প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলন করেছিলেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এর পর আ বর্ণের তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এই গ্রন্থের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তার পর বিশ্বকোষ প্রকাশের ভার যিনি পান, তাঁর নাম নগেন্দ্রনাথ বসু। বোধহয় তাঁর বয়স তখন উনিশ বৎসর। এই গ্রন্থেরই মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন যে লক্ষপতির ঘরে জন্মগ্রহণ করে আদরে লালিত পালিত হলেও চোদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তাঁকে দারিদ্র্যের নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এই সব কাজ যখন তিনি আরম্ভ করেন, তখন তাঁর রীতিমতো অন্নের সংস্থান ছিল না, অনেক সময়ে দুবেলা অন্নও জুটত না। অর্থাভাব ও নানা অসুবিধায় তাঁকে সাহায্য করবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ থেকে চল্লিশ বৎসর ধরে এই বিরাট গ্রন্থ তিনি বাইশ খণ্ডে সতেরো হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশ শেষ করেছেন। প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি করে কলম এবং একটি কলমেই এ কালের একটি পৃষ্ঠা হতে পারত। সম্পাদকের নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হতে হয়। ভবিষ্যতের জন্যই তাঁরা এই অমানুষিক পরিশ্রম করে গেছেন।

বিশ্বকোষের দশম খণ্ডে নেপাল ষন্দ আছে আটান্ন পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ একশো ষোল কলমে। এই উপাদান দিয়ে একখানা ছোটখাট বই হতে পারত। সব কথা পড়তে আমার অনেক সময় লাগবে। তাই আমি তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেলুম।

এতে নেপাল নামের উৎপত্তির কথা আছে। হিমালয়ের যে অংশে গোর্খা জাতির বাস, তিব্বতী ও অহিন্দু পার্বত্য জাতির ভাষায় তার

নাম পাল দেশ। তিব্বতী ভাষায় পাল শব্দের অর্থ পশম। এখানে প্রচুর ছাগলোম পাওয়া যেত বলেই এই নাম হয়েছিল। নে শব্দেরও একটি অর্থ আছে। চৈন-ভারতীয় ভাষায় নে শব্দের অর্থ পবিত্র গুহা বা দেবতার উদ্দেশে রক্ষিত পীঠ বা পবিত্র স্থান। লেপচারা এই রাজ্যের পূর্বাংশ ও সিকিমকে নে বলত। অনেকে বলেন যে পাল দেশের যে অংশে নেবার জাতির বাস ছিল, তারই নাম ছিল নে, আর এই নে দেশে বাস করত বলেই এখানকার অধিবাসীদের বলা হত নেবার। নেবার জাতির লামারাই প্রথমে বৌদ্ধ মত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নামেই এই দেশের নেপাল নাম হয়েছে। নেপাল নাম তখন সমগ্র দেশের ছিল না, কাঠমাণ্ডু উপত্যকারই নাম ছিল নেপাল। পরে এই রাজ্যের নামই নেপাল হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৬৭ সাল ছিল ইণ্টারন্যাশনাল টুরিস্ট ইয়ার। সেই বছর নেপালে একখানি ট্রাভেল কম্পানিয়ান প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁরা নেপাল ঘুরে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে এই বইখানা আমি দেখেছিলুম। পড়েও ফেলেছিলুম যত্ন করে। তাতে আমি আর একটি কথা জেনেছিলুম। নে নামের একজন মুনির নামে এই দেশের নাম নেপাল হয়েছে। এই বইএ আরও আছে যে চীনা ভাষায় নে শব্দের মানে গৃহ ও পাল শব্দের মানে পশম অর্থাৎ পশমের দেশ বলেই নাম নেপাল। নেপালের প্রাচীন গ্রন্থে নাকি আছে যে এক সময়ে এই দেশ প্রতিবেশীর কাছে পশম বিক্রি করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ব্যাপারটা যাই হোক, এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে দেশের নাম নেপাল হবার একটা কারণ ছিল। নে মুনির নামে বা নেবার জাতির নামে না হলেও পশমের দেশ বলে নেপাল নাম হবার পেছনে একটা ভাল যুক্তি আছে, আর এই যুক্তি মানার অন্তরায়ও কিছু নেই।

নেপাল থেকে প্রকাশিত ট্রাভেল কম্পানিয়নে আমি আর একটি আশ্চর্য কথা পড়েছিলুম। যুগ্ম লেখকের লেখা এই বইএ মঞ্জুশ্রী

বোধিসত্ত্বকে দেবী কল্পনা করা হয়েছে। কিংবদন্তী আছে যে নেপাল উপত্যকাটি জলে পূর্ণ ছিল। চোভারের নিকটে পর্বতকে খড়্গ দিয়ে ভেদ করে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব এই উপত্যকা মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছিলেন। তারপরেই এই উপত্যকায় বাস করতে এসেছিলেন নে মুনি।

এই কাহিনীর সঙ্গে কাশ্মীরের কাহিনীবও মিল আছে। সেখানেও প্রবাদ আছে যে হিমালয়ের ঐ অঞ্চল পুরাকালে জলে পূর্ণ ছিল। তারপর ব্রহ্মাব পৌত্র কশ্যপ এসে সেই জল বার করে দিয়ে উপত্যকাটিকে বাসোপযোগী কবেছিলেন। তাঁরই নামে দেশেব নাম হয়েছিল কশ্যপ মাব বা কশ্যপ মীব থেকে কাশ্মীর।

কশ্যপ নাম আমবা জানি। আমাদেব পুবাণে তিনি বিখ্যাত। তাঁর বংশধববাই দেবতা দৈত্য দানব প্রভৃতি নামে পবিচিত। কিন্তু মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব কে ছিলেন তা আমাদের আবিষ্কাব কবতে হবে।

বিশ্বকোষে দেখলুম যে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব নেপালের বিশেষ উপাস্য। ইনি মঞ্জুশ্রী মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুনাথ নামেও খ্যাত। নেপালের প্রায সর্বত্র এঁব মন্দির আছে। স্বয়ম্ভুনাথেব নিকটে যে মন্দিব তাই প্রধান। ইনি বিঘ্ননাশক ও রক্ষাকর্তা, শিল্পজীবীদেব নিকটে কতকটা হিন্দুর সবস্বতী ও বিশ্বকর্মারূপে পূজা পেয়ে থাকেন। কোথাও ইনি দ্বিভুজ, কোথাও চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ প্রতিমাব এক হাতে খড়্গ ও অন্য হাতে বই। প্রতিমা চতুর্ভুজ হলে অন্য দুই হাতে ধনুর্বাণ। এঁর মন্দিবের সামনে মণ্ডল নামের এক খণ্ড পাথরেব উপরে মঞ্জুশ্রীর চরণচিহ্ন উৎকীর্ণ থাকে। চম্পাদেবী পর্বতে এঁর এক পত্নী বরদা বা লক্ষ্মীর ও ফুলচোরা পর্বতে অপর পত্নী মোক্ষদা বা সরস্বতীর মন্দির আছে।

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, মঞ্জুশ্রী পুরুষ দেবতা। তিনি একাধারে বিঘ্ননাশক, রক্ষাকর্তা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্মা। লক্ষ্মী সরস্বতীর মতো দুই দেবী তাঁর পত্নী। অর্থাৎ মঞ্জুশ্রী দেবী নন, তিনি পুরুষ দেবতা। খড়্গ ও ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করেন, আবার বইও পড়েন।

কোথা থেকে এই দেবতার কল্পনা এল, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

বিশ্বকোষেই আমি স্বয়ম্ভু পুরাণ নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখেছি। তাতে জেনেছি যে মঞ্জুদেব নামে একজন রাজা ছিলেন চীন দেশের মঞ্জুশ্রী পর্বতে। এই পাহাড়ের প্রাচীন নাম নাকি পঞ্চশীর্ষ শৈল। অনেকে অবশ্য এই পাহাড়টি আসামের অন্তর্গত বলে মনে করেন। সে যাই হোক, স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে রাজা মঞ্জুদেব তাঁর দুই রাণীকে নিয়ে নেপালের স্বয়ম্ভু ক্ষেত্র দর্শনে আসেন। তাঁরই দুই রাণীর নাম বরদা ও মোক্ষদা। রাজা এসে দেখলেন যে নেপালের হ্রদ হাঙ্গর কুমীরে পূর্ণ। তাই দেখে তিনি তাঁর অস্ত্র দিয়ে উপত্যকা ভূমি ভেদ করে দিলেন।

ইতিহাসে একজন মঞ্জুঘোষ আছেন বলে মনে হয়। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ আচার্য। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন। তারপর চীনের বৌদ্ধদের এনে নেপালে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনিই নেপালের উপত্যকা ভেদ করে জল নিষ্কাশনের পর এই দেশ বাসোপযোগী করেছিলেন। নেপালের আদি বুদ্ধ মন্দির স্থাপন ও ধর্মাকর নামে একজনকে রাজসিংহাসনে স্থাপন তাঁরই কীর্তি। বজ্রসূচী নামে একটি গ্রন্থের আরম্ভে আছে—ওঁ নমো মঞ্জুনাথায়। জগদ্‌গুরুং মঞ্জুঘোষং নত্বা বাক্‌ কায় চেতসা। ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে তন্ত্রসারেরও উল্লেখ করতে হয়।—

শ্রীমঞ্জুঘোষো জয়তাং সাধকানাং সুখাবহঃ।

ইনি তান্ত্রিকদের উপাস্য দেবতা। এঁর পূজা করে জড়তা দূর হয় এবং ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়। মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ বৌদ্ধ ও জৈনদেরও উপাস্য। তাই বলছিলুম যে যথাযথ অনুসন্ধান করলে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বকে আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে।

নেপালীরা মনে করেন যে গোপ বা গোপালক জাতিই নেপালে প্রথম রাজত্ব করেন এবং রাজা ধর্মকারই প্রথম রাজা। মাতাতীর্থে

ছিল গোপাল বংশের রাজধানী। এই বংশের রাজারা কত দিন রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু এঁদের পতনের পর কিরাত বংশীয়রা রাজত্ব করেন। ইয়ালাম্বর ছিলেন এই বংশের প্রথম রাজা এবং গৌতম বুদ্ধের সময়ে এই বংশের সপ্তম রাজা রাজত্ব করছিলেন।

এ কথা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তা বিচার করবার চেষ্টা আমি করেছিলুম। তাতে জানলুম যে গোপাল বংশই নেপালের মাতাতীর্থে প্রথম রাজত্ব করে। এই প্রসঙ্গে নে মুনির নামও আছে। মনে হয় যে মঞ্জুঘোষ বা নে মুনি একই ব্যক্তি এবং তিনিই একজন গোপালকে রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই বংশের রাজারা পাঁচশো একুশ বৎসর নেপালে রাজত্ব করেন। তারপর জিতেদাস্তি নামে কিরাত বংশের একজন রাজা হন। মহাভারতের কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই কথা আছে পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজীর, Some Considerations on the History of Nepal গ্রন্থে। কিন্তু এই বিবরণ ঐতিহাসিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মনে হয় যে পুরাকালে এই নেপাল উপত্যকায় প্রথমে গোপাল ও পরে কিরাত জাতির প্রাধান্য ছিল এবং তাঁরাই দেশের রাজা বলে পরিচিত ছিলেন।

আমাদের বহু প্রাচীন গ্রন্থে নেপালের উল্লেখ মাত্র আছে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হল স্কন্দ পুরাণের নাগর ও সহ্যাদ্রি খণ্ড, রেবা খণ্ড, গরুড় পুরাণ, দেবী পুরাণ, জৈন হরিবংশ, বৃহন্নীল ও বারাহী তন্ত্র, বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি। কিন্তু এই সব গ্রন্থ খুব বেশি প্রাচীন নয়। বৌদ্ধ স্বয়ম্ভু পুরাণ ও বৌদ্ধ তন্ত্রে এবং স্কন্দ পুরাণের হিমবৎ খণ্ডে নেপালের সম্বন্ধে কিছু অলৌকিক উপাখ্যানও পাওয়া যায়, কিন্তু এসব থেকে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় সম্ভব নয়।

Indian Antiquary থেকে জানা যায় যে নেপালের অনেক অভিজাত পরিবারে প্রাচীন রাজবংশাবলী সংগৃহীত আছে। কিন্তু

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভগবানলাল ইন্দ্রজী চেষ্টা করেও কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই সবের উপরে নির্ভর করেই ইউরোপের কিছু ঐতিহাসিক নেপালের ইতিহাস রচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন যে সে ইতিহাস ধারাবাহিক নয় এবং নানা স্থানেই গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগে নেপালের তরাই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে অশোকের শিলালিপি। এর থেকেই প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়। কিন্তু তা নেপাল উপত্যকার ইতিহাস নয়, তা দক্ষিণের তরাই অঞ্চলের ইতিহাস। শাক্য রাজারা সেখানে রাজত্ব করতেন এবং গৌতম বুদ্ধের জন্ম এই শাক্য রাজবংশে। এই রাজাদের কয়েক জনের নাম পাওয়া যায় ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে। তার থেকেই জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের পব ও সম্রাট অশোকের পূর্বে শাক্য বংশের আরও পাঁচ-সাত পুরুষ এই অঞ্চলে বাজত্ব করেছিলেন। তার পর নেপালে রাজত্ব কবেন পবাক্রান্ত লিচ্ছবি রাজারা। পার্বতীয় বংশাবলীতে লিচ্ছবি নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই রাজাদের পনরখানি শিলালিপি উদ্ধার করেছিলেন এবং তার থেকে লিচ্ছবি রাজবংশেব ধারাবাহিক রাজত্ব কাল নির্ণয় করেছিলেন। প্রথম রাজা প্রথম জয়দেবের রাজত্ব কাল ১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। দ্বিতীয় জয়দেবের কাল ৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি বিবাহ করেছিলেন গৌড়োড্রকলিঙ্গ কোশলাধিপ ভগদত্ত বংশীয় হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন জয়দেব-পরচক্রকাম নামে। তাঁর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে লিচ্ছবিরা সূর্য বংশীয় রাজা। সুপুষ্পের পর তেইশ জন রাজত্ব করেছেন পুষ্পপুরে, তারপর জয়দেব হয়েছিলেন নেপালের প্রথম রাজা। জয়দেব-পরচক্রকাম দশম পুরুষে রাজত্ব করবার সময় এই মূল্যবান শিলালিপিটি খোদিত করে যান। এরই উপরে নির্ভর করে নেপালের প্রাচীন ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে।

এই পর্যন্ত পড়তে আমার কত সময় লেগেছিল জানি নে। মুকুন্দ বাবু এসে আমাকে সজাগ করে দিলেন। বললেন: আর দেরি করলে হোটেলের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে, উপোস করে কাটাতে হবে সারারাত।

আমি লজ্জিত হয়ে বই বন্ধ করলুম। তাই দেখে তিনি বললেন: লজ্জার কিছু নেই। এই রকম এক আধজন পাঠক থাকলেই লাইব্রেরি চলবে। তা না থাকলে লাইব্রেরি আর ক্লাবে তফাৎ হবে কোথায়!

আমি উঠে বইখানা মুড়ে তাঁর হাতে দিলুম।

মুকুন্দবাবু বললেন: নতুন আইন হয়েছে রেয়ার বুক বাড়ি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। তিরিশ বছরের পুরনো হলেই রেয়ার বুক হবে। আর বেশি দেরি নেই।

হেসে বললুম: কিসের?

একালের সব নাটক নবেলও যে রেয়ার বুক হবে তা আমরাই দেখে যেতে পারব আশা করছি।

বলে বিশ্বকোষ হাতে নিয়ে ফিরে গেলেন।

যে বই বাড়ি নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, তারই নাম রেয়ার বুক, অর্থাৎ মূল্যবান বই। হারালে আর সংগ্রহ করা যাবে না, তাই লাইব্রেরিতে বসেই পড়তে হবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও এই নিয়ম। অথচ যারা এই সব বই পড়েন, গবেষণার কাজে দরকার হয়, তাঁরা কী ভাবে এই সব বই নষ্ট করেন তার চাঞ্চল্যকর সংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলাও এই সব বই পড়বার সময় দরকারী পাতা কেটে বাড়ি নিয়ে গেছেন। তারপর ধরা পড়ে গেছেন।

লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ করে বেরোবার সময়ে মুকুন্দবাবু আমাকে এই কথা মনে করিয়ে দিলেন। বললেন: কে পড়তে এসেছে, আর কে চুরি করতে, তা কি আমরা বুঝি না? যে বোঝে তার জন্যেই

আইনের শক্ত গেরো। যে কদব জানে পুবনো বইএর, তাব জন্যেই আইন। চোরেব জন্যে কোন আইন নেই।

আমি কোন উত্তর দিলুম না। আমাব জন্যেই যে তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা কবছিলেন তা আমি জানি। এই ভাবে আগেও তিনি আমাব জন্যে অপেক্ষা কবেছেন, কিন্তু বিবক্ত হন নি কোন দিন।

পথে নেমে বললেন: আমাবও একটা আইন কবতে ইচ্ছে করে।

কী আইন?

লাইব্রেবিয়ান যদি কাউকে যোগ্য পড়ুয়া ভাবে, তবে যে কোন বই তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত দিন খুশি রাখতে দেবে।

সে কি, লাইব্রেরি তো তা হলে ফাঁকা হয়ে যাবে!

মুকুন্দবাবু বললেন: হবে না। যে সত্যিকার পড়ুয়া সে দরকারের বেশি একখানাও বই নেবে না, আর দরকারের বেশি এক দিনও বই রাখবে না বাড়িতে। আমি এই রকম পড়ুয়ার কথাই বলছিলাম যে একজন থাকলেই লাইব্রেরি চলবে।

বলে তিনি নিজের বাড়ির পথ ধরলেন।

এই রকমের কথা মুকুন্দবাবু আমাকে আর একদিন বলেছিলেন। সেদিন তিনি আর একজনের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, দুঃখ হয় ভদ্রলোকের জন্যে। বয়স হয়েছে, চোখে ভাল দেখেন না, আসেন অনেক দূর থেকে। কিন্তু যে সব বই পড়েন, তা আর কেউ পড়ে না, কয়েক বছরের মধ্যে কেউ পড়ে নি, এর পরেও আর কেউ পড়বে না। কিন্তু তাঁর হাতে আমি এ সব বই তুলে দিয়ে বলতে পারি নে যে বাড়ি নিয়ে গিয়ে শেষ করুন বইখানা, পাঠিয়ে দেবেন কারও হাত দিয়ে। আইন, বুঝলেন, আইন করেছেন আপনারা। সত্যিকার পড়ুয়া যাতে না থাকে, তার জন্যেই এই সব আইন।

তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বেশি দিন চলবে না এই সব আইন। আমাদেব পবে যাবা আসছে, তাদের দু পয়সা রোজগাবের উপায় হবে। একালেব দু চারখানা বগরগে নবেল তো বেয়াব বুক হয়েছে, তাব জন্যেই নানা বকম প্রস্তাব আসছে। ছিঃ! বলে তিনি তাঁব ঘৃণা প্রকাশ কবেছিলেন আমাব সামনে। আমি কোন উত্তর দিতে পাবি নি।

৪

আমার একটা দুর্বলতার কথা আমি জানি। মনে কোন নতুন ভাবনা এলে রাতে আমার ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ জেগে থাকতে হয় আমাকে। ভালো মন্দ নানা চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তারপর কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি তা নিজেই জানতে পারি না। আজও তাই হল। খেয়ে এসে বিছানায় আশ্রয় নিতেই আমার পুরী ভ্রমণের কথা মনে পড়ে গেল।

পুরী আমি স্বেচ্ছায় বেড়াতে যাই নি, কেউ আমাকে ধরে নিয়েও যায় নি। কলকাতা থেকে আমার পালিয়ে যাবার দরকার হয়েছিল এবং কোথায় যাব ভাবতে গিয়ে পুরীর কথা মনে এসেছিল। না, পুরীর কথা আমার মনে আসে নি, বন্ধু মনোরঞ্জন আমাকে পুরী যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। কেন, সে কথাও আমার মনে পড়ছে।

অফিসের ঠিকানায় মামার চিঠি পেয়েছিলুম একখানা। তিনি আমাকে স্বাতির বিয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন। জো রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। মাঘে বিয়ে হবে। বড়দিনের ছুটিতে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। তাঁর বয়স হয়েছে বলে আমার সাহায্য তাঁর চাই। তিনি লিখেছেন, সব চেয়ে নিকট বলতে একমাত্র আমিই আছি। সম্বন্ধ নকল হলেও তিনি আমাকে নকল ভাবেন না। কোমর বেঁধে আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াব, এই তাঁর বিশ্বাস।

অফিসের বাহিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি পালিয়ে যাবার কথা ভাবছিলুম। মনোরঞ্জন এক সময়ে আমার পাশে এসে বলল, তোমার এই পালিয়ে বাঁচবার মনোবৃত্তি আমি সমর্থন করি না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, কে বলল আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই ?

এই তো তুমি পালিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছ। ভাবছ, বড় দিনে কোথায় পালিয়ে যাবে !

কী আশ্চর্য ! তোমার গণনায় কি এ সবও ধরা পড়ে !

বাড়িতে তোমার কোষ্ঠীটাও দেখব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি। কোন সমস্যাব সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া কোন পুরুষের ধর্ম নয়।

কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি আমি করতে পারব ?

চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই।

তাবপব মনোরঞ্জন আমাকে বলেছিল, মন তোমার স্থির করে ফেল। হয় তুমি পুরুষের মতো তোমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত কর, নয় তোমার নায়িকা বদল করে নিশ্চিন্ত হও।

আমি বড় রাস্তায় জনতার চলাচল দেখছিলুম। এদের ভিতর পুরুষই বেশি। কিন্তু কটা লোক তাদের দাবী জানাতে পারে, আর কটা লোক পায় তার ন্যায্য অধিকার! ছুনিয়ায় কি আজ অন্যায়েরই জয়যাত্রা নয়! সত্যের সম্মান আজ কোথায়! মানুষ আজ কার কাছে করবে বিচারের প্রত্যাশা!

মনোরঞ্জন বোধহয় ঠিকই বলেছে, নায়িকা বদল কর। কিন্তু তাতেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে! আবার কি দরকার হবে না নায়িকা বদলাবার! তাতে কি লাভ হবে কোনও ?

মনোরঞ্জন বলেছিল, লাভ আছে বৈকি। জীবনের স্রোত তোমার আটকে গেল না, বইতে লাগল। সমুদ্রের সন্ধান না পাক, হারিয়ে যাবার ছুঃখ তো এড়ানো গেল !

তার পরেই বলেছিল, আমাদের পাড়ার মুখুজ্জেরা পুরী যাচ্ছে। তাদের মেয়েটি ভাল।

এর পর আমি আর কোন কথা বলি নি। কিন্তু পুরী জায়গাটা

যে ভাল সে কথা মনে মনে মেনে নিয়েছিলুম। কলকাতার কাছে এমন সুন্দব জায়গা আব নেই। দীঘা নামে নতুন একটা জায়গার নাম শুনেছি। অনেকটা পথ বাসে যেতে হয়। উপেনদা বলেছিলেন, বাসে তাঁর কোমর বেঁচেছিল কোন রকমে।

কী জানি, সমুদ্র আমাকে কেন টানে! কী অবাধ তাব উদার বিস্তাব! একবাব ঐ সমুদ্রেব সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনকে বুকের খাঁচার ভিতর কিছুতেই ধবে রাখা যায় না। মন যায় আকাশেব সঙ্গে মিশে, হারিয়ে যায় আকাশ আর সমুদ্রের মোহনায়। সে আমার ভবঘুরে মন। মোহমুক্ত স্বাধীন মন।

সেদিন উত্তরপাড়ায় মনোরঞ্জন আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলুম।

তারপর একদিন সত্যিই পালিয়ে গিয়েছিলুম পুরীতে। মুখুজ্জেদের ভয় আমি পাই নি। তাঁদের চিনতে আমার সময় লাগবে না, সময় লাগবে না ফাঁকি দিতেও। যাকে অনেক চেষ্টাতেও চিনতে পারি নি, তাকেই আমি ভয় পাই। এত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেও স্বাতি আমার কাছে প্রথম দিনের মতোই অচেনা আছে। অথচ সে আমাকে চিনেছে বলেই সন্দেহ হয়, আর এই চেনায় তার একটুও ভুল হয় নি। তাই আমি তার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি নিজের ভাব। সে যা চায়, তাই হোক। আমি তাই মেনে নেব, মেনে নিতেই হবে, তাই আমাব পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মুখুজ্জে পরিবারেব কথা পুরীতে আমার মনে পড়ে নি। তাঁরাই আমাকে খুঁজে বার কবেছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটি নির্জন জায়গায় আমি বসে ছিলুম। সামনে অকূল সমুদ্র, দাম্ভিক উদ্ধত, সারাক্ষণ নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। ঢেউএব আঘাতে পৃথিবীকে নিপীড়িত করছে, আর গম্ভীর গর্জনে ঘোষণা করছে আপনার জয়ধ্বনি।

আমার চোখের সামনেই তবঙ্গ এসে ফুলে উঠছিল অজগরের ফণার মতো। কিন্তু এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত

সেই ফণা খানিকটা এগিয়ে এসেই ফেটে পড়ছিল। যেন সাদা ধবধবে জলের প্রপাত, আর সেই জল গড়িয়ে পড়ছিল নিচের নীল জলের উপরে। পারের দিকে ধেয়ে আসছে, আর ফেণায় সাদা করে দিচ্ছে ভিজে মাটি। সেখানকার বালিও জল বলে ভ্রম হচ্ছে।

এত বড় সমুদ্রের এই খেলা যেন খেলা নয়, এই চঞ্চলতা যেন চঞ্চলতা নয়। সমুদ্রের গর্জনকেও গর্জন বলে মনে হচ্ছে না। এত উদার এত বিরাট এই সমুদ্র যে তাকে আকাশের মতো অসীম শান্ত স্তব্ধ মনে হচ্ছে। নিজের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম, নিজের বেদনা ও ভাবনার কথা। বৃহতের সামনে এসে মানুষ বোধহয় ক্ষুদ্রতাকে ভুলতে পারে"।

সমুদ্রের জলে যে আমার পায়ের চটি ভিজে যাচ্ছিল, সে দিকে আমার খেয়াল ছিল না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথায় আমি চমকে উঠেছিলুম। পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, আপনার কাপড় যে ভিজে যাচ্ছে!

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম তাঁর কথায়। ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলুম, সমুদ্র এত বড় হলে কী হবে, আমার মতো ছোটর সঙ্গেও খেলা করতে ভালবাসে।

তারপর পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও। ভদ্রলোক বলেছিলেন, মনোরঞ্জনবাবু ঠিকই বলেছিলেন। লক্ষ লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে বার করা শক্ত হবে না। বলেছিলেন, সমুদ্রের দিকে চেয়ে আপনি বালির ওপরে বসে থাকবেন। ঢেউএর জলে জামাকাপড় ভিজে গেলেও আপনার মন সেদিকে যাবে না।

মিস্টার মুখার্জি আমাকে তাঁর হোটেলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। চা খাওয়াবার জন্যে মিসেস মুখার্জি যখন স্টোভ ধরাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, বেশ ভাল করে একটু চা খাওয়া তো মা সাবি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, সাবিত্রী আমার মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে।

আমি বলেছিলুম, নামটিও খুব ভাল। এর চেয়ে ভাল নাম আব নেই।

সাবিত্রী তাব মায়েব আড়ালে যেন মিলিয়ে গেল। কিন্তু তাব ছোট ভাই বলে উঠল, দিদিব এ নাম একটুও পছন্দ নয়।

মনোবঞ্জনেব নায়িকা বদলেব পবামর্শ আমাব মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাব জন্যে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নি। চা খেয়ে বিদায় নেবাব আগে আমি বলেছিলুম, মনোবঞ্জনেব গণনাব প্রশংসা আমি আর কবি না।

মিস্টার মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, কেন?

সে বলেছিল, এই চাকরিতেই আমাব উন্নতি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকতেই তো পারলুম না।

বিস্ফাবিত চোখে ভদ্রলোক বললেন, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

বলেছিলুম, ওরাই ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, বুঝতে পেরেছি। অন্যত্র ভাল চাকরি পেয়েছেন।

না, তা নয়।

তবে নিশ্চয়ই ব্যবসায়ে নামবাব ইচ্ছা।

মূলধন নেই।

তবে কি পুরোপুরি সাহিত্য করতে চান?

হেসে বলেছিলুম, তাতে একজনেব পেটই চলে না।

চিন্তিত ভাবে মিসেস মুখার্জি বলেছিলেন, তবে?

উত্তরে আমি বলেছিলুম, সমুদ্রের ধারে বসে সেই কথাই তো আমি ভাবছিলুম।

মিস্টার মুখার্জি বলেছিলেন, না না, আপনি বোধহয় অকারণে এ সব কথা ভাবছেন। মনোবঞ্জনবাবু বলেছেন, আপনার উন্নতির দিন আসছে। তখন আপনি আর আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকবেন না।

হাসতে হাসতেই আমি বলে এসেছিলুম, মনোরঞ্জন আজকাল বাজে কথাই বেশি বলে।

মুখার্জি দম্পতি হাসতে পারলেন না। হাসি তাঁদের অন্তর্হিত হয়েছিল। আর নিজের সাফল্যে আমি আরও একবার হেসেছিলুম।

আর এক দিনের কথাও মনে পড়ছে। সমুদ্রের ধারে তখন ছায়া নেমেছে, অন্ধকাব ঘনায় নি। আব কিছু পরে সমুদ্র আর আকাশ একাকাব হয়ে যাবে। আকাশেব তাবা দেখা যাবে সমুদ্রের ঢেউএর উপবে। আকাশেব মতো সমুদ্রও সাবারাত জেগে থাকবে। সারা রাত ডাকবে। ঢেউএব পব ঢেউ এসে পায়ের উপব আছড়ে পড়বে, আর উচ্ছল জল কলকল কবে কথা কইবে। মানুষেব মতো পৃথিবীও ঘুমোয়, কিন্তু সমুদ্র ঘুমোয় না। মানুষ ক্লান্ত হয়, কিন্তু সমুদ্র হয় না। সমুদ্রের কোন ক্লান্তি নেই, আনন্দ বেদনাও নেই। তাই সে সারাক্ষণ ডাকে এক ভাবে।

কেউ কি আমাকে ডাকছেন ?

ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম হালদার মশাই। কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার। একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে আমরা পাশাপাশি বসলুম। ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, আপনি এখানে কী করছেন ?

বললুম, তীর্থ কবতে এসেছি।

হালদাব মশাই একটা ভেংচি কেটে বললেন, আব ও দিকে সব ফর্সা হয়ে যাচ্ছিল। তীর্থ কববাব সময়ই বটে।

বিড়িতে কয়েক টান দিযে, শেষ টানটি দিলেন চোখ বুঁজে। তাবপব সেটা ফেলে দিয়ে বললেন, তা আপনার সঙ্গে আমাব কত দিনেব পবিচয় ?

বললুম, বছর দেড়েকের।

মাত্র দেড় বছর! বলেন কি! আপনার সঙ্গে তো আমার অনেক কালের পরিচয় মনে হচ্ছে! সেতুবন্ধ রামেশ্বরে দেখা হল, তারপর পুষ্করে দ্বারকায় আর প্রভাসে!

বললুম, প্রথম পরিচয় হয়েছে এবারের পুজোয় নয়, তার আগের বছর। গোদাবরী স্টেশনে আপনি আমাদের গাড়িতে চেপেছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ছিল সেই মেটেবুরুজের মৈত্তির। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। দেড় বছরের পরিচিত মানুষের জন্যে কি কারও এমন টান হয়! এখানকার মাটিতে পা দিয়ে অবধি ভাবছিলুম, গোপালবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না। অঘোর গোস্বামী দুঃখ করছিলেন, কাউকে কিছু না বলে কয়ে ছেলেটা কোথায় চলে গেল!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, আপনি মামাবাবুর কাছে গিয়েছিলেন নাকি?

শুধু গিয়েছি নয়, অনেক কাজ করেছি। সব কথা শুনলে হালদারকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হবে না।

কে বললে আপনাকে আমি খারাপ লোক ভাবি?

সবাই ভাবে, আর আপনি ভাববেন না কেন!

একটু থেমে বললেন, বুঝলেন গোপালবাবু, পরনিন্দা করবার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়েই যদি রোজগার হয় তো ও কাজ কেন করব! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়! ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ, সে কথা তো জানি!

রামেশ্বরের কথা আমার মনে পড়ল। রাত্রের আরতি দেখতে স্বাতিকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলুম। ক্লান্ত দেহে দুজনেই সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হালদার মশাই এ কথা জানেন, তিনি সেখানে ছিলেন। তারপর আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের পথে, দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প

হয়। কিন্তু হালদার মশাই সে রকম কিছু করেছেন বলে শুনি নি। বললুম, সত্যি কথা।

হা-হা করে হেসে উঠলেন হালদার মশাই, তারপর বললেন, এবারে বলেছি সব কথা, বলে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম, আর তিনি বললেন, হাঁ করে দেখছেন কী! এবারে এই কর্মই তো করে এলুম। কিন্তু যার পয়সায় এলুম, তার নাম আমি কিছুতেই বলব না।

সহসা অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বললেন, প্রতিজ্ঞা করেছি।

আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। বললুম, ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি খুলে বলুন।

বলব বৈকি। কী নাম যেন ঐ বাঁদরটার? ঐ যে যার সঙ্গে প্রভাসের গাড়িতে দেখা হয়েছিল? পাঁচশো টাকা কড়ার করে যে একশো টাকা আগাম দিয়েছিল আমাকে?

জো রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হতভাগা জনার্দন। তারই সঙ্গে আপনার স্বাতির তো বিয়ে হচ্ছিল গো! মেয়েটার উপকার করে এলুম।

অনেক চেষ্টায় সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারলুম। বাকি চারশো টাকা জো রায় দেন নি। হালদার মশাই তাঁর বাপের কাছে গিয়েছিলেন ছেলের খোঁজ নিতে, দরকার হলে তার ঠিকানাও চেয়ে নেবেন। সেখানেই তাদের বিয়ের খবর শুনলেন। জো রায় যে পাত্র খারাপ, অঘোর গোস্বামীর কাছে সে কথা বলা চলে না। তীর্থস্থানে নাকি শপথ করেছেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছে মেয়ের কথা বলতে হল। মেয়ে ভাল, কিন্তু—

হালদার মশাই এক গাল হেসে বললেন, এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না। বললুম বুড়োকে, বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন অঘোর গোস্বামীকে, সে মিথ্যে কথা বলবে না।

জানি না, হালদার মশাই কী বলেছেন। কিন্তু সে যে উপাদেয় কিছু নয়, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

হালদার মশাই বললেন, তুই বুড়োয় কী কথা হল জানি নে, গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম, বিয়ে ভেঙে গেছে।

হালদার মশাই রসিয়ে রসিয়ে হাসতে লাগলেন।

আমার বুকের ভিতরটা এতক্ষণ দপ দপ করছিল। এবারে সহসা প্রশ্ন করলুম, খাঁটি খবর?

হালদার মশাই তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললেন, বললুম তো, কার পয়সায় এসেছি তা কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি।

হালদার মশাইকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের মতো সুন্দর। তার পর আমি নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম।

সমুদ্রের কথা আমি ভুলি নি। কিন্তু সমুদ্র আজ আমাকে টানছে না, টানছে পাহাড়। পাহাড় আজ আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের মতো পাহাড়ও বুঝি মানুষকে টানে। তার টান কি আরও বেশি, আরও গভীর?

ঘুম আসছে না, কিন্তু জেগে থাকতেও আমার খারাপ লাগছে না। স্বাতি এখন কী করছে?

৫

পর দিন অফিসে আমি ছুটির ব্যবস্থা করলুম। হাতে আরও কয়েকটা দিন সময় আছে। এবারে কিছু পড়াশুনা করে বেরোতে পারব।

বাড়ি ফেরার পথে আমার মনে হল যে নেপালের সম্বন্ধে কোন পৌরাণিক তথ্য বিশ্বকোষে নেই অথচ পুবাণ তো এই দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস। বৈদিক যুগেব কোন তথ্য না থাক, পুবাণের যুগে নেপালের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। নেপালের বদলে হয়তো অন্য কোন নামে এই দেশ বা এই দেশের কিছু অংশ পবিচিত ছিল। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান যেমন লুম্বিনী, তেমনি আব কোন নাম ছিল কিনা আমি ভাবতে লাগলুম।

ভাবতের একখানা বড মানচিত্র ভাঁজ কবা ছিল আমার কাছে। বাড়ি ফিরে প্রথমেই সেই মানচিত্রখানি দেখলুম এবং দুটি পৌরাণিক নাম জনকপুর ও বিরাটনগব দেখে পুলকিত হয়ে উঠলুম। জনকপুর ছিল জনক রাজার রাজধানী, সীতার জন্মস্থান। আর বিরাটনগর নাম দেখে মহাভারতের বিরাট রাজার কথাই মনে পড়ছে। বিরাটনগর নামে আরও কয়েকটি স্থান আছে এ দেশে, কোনটি মহাভারতের বিরাটনগব তা আমার জানা নেই। মনে হল যে এই দুটি জায়গা নিয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ আছে।

প্রথমে আমি জনকপুরের অবস্থান দেখলুম ভাল করে। এবারের যাত্রায় আমরা সমস্তিপুরের উপর দিয়ে মজঃফরপুবে পৌঁছব। সমস্তিপুর থেকে একটি লুপ লাইনে চব্বিশ মাইল উত্তরে দারভাঙ্গা শহর বাগমতী নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয়। দ্বারভাঙ্গা থেকে একটি ব্রাঞ্চ লাইনে সকৃরি জংসন বারো মাইল উত্তর-পুর্বে, সেখান থেকে দুটি লাইন দুদিকে গেছে

—একটি পূর্বে কোশি নদীর দিকে, অন্যটি মধুবনী হয়ে জয়নগরে। এখানেই নেপালেব সীমান্ত। জয়নগর থেকে জনকপুর নেপালের ছোট লাইন ধরে যেতে হয়।

জনকপুরে এখনও জানকীর মন্দির আছে বলেই যে তাকে রামায়ণের কালের জনক রাজার রাজধানী বলে মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই। এ যুগেব মানুষ বড় অবিশ্বাসী, যুক্তি না দেখালে সত্য ঘটনাও লোকে অবিশ্বাস কবে। তাই প্রথমেই আমি যুক্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলুম।

মধুবনী নামটা আমাদের পরিচিত। মধুবনী শিল্পের নানা নমুনা আমরা দেখেছি। এর চেয়ে প্রাচীন শিল্পকলা বিহারের আর কোনখানে নেই। ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে এই অনাদৃত গ্রামের অধিবাসীরা কোন্ উত্তরাধিকার বলে এই শিল্পকলা লাভ করেছে। মধুবনী আমি যাই নি, কিন্তু ছবিতে মধুবনী গ্রাম দেখেছি এবং শিল্পকলার নমুনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।

এই অঞ্চলের আর একটি স্থানের কথা আমি সাহেবদের লেখায় পড়েছিলুম। এ জায়গার নাম পুসা। সমস্তিপুর থেকে মজঃফরপুর যাবার পথে পুসারোড নামে একটি স্টেশন আছে, পুসা সেখান থেকে ছ মাইল দূরে গণ্ডক নদীর তীরে। লর্ড কার্জন এইখানে স্থাপন করে-ছিলেন ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ফিপ্‌স্ নামে একজন মার্কিন ভদ্রলোক প্রচুব টাকা দিয়েছিলেন এর জন্যে। এই ইনস্টিটিউট এখন দিল্লীতে স্থানান্তবিত হয়েছে এবং বটানিকাল সেক্সনটি এখনও সেখানে আছে। সাহেব লিখেছেন যে এই অঞ্চল জুড়ে আছে বহু প্রাচীন মন্দিব এবং ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত স্থান। পুরাণে বর্ণিত মিথিলা রাজ্যেরই পুবাকীর্তি বলে তিনি মনে কবেন।

এই অঞ্চলই যে পুরাকালের মিথিলা সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। রামায়ণে আমরা দেখেছি যে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে ঋষি বিশ্বমিত্র সিদ্ধাশ্রম থেকে মিথিলায় এসেছিলেন। তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করেছিলেন

এবং শোন নদের তীরে রাত্রিবাস করেছিলেন। সেই স্থানের নাম ছিল গিরিব্রজ, বর্তমান নাম রাজগির। পরদিন তাঁরা শোন নদের তটদেশ অতিক্রম করে মধ্যাহ্নে জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং পর দিন প্রভাতে নৌকোয় তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে উত্তর তীরে এলেন। সেখান থেকেই রমণীয় বিশালাপুরী তাঁদের নয়নগোচর হল। বিশালার রাজা সুমতি তাঁদের সংবর্ধনা করলেন এবং বিশালায় রাত্রি যাপন করে পর দিন তাঁরা মিথিলায় উপস্থিত হলেন। গৌতমের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে সেখান থেকে জনকের রাজ্যে যাত্রা করলেন। উত্তর-পূর্ব মুখে চলতে চলতে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

এই বর্ণনা আছে বাল্মীকি রচিত রামায়ণে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বমিত্র রাজগির থেকে উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে বিশালাপুরী হয়ে জনকপুরে গিয়েছিলেন। অযোধ্যা থেকে তাঁরা সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলেন। উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বরের নিকটে এই সিদ্ধাশ্রম ছিল বলে জনশ্রুতি। আর বিশালা থেকে তাঁরা বর্তমান জনকপুরের দিকে গিয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

বিশালা নামটিও আধুনিক নয়। পুরাণে পাওয়া যায় যে রাজা তৃণবিন্দুর পুত্র বিশাল যে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তারই নাম বিশালাপুরী বা বিশাল নগরী। পরবর্তীকালে এই নগরটি বৈশালী নামে বিখ্যাত হয়েছিল। ইতিহাসের যুগে বৈশালী ছিল লিচ্ছবি রাজদের রাজধানী। জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্ম এই নগরে। গৌতম বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন তিনবার। নগরের উপকণ্ঠে ছিল অম্বাপালির আম্রকানন। এই নগর দেখতে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও হিউএন চাঙ। তাঁরা অম্বাপালির বিহার দেখে ফিরে গেছেন।

যে পণ্ডিতরা মনে করেন যে মজঃফরপুর শহরের তেইশ মাইল দূরে বাসার নামে একটি গ্রামই প্রাচীন বৈশালী, তাঁদের মধ্যে আছেন কানিংহাম, স্মিথ, ফ্লিট, ডক্টর ব্লচ, ফুঁসে প্রভৃতি বাঘা বাঘা প্রত্নতত্ত্ববিদ্। এই শতাব্দীরই প্রথমে ডক্টর ব্লচ সেখানকার মাটি খুঁড়ে এই কথা

প্রমাণ করেছেন। হিউএন চাঙ্ যখন বৈশালীতে আসেন, তখন তার গৌরব প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সেই গৌরবময় দিনের স্মৃতি দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্বিস্তারেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং নতুন রাজধানী পাটলিপুত্রের শ্রী ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই বৈশালীর পতন ত্বরান্বিত করে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

বায়ু ও মৎস্য পুবাণ পড়ে জানা যায় যে বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রু বুদ্ধের মহানির্বাণের ষাট বৎবর পূর্বে তাঁর পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন এবং বৌদ্ধদের বিশেষ ভাবে নির্যাতন করেছিলেন। বৈশালীর সমৃদ্ধি দেখে তিনি সেই নগর আক্রমণ করেছিলেন। পরে তিনি অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতেও বৈশালীর সমৃদ্ধিব কথা জানা যায়। বিনয়পিটকম থেকে জানা যায় যে সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করবার একশো আঠারো বৎসর পূর্বে বৈশালীতে একটি বৌদ্ধ সঙ্গম আহুত হয়েছিল। বুদ্ধ যে দশবিধ সংস্কাব প্রবর্তন করেছিলেন, এই বৌদ্ধ সঙ্গমে তার দোষগুণ বিচার করা হয়। বলা বাহুল্য যে সে সময়ে এই বৈশালীই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। ফা-হিয়েন যখন কুশীনগর থেকে লিচ্ছবি রাজ্য পরিদর্শন করে বৈশালীতে আসেন, তখনও তিনি সেখানে মহাবন বিহারটি দেখেছিলেন। সেই দোতলা বিহারের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

এই সব কথা মিলিযে পড়লেই মনে হবে যে এই বৈশালী ও লিচ্ছবি বাজ্যই ছিল রামাযণের কালের বিশাল নগর ও বিশাল রাজ্য। ঋষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এই বিশাল রাজ্যে রাজা সুমতির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জনক রাজার রাজ্য মিথিলা ছিল এরও উত্তরে। পুরাণে এই মিথিলা রাজ্য প্রতিষ্ঠারও ইতিহাস আমরা পাই।

পুরাণে আছে যে ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি বশিষ্ঠের শাপে বিদেহ অর্থাৎ দেহ-হীন হয়েছিলেন। ঋষিরা অরাজকতার ভয়ে অপুত্রক

রাজার দেহ অরণিকাঠে মন্থন করতে লাগলেন। তাতে এক পুত্র উৎপন্ন হল। জনকের দেহ থেকে জন্ম বলে ঐ পুত্রের নাম হল জনক এবং পিতা বিদেহ হয়েছিলেন বলে তাঁর অন্য নাম হল বৈদেহ। মন্থনে উৎপন্ন বলে মিথিও বলা হয়। মিথিলা তাঁরই রাজ্যের নাম। এই বংশেই জন্ম হযেছিল সীরধ্বজের। পুত্রলাভের জন্য তিনি যখন যজ্ঞভূমি কর্ষণ করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগে এক কন্যা লাভ করেন। এই কন্যার নামই সীতা।

এই কাহিনীকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে অপুত্রক অবস্থায় নিমির মৃত্যু হলে এই বংশের ছেদ হয়েছিল দীর্ঘ কালের জন্য। এই কালের অনুমান করা কঠিন নয়। ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি তাঁর ভ্রাতা বিকুক্ষির সমসাময়িক। রামের জন্ম বিকুক্ষির বংশে বলে এই দুই বংশের পর্যায় কাল সমান হওয়া দরকার। তবেই সীতা রামের স্ত্রী হতে পারেন। গুণে দেখা যায় যে বিকুক্ষি ও রামের মধ্যে আরও ষাট পুরুষ আছেন, কিন্তু নিমির বংশে আছেন মাত্র বাইশ পুরুষ। এর থেকেই সহজে অনুমান করা যায় যে নিমির আটত্রিশ পুরুষ পর জনক নামে কোন ব্যক্তি নিমির বংশধর বলে নিজের পরিচয় দিয়ে মিথিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেহ নিমির বংশধর বলে তিনি বিদেহরাজ এবং নিমির বংশে মন্থন বা অন্বেষণ করে তাঁকে পাওয়া যায় বলে তিনি মিথিলাপতি। মনে হয় জনক মিথিলা পতিদের সাধারণ নাম। জনক রাজারা আত্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু কবে থেকে তাঁরা এই খ্যাতি অর্জন করেন তা বলা যায় না। মহাভারতের কালেই বোধহয় প্রথম জানা যায় যে জনক রাজা হয়েও ঋষির তুল্য আত্মজ্ঞানী এবং রাজর্ষি জনক নামেই সমধিক পরিচিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে এই জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সভায় ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। বেদব্যাসের প্রশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সভায় তর্কে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। এই তর্কে যোগ দিয়েছিলেন বচক্রু ঋষির ব্রহ্মবাদিনী কন্যা গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য একান্তেও রাজর্ষির সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করতেন। রাজর্ষির সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী সুলভার মোক্ষ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে মহাভারতের শান্তি পর্বে। ইনি সীরধ্বজ জনক হতে পারেন না। অনুমান করা যেতে পারে যে ইনি তাঁর বত্রিশ পুরুষ পরে বিদ্যমান ছিলেন।

সীরধ্বজ জনকের কাল নির্ণয় করা কঠিন কাজ নয়। আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল জানি। মহাপদ্ম নন্দ তাঁর রাজ্যারোহণের সময় নন্দাব্দের প্রচলন করেছিলেন। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন বলে তাঁকে কলির অংশ বলে এই নন্দাব্দ কল্যব্দ নামে প্রচলিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এর সঙ্গে এক নক্ষত্র মহাযুগ অর্থাৎ সাতাশ শো বৎসর যোগ দিয়ে কলির আরম্ভ স্থির করেন। কল্যব্দ থেকে এই সাতাশ শো বৎসর বাদ দিলে ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের চার শো এক বৎসর পূর্বে মহাপদ্ম নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। পুরাণের মত অনুসারে এর এক হাজার পনর বৎসর পূর্বে পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং সেই বৎসরই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বৎসর। অর্থাৎ এই যুদ্ধ হয়েছিল ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। দশরথ ছিলেন তাঁর বত্রিশ পুরুষ পূর্বে। এক একজন রাজার কাল বিশ থেকে পঁচিশ বৎসর ধরলে প্রায় সাতশো বৎসর পূর্বে আমরা এই বংশের দশরথকে পাই। সীরধ্বজ জনক তাঁর সমসাময়িক বলে আমরা কতকটা অসংশয়ে বলতে পারি যে সীতার পিতা জনক ছিলেন আনুমানিক ২১১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। অর্থাৎ রামায়ণের কাল চার হাজার বৎসরের পুরাতন। রামায়ণে আমরা এই সময়েরই সমাজ-চিত্র দেখতে পাই।

আমি আমার নিজের ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলুম। লাইব্রেরিতে পড়তে যাবার কথাও আমার মনে ছিল না। হঠাৎ

দরজার বাইরে মনোরঞ্জনেব ডাক শুনে চমকে উঠলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে একটা হাঁক দিয়েছিল : গোপাল বাড়ি আছ ?

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমি চমকে উঠেছিলুম। বললুম : হ্যাঁ, আছি।

তা এই অন্ধকারে বসে কী কবছ ?

অন্ধকাব !

মনোরঞ্জন বিরক্তভাবে বলল : না, অন্ধকার তো নয়, দিনের আলো আছে এখনও।

বলে ঘরের বাতি জ্বেলে বসল। বললুম : চায়েব কথা বলে আসব ?

না। ওরাই দিয়ে যাবে। আসার পথে আমি বলে এসেছি, ফিরতে দেরি হলে যেন দু কাপ চা পাঠিয়ে দেয়।

বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে একটা কথার নাগাল পাই নি।

হেসে বললুম : গণনা করলে সবারই নাগাল পাবে।

মনোরঞ্জন বলল : ঠাট্টা নয়। অফিসে একটা কানাঘুষো শুনলুম।

কী বকম ?

আবার নাকি ডুব মারছ ?

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে মনোরঞ্জন বলল : এবারেও কি নায়িকাব ভয়ে, না নতুন নায়িকার সন্ধানে ?

হেসে বললুম : তোমাব গণনায় কি নতুন নায়িকার খবব আছে ?

মনোবঞ্জন বেগে বলল : দেখ গোপাল, জীবনটা এমন হাল্কা ভেবো না। আব মুখুজ্জেদেব তুমি বোকা বানাতে পার, আমাকে পারবে না। আমি তোমার নাড়ির খবর রাখি।

তা রাখো।

তবে সত্যি কথাটা বলছ না কেন ?

তোমার কাছে আর লুকোব কী করে, তুমি তো গুনেই সব কথা বের করে ফেলবে!

মনোরঞ্জন বলল : নাও, ভূমিকা না করে বলে ফেল চট্ করে।

বললুম : আমাকে নায়িকা বদল করবার পরামর্শ তুমি দিয়েছিলে তো?

বলে তার দিকে তাকাতেই সে বলল : দিয়েছিলুম।

বললুম : নতুন নায়িকার খবর পেয়েছি।

মনোরঞ্জন চমকে উঠে বলল : কেন, সাবিত্রীকে তোমার পছন্দ হয় নি?

সীতার কাছে সাবিত্রী! ছোঃ!

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকাল গভীর দৃষ্টিতে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল : আবার তাহলে কোন চাঁদে হাত দেবার জন্যে যাচ্ছ!

হেসে বললুম : বারে বারেই কি ফসকাবে!

চাঁদে হাত পৌঁছয় না ভাই, আর চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোটাই বোকামি।

কিন্তু কথায় বলে, চেষ্টা করলে ভগবানকেও পাওয়া যায়। তাই চেষ্টার শেষ রাখতে নেই।

মনোরঞ্জন ভাবল একটুখানি, তারপর বলল : তাহলে যাচ্ছ কোথায়?

বললুম : মজঃফরপুরে।

উপলক্ষ্য?

মাধবীর বিয়ে।

সে আবার কে?

বিনয়কে দেখেছ? আমার স্কুলের বন্ধু বিনয়! তারই মাসতুতো বোন।

আর সীতা হলেন মাধবীর বোন, এই তো!

না।

তবে?

সীতা হলেন রামের বোন। কিন্তু অযোধ্যায় না জন্মে রামের বোন হলেন কী করে, সেইটেই আশ্চর্যের কথা। তিনি জন্মেছেন জনকপুরে।

মনোরঞ্জন রেগে উঠে বলল: তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে গোপাল যে আজ আবোলতাবোল কথা বলছ!

বললুম: আবোলতাবোল বকছি না ভাই, ভেবেচিন্তেই বলছি। তুমি আসবার আগে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জাভা-যাত্রীর পত্র আমার মনে ছিল না, মনে এসেছিল সুনীতিবাবুর কথা। সম্প্রতি কোথাও তিনি বলেছিলেন যে রাম ও সীতা ভাইবোন ছিলেন এবং তাঁদের বিবাহ হয়েছিল।

মনোরঞ্জন বলল: একেবারেই বাজে কথা।

কেন?

আর কোন ভাইবোনের বিয়ে হল না, বিয়ে হল শুধু রাম সীতার? বললেই হল! আর সুনীতিবাবু বলেছেন বলেই আমরা মেনে নেব! মগের মুলুক নাকি!

বললুম: তাহলে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তা পড়ে দেখতে হয়।

বলে জাভা-যাত্রীর পত্র এনে সপ্তম পত্রটির কিছু অংশ শোনালুম।—

'রামায়ণ-মহাভারতের যে-সকল পাঠ এদেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাইবোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।'

মনোরঞ্জন সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে বললুমঃ আরও শোন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোন কোন জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্র পরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহ যোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে দুটি কন্যাই মানবী গর্ভজাত নয়—সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।'

মনোরঞ্জন বলে উঠলঃ সত্যিই তো, আমরা এই ভাবে রামায়ণ-মহাভারতের বিচার তো কখনও করি নি!

বললুমঃ সবটা পড়তে দাও আমাকে।

বলে পড়তে লাগলুম —

'সেই জন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হল-বিদারণ রেখাকে যদি কোন রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন, আর পরস্পর পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ।'

মনোরঞ্জন বললঃ সীতা শব্দের একটা অর্থ আছে না?

বললুমঃ শুনেছি হলরেখাকেই সীতা বলে। আর এইটেই আমার প্রশ্ন। সীতা রামের বোন হলে তার জন্মস্থান অযোধ্যা হওয়া উচিত।

কিন্তু তাঁকে হলরেখায় জন্ম বলে জনক রাজার রাজ্যে কেন নিয়ে যাওয়া হল ? দশরথজাতকে নাকি স্পষ্টভাবেই লেখা হয়েছে যে সীতা রামের বোন। রামায়ণে হরধনু ভঙ্গের কথা তোমার মনে আছে ?

আছে।

এই হরধনুটি জনক রাজা কোথায় পেয়েছিলেন ?

শিবের কাছে।

কেমন করে ?

মনোরঞ্জন বলল : অত শত মনে নেই।

তবে সেই কথাটি আমি তোমাকে রাজশেখর বসুর রামায়ণ থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

বলে বইখানা সংগ্রহ করে পড়লুম।—

'জনক বললেন, এই ধনু কেন আমার কাছে আছে শুনুন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার কালে এই ধনুর জ্যা কর্ষণ করে দেবগণকে বলেছিলেন, আমি যজ্ঞভাগ চাচ্ছি কিন্তু তোমরা তা দিচ্ছ না, সেইজন্য এই ধনুর দ্বারা তোমাদের শিরশ্ছেদন করব। দেবতারা ভয় পেয়ে স্তুতি করতে লাগলেন, তখন মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁদের এই ধনু দিলেন। দেবতারা তা আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রাখলেন।'

তারপর ?

'অনন্তর একদিন ক্ষেত্র কর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলের রেখা থেকে একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্র শোধনকালে হলরেখা থেকে উত্থিত এজন্য লোকে তাকে সীতা বলে। ভূতল থেকে উঠে সে আমার আত্মজা রূপে বড় হয়েছে। আমার এই অযোনিজা কন্যা বীর্যশুল্কা হবে এই স্থির করেছি।'

মনোরঞ্জন বলে উঠল : রাজা জমি চাষ করছিল কেন ?

বললুম : কুরুরাজাও তো কুরুক্ষেত্র চাষ করেছিলেন।

সে বোধহয় যজ্ঞের জন্যে। ধর্মকাজের জন্যে এ রকম বিধি

থাকতে পারে। কিন্তু জনক রাজা সে রকম কিছু করলে নিশ্চয়ই বলতেন।

বললুম : রবীন্দ্রনাথ একটা কথা ঠিক এর পরেই বলেছিলেন, সেটাও শোন।—

বলে পড়লুম—

'হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজে হয় নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।'

মনোরঞ্জন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললুম : আর একটু শোনো।

বলে পড়লুম—

'মহাভারতে খাণ্ডববন দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছিলেন।'

মনোরঞ্জন বলল : দাঁড়াও একটুখানি, ব্যাপারটা আমাকে বুঝে নিতে সময় দাও।

তারপর একটু ভেবে বলল : তুমি কি বলতে চাও যে পুরাকালের বনবাসী জীবনকে তাঁরা কৃষিনির্ভর জীবনে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন ?

বললুম : এ আমার নিজের মত নয় ভাই, তাই আমাকে এর ব্যাখ্যা করতে বোলো না। তবে অনেকে মনে করেন যে রাম আর্য সভ্যতা বিস্তারের জন্যেই দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। এর যুক্তি আমার কাছে

তেমন জোরালো মনে হয়নি। তেমনই রাম সীতা ভাই-বোন ছিলেন, তার কারণ সেকালের সমাজে এ রকম বিবাহ অশাস্ত্রীয় ছিল না। পরবর্তীকালে এ সত্য চাপা দেওয়া হয়েছে।

মনোরঞ্জন বলল : তাহলে কি এই দুটো কথাই তুমি আমাকে অস্বীকার করতে বল।

অবশ্য যদি তুমি আমার যুক্তি মেনে নাও।

হারানিধির দোকান থেকে দু গেলাস চা আমাদেব অনেক আগেই দিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা সেই কাপ নিতে এসেছিল দেখে বললুম : আর দু কাপ দিয়ে যেতে পারবি ?

মনোরঞ্জন বলল : আবাব চা কেন ?

বললুম : আলোচনাটা তাহলে জমবে ভাল।

ছেলেটা তখন চায়ের গেলাস নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম : দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারই যদি রামের উদ্দেশ্য হত, তাহলে তাঁকে বনবাসী হবার দরকার ছিল না এবং বানর সৈন্য সংগ্রহ করে লঙ্কা জয়েবও প্রয়োজন হত না। তিনি রাজা হয়ে সসৈন্যে গিয়ে দক্ষিণ ভারত জয় কবতে পারতেন মালিক কাফুরের মতো।

তাতে তাঁর গৌরব বাড়ত না।

কিন্তু ঘটনা সত্য হলে এই বকমই হত। এই জন্যেই বলছি যে রাম আর্য সভ্যতা বিস্তারে দক্ষিণ ভারতে যান নি, গিয়েছিলেন সীতা উদ্ধারে। তাই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁকে বানর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল, আর্যাবর্তের আর্য রাজাদের তিনি ডেকে আনবারও সুযোগ পান নি। লঙ্কায় তাই কুরুক্ষেত্রের মতো ভারত যুদ্ধ হয় নি। ভারতের আর্য রাজারা এসে সম্মিলিত হন নি, অনার্য রাজারাও সংঘবদ্ধ হন নি। এই যুদ্ধ হয়েছিল রামের সঙ্গে রাবণের। উদ্দেশ্য সীতা উদ্ধার।

মনোরঞ্জন বলল : এই বারে বল রাম-সীতা ভাই-বোন নন কেন সেই যুক্তি।

বললুম : কৃষ্ণা দ্রোপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল, এ কথা মহাভারতকার গোপন করেন নি। কিন্তু রামায়ণকার তা গোপন করলেন কেন? দশরথজাতকের রচয়িতা তা করলেন না এবং যবদ্বীপে যে রামায়ণ গেল তাতেও তা গোপন করা হল না। এর অর্থ কি এই বুঝতে হবে যে বাল্মীকি আধুনিক কালের কবি ছিলেন? তা হলে কত আধুনিক ছিলেন তিনি এবং রামায়ণের ঘটনা কত কালের পুরনো তাও বিচার করে দেখতে হবে।

মনোরঞ্জন বলল : তোমার কী মনে হয়?

বললুম : আমার যা মনে হয় তা আমার নিজের কথা নয়।

তবে কার কথা?

বেদের। ঋগ্বেদে যম ও যমীর সংলাপ আমার মনে পড়ছে।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি বেদ পড়েছ নাকি?

লজ্জিত ভাবে বললুম : সব কি পড়েছি! না, যা পড়েছি তার সবই বুঝে ফেলেছি! তবে কিছু ভাল কথা লিখে রেখেছি একখানা খাতায়।

বলে সেই খাতাখানা এনে বললুম : 'দশম মণ্ডলের দশম সূক্ত, যম ও যমী দেবতা এবং তাঁরাই ঋষি। এঁরা যমজ ভাইবোন। যমী যমকে বলছেন—

আমি এসেছি সখার কাছে সখ্যের জন্য
বিশাল এক সমুদ্রের মাঝে এই নির্জন দ্বীপে।
আমার সহচর তুমি জন্মাবধি।,
বিধাতার সংকল্পে আমরা তাঁর নাতির জন্ম দেব পৃথিবীতে

কিন্তু যম উত্তর দিচ্ছেন—

' এ কাজ যে আমরা আগে করিনি,
সত্যবাদী হয়ে মিথ্যা বলি কেমন করে?
গন্ধর্ব ও আপ্যাযোষা আমাদের উভয়েরই পিতামাতা,
তাই আমাদের সম্পর্ক বড় নিকট।

মনোরঞ্জন সবিস্ময়ে বলল : বেদে এই রকমের কথা আছে !

বললুম : আর একটু শোন। যমী এ কথা মানলেন না, তিনি বললেন—

আমাদের জনয়িতা দেব ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ,
মাতৃগর্ভেই তিনি আমাদের দম্পতি করেছেন।
তাঁর অভিপ্রায়ে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই কারও।
আমাদের এই সম্পর্ক জানে পৃথিবী ও আকাশ।

তারপর ?

যম কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না দেখে যমী বলছেন—

যমী আমি, আমাতে প্রবেশ করুক যমের কামনা।
এসো আমরা এক শয্যায় শয়ন করি।
পতির নিকটে পত্নীর মতো আমি দেহদান করছি,
এসো আমরা সহকর্মী হই রথের দুই চাকার মতো।

মনোরঞ্জন বলে উঠল : সাংঘাতিক কথা !

কিন্তু যম বলছেন—

না, আমার সঙ্গে মিলতে দিও না তোমার দেহ,
নিজের ভগিনীতে উপগত হওয়া পাপ।
মন ফেরাও অপরের সঙ্গে প্রমোদের জন্য,
হে সুন্দরী, তোমার ভাই করে না এমন কামনা।

এই পর্যন্ত পড়েই আমি খাতা বন্ধ করলুম। আর মনোরঞ্জন বলে উঠল : বুঝেছি। তুমি বলছ যে বেদের যুগেও ভাই বোনে বিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল না।

বললুম : আর এ যুগটা নিশ্চয়ই রামায়ণেরও আগের যুগ।

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথেরও কোন সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি সেকালের সমাজে ভাই বোনের বিয়ে হত, এই কথা না বলে বলেছেন যে এই বিবাহ রূপকমূলক এবং তা খুবই স্পষ্ট।

মনোরঞ্জন বলল: কিন্তু রূপক বলে শেষ পর্যন্ত মেলানো যায় কিনা জানি না। তবে তোমার যুক্তি মানলে এ কথাও মানতে হয়।

বললুম: রামায়ণের কাল নিয়েও পণ্ডিতদের অনেক কচকচি আছে।

কী রকম?

কেউ বলেন রামায়ণ মহাভারতের আগে, কেউ বলেন পরে।

মনোরঞ্জন বলল: কিন্তু ত্রেতা যুগ তো দ্বাপরের আগে, আর রামায়ণের ঘটনা যে ত্রেতার তাতে কোন সংশয় নেই।

বললুম: দ্বাপর আর ত্রেতা নিয়েই তো সংশয়। অনেক পণ্ডিতের মত যে দ্বাপর হল দ্বিতীয় যুগ, সত্য যুগের পর দ্বাপর, তারপর ত্রেতা অর্থাৎ তৃতীয় যুগ। দ্বাপর আর ত্রেতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই রকম।

মনোরঞ্জন বলে উঠল: আবার আমাকে বিপদে ফেললে দেখছি।

বিপদ শুধু তোমার নয়, বিপদ সবারই। আর পণ্ডিতদের কচকচি এই বিপদ নিয়েই। তবে চা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নাও। বুঝতে সুবিধা হবে।

বলে আমি নিজেই চায়ে চুমুক দিলুম আগে। বললুম: এই দ্বিতীয় ও তৃতীয়, যুগের এই দ্বি ও ত্রি দুটি অস্ত্র হাতে নিয়েই পণ্ডিতরা রায় দেন যে মহাভারতের কাহিনীটাই আগে, তার পর রামায়ণের কাহিনী। অনেক বিদেশী পণ্ডিতের মতও এই রকম।

মনোরঞ্জনও চায়ে চুমুক দিয়ে বলল: তুমি কি এক মত নও?

বললুম: না।

কেন?

দুটো শব্দ দিয়ে দুটো যুগ আগে পরে হতে পারে না। বরং উল্টোটা হওয়াই সম্ভব বেশি। অর্থাৎ যুগের নাম দুটোই হয়তো কোন অজ্ঞাত কারণে পাল্টে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে

দ্বিতীয় যুগটাকেই লোকে ত্রেতা বলতে শুরু করেছে, আর তৃতীয় যুগ ত্রেতাকে বলছে দ্বাপর।

যুক্তি?

অজ্ঞ লোকে নাম ভুল করতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাল আগে পরে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রায় সমস্ত পুরাণেই সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজাদেব নাম ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায়। তাতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যুগের। কাজেই এই রাজাদের নাম ধরে বিচার করলেই দেখা যায় যে সূর্যবংশে দাশরথী রামের বহু পুরুষ পরে বৃহদ্বল, যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হযেছেন। চন্দ্রবংশে যদুব বহু পবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পরে যদু নয়। কাজেই এই বিচারে কোন বকমেই রামায়ণকে মহাভারতের পবে বলা চলে না। তবে—

আমি আর এক চুমুক চ মুখে নেবাব জন্যে থামতেই মনোরঞ্জন বলল: তবে আবার কী?

রামায়ণ বা মহাভারতেব মধ্যে কোন্ কাব্যটি আগে বা পবে রচিত হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়।

কেন?

রামায়ণের ঘটনাটি খুবই পুরনো এবং মুখে মুখে প্রচলিত ও পল্লবিত হয়ে আসছিল। বাল্মীকি নামে কোন ঋষি হয়তো রামের কালে ছিলেন, যাঁর আশ্রমে সীতা জন্ম দিয়েছিলেন কুশ ও লবের। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি বাল্মীকি নাম নিয়ে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন তা অনুমান করা এখন সম্ভব নয়। তবে আরও অনেক কবি যে মাঝে মাঝেই শ্লোক রচনা করে মূল রামায়ণে প্রক্ষেপ করেছেন তাতে ভুল নেই। সমগ্র উত্তর কাণ্ডটিই নয়, আদি কাণ্ডেরও বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তা হবারই কথা।

কেন?

পুরাকালে কোন মুদ্রাযন্ত্র তো ছিল না যে বাল্মীকি রচিত রামায়ণখানি কেউ ছেপে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। লোকে পুঁথির আকারে হাতে লিখেই তা রক্ষা করত এবং সুযোগ পেলেই দু চারটে শ্লোক জুড়ে দিত। আমরা হলেও এই কাজ করতুম।

মনোরঞ্জন কোন প্রতিবাদ করল না, বলল : মহাভারতের বেলায় কি অন্য রকম হয়েছে ?

কিছু অন্য রকম। মানে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমকালীন ইতিহাস রচনার সময়ে তারই সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস জুড়ে দিয়ে নিজের শিষ্যদের অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। নিজের পুত্র শুকদেব, শিষ্য বৈশম্পায়ন, লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবা এঁরা সকলেই মহাভারত অধ্যয়ন করে প্রচার করেছিলেন প্রায় একই সঙ্গে। তাই রামায়ণ মূলত কাব্য এবং মহাভারত কাব্যে এই দেশের ইতিহাস। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ বেশি থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপাদানও অনেক বেশি। আর –

বল।

সংস্কারে আঘাত পেলে রাগ করবে না তো ?

না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলে বেদের মতো আমাদের একটি ধর্মগ্রন্থ। একবার আমি এই গীতাকে বেদব্যাসের রচনা বলে উল্লেখ করে গাল মন্দ খেয়েছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এই গীতা মহাভারতের মূল গ্রন্থে ছিল না। অনেক পরবর্তী কালে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের কালে বা গুপ্ত রাজাদের পূর্বে কোন অসাধারণ প্রতিভা-বান দার্শনিক কবি তাঁর নিজের রচনা পুরোপুরি ভাবে মহাভারতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুধু গীতা নয়, আরও অনেক জ্ঞানের কথা তিনি বা তাঁরই মতো অনেকে মহাভারতে প্রক্ষেপ করেছেন।

মনোরঞ্জন ভয়ে ভয়ে বলল : এই রকমের ভয়ঙ্কর কথা তুমি আর কারও কাছে বোলো না গোপাল, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে।

বললুম ঃ কিন্তু আমাকে ভুল বুঝলেও আমি লোকের কথায় ভুল বুঝতে চাই না। বেদব্যাসকে অনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন না। কিন্তু তাঁদের যুক্তি আমি জানি না। ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হলে এই চরিত্র এ রকম জীবন্ত ও অসাধারণ হয়ে উঠত না। তুলনায় বাল্মীকি অনেক নিষ্প্রভ।

মনোরঞ্জন তাঁর ঘড়ির দিকে তাকাতেই বললুম ঃ চা শেষ কর, আমি তোমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।

মনোরঞ্জন বলে উঠল ঃ না না, আমি ফেরার কথা· ভাবছি না। রামায়ণ সম্বন্ধেও তুমি কিছু নতুন কথা বল।

তা কি তোমার ভাল লাগবে ?

ভাল না লাগলেও ক্ষতি নেই কোন।

বললুম ঃ রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ এবং তার পরিণামের সঙ্গে সীতা হরণের মতো একটি কাহিনী জুড়ে দেওয়াও অসম্ভব মনে হয় না। রামায়ণের কাহিনীর মূলে ছিল একটি পারিবারিক বিরোধের কাহিনী—সপত্নীদের সঙ্গে স্বামীর, পিতার সঙ্গে পুত্রদের এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যেও। এই বিরোধকেই কবি একটা আদর্শ পরিবারের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। পিতৃমাতৃভক্তি, ভাইদের সদ্ভাব ও পতিভক্তি প্রভৃতি গুণ এমন ভাবে জুড়ে দেওয়া হল যে নায়ক-নায়িকা পরিণত হল আদর্শ চরিত্রে এবং পরবর্তী কালে তা দেবতার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কবিদের প্রক্ষেপের ফলেই রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। .

মনোরঞ্জন তার চা শেষ করে 'গেলাসটা নামিয়ে রাখল। আমিও তাই করে বললুম ঃ আমার কাছে এঁরা মানুষ হিসেবেই বড়, দেবতা হিসেবে নন। দেবতা তো কল্পনার জিনিস, আর মানুষ রক্ত মাংসে তৈরি জীবন্ত প্রাণী। তার আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেশি।

মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: চল, তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘরের বাহিরে বেরিয়ে মনোরঞ্জন প্রশ্ন করল: সত্যিই কি তুমি বিয়ে দেখতে যাচ্ছ?

বললুম: নতুন দেশ দেখতেও। সীতার জন্মস্থান জনকপুর শুনেছি কাছে। যেতে না পারলেও তার কথা জেনে আসব। আর গোরখপুর থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের কাছে জেনে নেব গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীর কথা।

আর?

নেপালের বিরাটনগর মহাভারতের বিরাট রাজার কিনা, তাও জানবার চেষ্টা করব। সুযোগ পেলে যাব কাঠমাণ্ডু উপত্যকায়। হিমালয়ের রূপ যদি দেখতে পাই তো জীবন সার্থক হয়েছে ভাবব।

বুঝেছি।

বলে মনোরঞ্জন স্টেশনের পথ ধরল। আমি নিঃশব্দে অনুসরণ করলুম তাকে।

৬

যাত্রাব আগেব কয়েকটা দিন কাটালুম পড়াশুনো করে। শনিবার বাড়ি থেকে বেরোলুম বিনয়েব পরামর্শ মতো। ব্যাগটা হাওড়া স্টেশনেব ক্লোকরুমে জমা দিয়ে অফিসে গেলুম। ফেরার সময় বিনয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্টেশনের বাইরেই। আমার হাতে কিছু না দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল : কি রে, খালি হাতে বেরিয়েছিস! তোর মতলবটা কী!

গম্ভীর ভাবে বললুম : আমার বোধহয় যাওয়া হল না।

কেন?

মনে হচ্ছে, তোদেব পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে খুবই অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে।

বিনয় বলল : বুঝেছি। খোসামোদ চাই তো! আয় আমার সঙ্গে।

কোথায়?

উত্তরপাড়া থেকে তোব জিনিসপত্র আনতে গেলে তো এ ট্রেন আর ধরা যাবে না, তাই টিকিটটা পরের ট্রেনের জন্যে বদল করা যায় কিনা দেখি।

তার আগে আমার সঙ্গে আয়।

কোথায়?

কোন খারাপ জায়গায় নয়।

বলে তাকে ক্লোকরূমে এনে নিজের ব্যাগটা বার করে নিলুম রসিদ আর পয়সা দিয়ে। বিনয় আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল : হাউ প্রেশাস ইউ আর!

হেসে বললুম ঃ তুই এখন সাহেব অফিসেব বড় সাহেব হয়েছিস, তাই না ?

ছোট সাহেব। কিন্তু কেন বল তো!

বাংলার বদলে ইংরিজী কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কিনা তাই বলছি। ইংবিজীতে স্বপ্ন দেখলেই খাঁটি সাহেব হয়ে যাবি।

বিনয় হেসে বলল ঃ এই কথা! কিন্তু তার জন্যে ভয় পাস নে। তোব বাঙালীপনার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করবার জন্যে ধুতি-পাঞ্জাবিও সঙ্গে এনেছি। আর—

আর কী ?

টিকিট কেটেছি জনতা ক্লাসেব।

কেন ?

তোর নাকি আজকাল নানা রকমেব অ্যালার্জি। ট্রেনে চড়াব ব্যাপারেও নাকি জনতা ক্লাস ছাড়া অন্য ক্লাসে উঠতে বাধা আছে!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ কে বলল এ সব কথা ?

বিনয় হেসে বলল ঃ হাবুলদাই তোর সম্বন্ধে সব কথা বলে গেছে।

কিন্তু আমার সঙ্গে তো হাবুলদার দেখা হয় নি দীর্ঘ কাল। হাবুলদা এ সব জানল কী করে ?

জানবার কি আর অসুবিধা আছে! তোব বইএ নাকি সবই লিখেছিস! সেই বই পড়েই সব জেনেছে।

হাবুলদা আমার বই পড়েছে!

পড়েছে মানে! পড়িয়েছেও অনেককে। তোব কাছে আসবাব জন্যে খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারে নি।

বিনয় বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিল। একটু দেখে শুনেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট আসন পেয়ে গেলুম। এই ট্রেনের নাম নর্থ বিহার এক্সপ্রেস, বিকেল সাড়ে চারটেয় হাওড়া থেকে ছেড়ে সকাল সাড়ে ছটায় পৌছবে মজঃফরপুরে। বিনয় বলল ঃ দূরত্ব জানিস ?

বললুম ঃ   না।

পাঁচশো সাতাশি কিলোমিটার। টিকিটের ওপরে লেখা দেখেছি।

আর মজঃফরপুর থেকে নেপাল বর্ডার ?

তা জানি নে।

আমি বলব ?

বল্।

বললুম ঃ   নিতান্ত কম নয়, একশো তিরিশ কিলোমিটার।

বিনয় আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ   তুই জানলি কী করে ?

তোব সঙ্গে যেতে হবে. বলে একখানা টাইম টেবল কিনে প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছি। হাওড়া থেকে রক্সৌলের দূরত্ব সাত শো সতেরো মাইল।

তাহলে শোধবোধ হয়ে গেল।

কী রকম ?

আমি তোকে টিকিট দেখে দূরত্ব বলেছি, আর তুই বললি টাইম টেবল দেখে।

বললুম ঃ   কিন্তু রক্সৌলে যাবাব সোজা পথটা মজঃফরপুরের ওপর দিয়ে নয়, সেটা দ্বাবভাঙ্গার ওপর দিয়ে।

কেন ?

আমরা বড লাইনের ট্রেনে মোকামার কাছে গঙ্গার পুল পেরিয়ে বরৌনি সমস্তিপুর হয়ে মজঃফরপুব যাচ্ছি। কিন্তু রক্সৌল হল ছোট লাইনের স্টেশন। তাই মজঃফরপুব পর্যন্ত না গিয়ে সমস্তিপুরে নেমেই রক্সৌলেব ট্রেন ধরা যায়। পাটনার মহেন্দ্রঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে পালেজা ঘাট থেকে ট্রেন ধরলে সেই ট্রেনও সমস্তিপুরের ওপর দিয়ে রক্সৌলে পৌছবে।

বিনয় বলল ঃ   তবে কি আমাদের দ্বারভাঙ্গায় যেতে হবে নাকি ?

না। মজঃফরপুর থেকে আমরা সগৌলি যাব, সেখানে গাড়ি বদল করে রক্সৌল।

বড় গোলমেলে ব্যাপার তো !

বললুম : আমাদের আর ভাবনা কী ! হাবুলদাই তো ব্যবস্থা করবে বলেছিস।

তা করবে। কিন্তু নামা ওঠা তো করতে হবে অনেক ! একেই ট্রেন চলে টিকিয়ে টিকিয়ে, তারপর আবার স্টেশনে বসে থাকা। তার চেয়ে গাড়িতে যাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিয়ে দেখব। তাহলে আর ভাবনা থাকবে না, সোজা কাঠমাণ্ডু।

বললুম : তাতে কিন্তু বেড়াবার আনন্দ অনেক কমে যাবে।

কেন ?

ভ্রমণের আনন্দ তো পথে ছড়িয়ে আছে, চোখ বেঁধে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে কি আনন্দের সবটুকু পাওয়া যায় !

বিনয় খানিকক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, তারপর বলল : হাবুলদা ঠিকই বলেছে, ভ্রমণের ব্যাপারে তোব নানা রকমের অ্যালার্জি আছে।

বললুম : একে অ্যালার্জি বলছিস কেন ?

যা স্বাভাবিক নয়, তারই নাম অ্যালার্জি।

এই যে তোর সঙ্গে আমি গল্প কবতে করতে চলেছি, এটা কি স্বাভাবিক নয় ? এই যে এত যাত্রী চলেছে আমাদের সঙ্গে, তাদের পাঁচজনের আলাপ হবে, পরিচয় হবে, ঘনিষ্ঠতা হবে। এমন কি দু একজনের সঙ্গে পরিচয় চিরস্থায়ী হবে, এ সব কি তোর মতে স্বাভাবিক নয় ?

ট্রেনে না গিয়ে মোটরে গেলে তা হবে না কেন ?

মোটরে তো এত লোক যেতে পারে না ! আর যে লোকটা মোটর চালায়, সে নিজের খুশি মতো চালায়। তার পথের কোন টাইম টেবল নেই বলে আমরা জানতে পারি না সে কোন্ পথে চলেছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, থামবে কোথায় ! মোটরে আমাদের নিজেদের কোন স্বাধীনতা নেই, ড্রাইভারের ইচ্ছে মতো আমাদের চলতে হয়।

বিনয় বলল : এখানেও তো তাই !

না। এই ট্রেনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট পথে। আমরা পথের দু ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামতে থামতে শেষ পর্যন্ত যাব। যেখান থেকে ইচ্ছে উঠব, যেখানে ইচ্ছে নামব। এই ট্রেনে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই সমান। তোমার মতো কোন সাহেব যদি ট্রেনটাকে ঘুরে যেতে বলে তো সে গ্রাহ্যই করবে না।

বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

'তুমি হলে জনতার প্রতিনিধি। জনতার সুখ দুঃখ নিয়েই তোমার কারবার।

হেসে বললুম : কারবাব ব্যাপাবটাই জনতার। কিন্তু দুঃখ এই যে সেই কারবাব পবিচালনাব অধিকাব নেই জনতার হাতে। তারা নাচে, কিন্তু যারা তাদের মাথায় বাঁধা সুতো ধবে নাচায়, তাদের আমরা দেখতে পাই নে।

বিনয় বলল : বেশ গোলমেলে কথা।

বললুম : খুব সরল কথা। আজ আমি রাজার হালে যাচ্ছি কেমন করে ? তোর সঙ্গে যাচ্ছি বলেই তো !

একে তুই রাজার হালে যাওয়া বলিস !

কেন বলব না ! লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হল না, যুদ্ধ করতে হল না গাড়িতে একটুখানি জায়গা পাবার জন্যে, জানালার বদলে খোলা দরজা দিয়ে গাড়িতে ঢুকে এই ভাবে জাঁকিয়ে বসে গল্প করছি তোর সঙ্গে—এ কি রাজার হাল নয় ! পারতুম আমি নিজে এই রকম ব্যবস্থা করতে !

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছিল। বিনয়েব গাড়ির ড্রাইভার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বেয়ারা এসে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে, সুটকেস থেকে বার করে দিয়েছে বাতের পোশাক। তারপর ক্যাব রোডে গাড়িতে ফিরে গিয়ে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়েছে ফেরার

কথা জানবার জন্যে। বিনয় তার দিকে চেয়ে বলল : সোমবার ভোর ছটায় ফিরব। সময় মতো গাড়ি এনো।

ট্রেন ছাড়ার নানা রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। এইবারে গাড়ি একটু দুলে উঠতেই বিনয়ের ড্রাইভার তাকে সেলাম করে ফিরে গেল। আমি মনে মনে বললুম : দুর্গা দুর্গা।

বিনয় পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

সিগারেটে কয়েকটা টান দেবার পর বিনয় জিজ্ঞাসা করল : আমাদের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেলেছিস তো? মানে ট্রাভেলের একটা ইটিনেরারি?

বললুম : তোর ইচ্ছের কথা বল। টাইম টেবল আমার সঙ্গেই আছে।

বলে ব্যাগ থেকে টাইম টেবলখানা বার করে ফেললুম।

বিনয় বলল : প্রথম তিনটে দিন আমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে বিয়েয়। থার্ড ডে বিকেলের দিকেই কাট্ করতে পারব বলে মনে হয়। তার মানে প্রথম দিন গায়ে হলুদ-ফলুদ কী সব আছে, তারপর বরযাত্রীর দেখাশুনো। বিয়ের দিন মানে সোমবার তো এক্সট্রিম্লি বীজি। মঙ্গলবার বরযাত্রী বিদেয় করে ছুটি। ফুলশয্যার তত্ত্বতত্ত্ব ট্রেনে তুলে দিলে হাবুলদারও ছুটি হয়ে যাবে।

বরযাত্রী আসছে কোথা থেকে?

বোধহয় বেনারস থেকে।

বললুম : তাহলে আমাদের হাতে থাকবে চার দিনের মতো সময়, নেপালে মাত্র তিনটে দিন।

এনাফ্।

হেসে বললুম : কাঠমাণ্ডু উপত্যকা দেখবার জন্যে যথেষ্ট সময় হতে পারে, কিন্তু আর কিছু দেখা হবে না।

বিনয় আশ্চর্য হয়ে বলল : আরও কিছু দেখবার আছে নাকি?

পোখরা উপত্যকা থেকে হিমালয়ের দৃশ্য শুনেছি অপূর্ব, আর নাম্‌চে বাজার থেকে মাউণ্ট এভারেস্টের দৃশ্য।

বিনয় রেগে গিয়ে বলল : মাউণ্ট এভারেস্টে উঠলে নাকি আরও সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

তার রাগ দেখে আমার হাসি পেল। আমি হেসে ফেললুম।

বিনয় বলল : হাসছিস যে ?

বললুম : সে দৃশ্য দেখতে হলে মাউণ্ট এভারেস্টে উঠতে হবে কেন! কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেনে ফিরলেই তা দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্ত আকাশ জুড়ে হিমালয়!

বিনয় খুশী হল অপরিমিত, বলল : আইডিয়া! কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতায় আমরা প্লেনেই ফিরব।

আমরা নয়, বল্‌ আমি।

কেন ?

কষ্ট করে ফেরার আনন্দ আর এক রকমের। ফিরতে দেরি হলে অফিসের ঝামেলা, চাকরি নিয়ে টানাটানি—তারও এক রকমের আনন্দ আছে। এই সব নিয়েই তো আনন্দে আছি।

বিনয় বলল : তোর আনন্দের ধারণা সংসারী মানুষের মতো নয়।

সংসার থাকলে তো সংসারী মানুষের মতো হবে!

আর কতকাল এইভাবে দোকানের চা আর হোটেলের ভাত খেয়ে কাটাবি গোপাল! কথা শোন্‌। এইবারে বিয়ে কর্‌ একটা। মাধবীর বিয়েয় তো অনেক মেয়ে আসবে, পছন্দ করে ফেল্‌ একজনকে।

হেসে বললুম : আমি পছন্দ করলেই সে আমাকে পছন্দ করবে কেন ?

তাদেরও তো একজনকে পছন্দ করা দরকার!

কেন, তোর মতো শাঁসালো পাত্র থাকতে তাদের ভাবনা কী!

বিনয় যেন আঁতকে উঠে বলল : আমাকে ও কাজ করতে বলিস না।

কেন ?

আমি বেশ আছি। বেশ ঝাড়া ঝাপ্‌টা।

তবে আমার পায়ে বেড়ি পরাতে চাইছিস কেন ?

তোর যে ঘরে ভাত জোটে না। মাসিমা বেঁচে থাকলে কি আর এই পরামর্শ দিতাম !

বললুম : অপরকে পরামর্শ দিতে সবাই ভালবাসে, কিন্তু নিজে কেউ কারও পরামর্শ নিতে চায় না। আর আশ্চর্যের কথা হল যে লোকে অন্যকে পরামর্শ দেবার সময় এই কথাটি মনে রাখে না।

বিনয় বলল : তবে এ সব কথা থাক। তোর টাইম টেবল দেখে ইটিনেরারিটা তৈরি করে ফেল্‌। সময়-টময়গুলো জানা থাকলে সেই ভাবেই প্রসীড্‌ করতে পারব।

আমি পাতা উল্টে ঠিক জায়গাটা বার করে বললুম : বরযাত্রী যখন বেনারস থেকে আসছে, তখন বোধহয় তাদের শোনপুরের গাড়িতে তুলে দিতে হবে। মজঃফরপুর থেকে শোনপুর দেখছি উনষাট কিলোমিটার, সকালের দিকেও ট্রেন আছে দেখছি।

বিনয় বলল : বরযাত্রীর কথা হাবুলদা ভাববে, তুই আমাদের ট্রেন দেখ্‌।

বললুম : মজঃফরপুর থেকে রক্সৌলের তো কোন ট্রেন নেই, আমাদের সগৌলি যেতে হবে। একটা ট্রেন সকাল সাতটায়, আর একটা রাত সাড়ে দশটায়। রাতের ট্রেনটা ধরলে পরদিন বিকেলেই কাঠমাণ্ডু পৌঁছানো যাবে।

আর সকালেরটা ধরতে পারলে—

লাভ হবে না কিছু।

কেন ?

দুপুরের দিকে রক্সৌলে পৌঁছলে সেখানেই রাত্রিবাস করতে হবে।

বিনয় বলল : রাতের ট্রেন মানেই সারা রাত জাগা।

বললুম : ভাল সঙ্গী থাকলে তাতেই তো আনন্দ।

কিন্তু রাত তো জেগে কাটাবার জন্যে নয়, ঘরে শুয়ে ঘুমোবার জন্যে। দিনের বেলাতেও তো সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দ পাওয়া যায়!

আবার নিরাশ্রয় দরিদ্র তো খোলা আ'কাশের নিচেই অকাতরে ঘুমোয়। ঘুম কারও কেনা গোলাম নয়, ঘুমেরই গোলামি করতে হয় সবাইকে।

বিনয় বলল: তর্কে তোকে আমি কোন দিনই হারাতে পারি নি, আজও পারব না। বিষয়টা ভোটে দিলেই হারজিৎ জানা যাবে।

যারা ঘবে শুয়ে ঘুমোতে চায়, তারাও ভোট দেবে নাকি?

ক্ষতি কী?

তাহলে আমি এখনই হার স্বীকাব কবছি।

বিনয় খুশী হয়ে বলল: এইবারে আর একটা বিষয়ে হার স্বীকার করলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

কোন্ বিষয়ে?

সংসারী হতে তোর আপত্তিটা কিসেব?

হেসে বললুম: সংসার চালাতে পারব না বলে!

লোকে কি সংসার চালায় না?

অনেকেরই সংসার চলাকে চলা বলে না, জোব করে তাকেও চলা বললে অচল কাকে বলে তা জানি না। কিন্তু সত্যি করে বল্ তো, আমার সংসার করা নিয়ে তুই এমন মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

বিনয় সহাস্যে বলল: আমার উপবে দায়িত্ব পড়েছে অনেকখানি।

মানে?

মানে খুব সোজা। মায়ের আদেশ, তুই বিয়ে করছিস না কেন তা জেনে নিতে হবে। রাঙা মাসির মেয়ে নীরার জন্যে একটি সৎ পাত্রের দরকার। মাকে চিঠি লিখেছে রাঙা মাসি, কলকাতায় পাত্র হলেই ভাল। রিটায়ার করে মেসো কলকাতায় চলে আসবে গোরখপুর থেকে। শেষ বয়সে মেয়ে জামাই তাঁদের দেখবে।

রাঙা মাসির ছেলে নেই বুঝি

জানি নে।

তবে ?

ছেলে থাকলেই কি বুড়ো বাপ-মাকে দেখে কোন দিন। সব বাপ-মায়েরাই তো ভাবে যে বিয়ে দিলেই ছেলে তার বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে, নয় বিদেশে চাকরি করতে গিয়ে মেম বিয়ে করে সেখানেই থেকে যাবে।

বললুম : তোর সম্পর্কেও কি মাসিমার এই ধারণা ?

বোধহয় তাই !

কেন ?

তিনিও বোধহয় ভাবেন যে বাপের পয়সা আছে বলেই আমি মায়ের সংসারে আছি। তা না হলে অনেক দিন আগেই ভিন্ন হয়ে যেতাম।

বলে হাসতে লাগল।

কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : এ হাসির কথা নয় ভাই, অনেকেই আজকাল এই রকম ভাবছেন। বড় পরিবার ভেঙে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ত্যাগ দিয়ে ভোগ করবার উপদেশ আজকাল হাসির কথা বলেই মনে হয়।

বিনয় বলল : কেন এমন হচ্ছে বলতে পারিস ?

বললুম : এ তো এক দিনের কথা নয়। সমাজটা আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

এর কারণ কি অর্থনৈতিক নয় ?

অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা আছে বৈকি। শিক্ষার সঙ্গেও আছে। কিন্তু থাক এ সব কথা, আমরা অন্য কিছু আলোচনা করি।

বিনয় বলল : সেই ভাল।

বললুম : মঙ্গলবার রাতের ট্রেন ধরতে পারলে আমরা বুধবার সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছব কাঠমাণ্ডু শহরে। সেখান থেকে রবিবার

বেরোলে কি আমরা সোমবার সকালে কলকাতায় পৌঁছতে পারব ?

অসম্ভব।

কেন ?

মজঃফবপুর থেকে রবিবার দুপুরে আমাদেব মিথিলা এক্সপ্রেস ধরতে হবে। তবেই আমরা কলকাতায় পৌঁছব' সোমবার ছটা চল্লিশে। সেই ট্রেনের টিকিট আমাদের কাটা আছে।

বললুম ঃ তার মানে শনিবার সকালে আমাদের কাঠমাণ্ডু ছাড়তে হবে, বৃহস্পতি আর শুক্র এই দুটো দিন আমরা নেপালে কাটাতে পাবব।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

কিন্তু বিনয় একটুও ক্ষুণ্ণ হল না। বলল ঃ একটা শহর দেখবার জন্যে এর বেশি সময়ের দবকার নেই। বৃহস্পতিবার সকালে ব্রেকফাস্ট সেবে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে লাঞ্চের আগেই শহরটা দেখা হয়ে যাবে।

বললুম ঃ শহর দেখা হবে, কিন্তু নেপাল দেখা হবে না।

বিনয় বলল ঃ নেপালে তো ঐ একটাই শহর।

বলে তাব সিগারেটের পোড়া টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দিনের আলোয় ট্রেন ছুটে চলেছে। এর পরে অন্ধকার নামবে। অন্ধকারেও ট্রেন ছুটবে এই রকম করেই। দিনে রাত্রে তার গতির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমরা একটানা ছুটতে পারি না। দিনে ছুটলে রাতে ঘুমিয়ে পড়ি, আর রাতে ছোটবার চেষ্টা করলে হোঁচট খাই অন্ধকারে। টাইম টেবলটা মুড়ে আমি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলুম।

৭

আসানসোলে এই ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। যাত্রীরা প্রায় সবাই এখানে রাতেব খাবার খেলেন। কেউ স্টেশনের খাবার, কেউ বাড়ি থেকে আনা খাবাব। বিনয় তার সঙ্গে খাবার এনেছিল। আমাব জন্যেও। বোতলে জলও এনেছিল।

রাত নটার পর ট্রেন ছাড়ল। সমস্তিপুর পৌছবে সকাল পাঁচটার পব, আব সাড়ে ছটাব পব মজঃফবপুর। বিনয় বলল ঃ এইবারে একটা লম্বা ঘুম দে।

তার কথা শুনে আমার হাসি পেল। কিন্তু সে হাসি আমি মুখ ফিরিয়ে গোপন করলুম। রাতে ঘুমোবাব প্রত্যাশা নিয়ে আমরা ঘরের বাইরে বেরোই না। ঘর যখন ছাড়ি, তখন এই বিশ্বাস নিয়েই চলি যে নিয়ম মতো কিছুই জুটবে না। এ রকমের আহার বা ঘুম--এর কোন াই না। তার জন্যে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। পেট ভরা ক্ষুধা আর নিদ্রাহীন রাত কাটাতে আমরা ভয় পাই নে। এর পরে যে আনন্দ আছে, তারই লোভে মন ভরে থাকে। আমি তাই বিনয়ের কথার উত্তর না দিয়ে শোবাব জন্যে উপরে উঠে পড়লুম।

আমি জানি এখন আমার ঘুম কিছুতেই আসবে না, তাব বদলে অনেক পুরনো কথা মনে আসবে ভিড় করে। অনেক সুখের কথা, অনেক দুঃখের কথা, সুখদুঃখে মেলানো অনেক ভাবনার কথাও।

ব্যাগটা আমি সঙ্গে নিয়েই উপরে উঠি। একখানা চাদর বিছিয়ে একটা বালিশ ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিলুম। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। এ শৌখিনতা আমাব নতুন। স্বাতিদের সঙ্গে ভ্রমণ করে এই শৌখিনতার অভ্যাস হয়েছে। তারাই আমাকে চাদর ও বালিশ জুগিয়েছে। তাদের সাহায্য আর নেব না বলেই এই ব্যবস্থা করেছি।

সাহায্য না নিলেও তাদের বর্জন তো করতে পারছি না। ঘুরে ফিরে তাদের কথাই মনে আসে কেন! বম্বেতে যেদিন আমি স্বাতিকে ছেড়ে এসেছিলুম, সেদিন কি আমি কোন স্বপ্ন নিয়ে ফিরেছিলুম! সেদিনের সেই বিদায়ের ক্ষণটি আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের জনবহুল প্ল্যাটফর্মে মামা-মামী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্তে আমি তাঁদের প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে গার্ডের দরজার কাছে চলে এল, তারপর প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি দূরে সরে গিয়েছিলুম, আর মুখ তুলে স্বাতি হেসেছিল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেঁদনায় ভরে গিয়েছিল। বড় অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে, গার্ডের বাঁশি বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও শুনতে পেয়েছিলুম, নিজের ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জানো না গোপালদা, তাই এমন ভয় পাও। তোমার সম্পত্তি কি কেনা হয়ে যায় নি!

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। হাতল ধরে আমি উঠে পড়েছিলুম। তার পরে ফিরে দেখেছিলুম স্বাতিকে। স্বাতিও সরে দাঁড়িয়েছে। তার দু চোখের দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমি তার কথা ভুল শুনি নি। আমার অতীত আর বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চাইছিল।

সেদিন আমি ভেবেছিলুম, আর আমার কোন ভয় থাকা উচিত নয়। জো রায়ের সঙ্গে সে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াক। তার মন নিশ্চয়ই আমার মনে বাঁধা পড়ে গেছে, জগতের সেরা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। হোক কথা, হোক কল্পনা, জীবনের চেয়ে স্বপ্নেই যে সুখ বেশি। সেই সুখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে এসেছিলুম।

তারপর কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল আমার

স্বপ্ন। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়ে হচ্ছে জেনে আমি নতুন করে বুঝেছিলুম যে মানুষ চেনার গর্ব আমার আর রইল না। যা জেনেছি আর যা বুঝেছি বলে আমার ধারণা ছিল, তা ভুল। ভুলের ওপরেই আমি আশার ঘর বেঁধেছিলুম নির্বোধের মতো। আজ আবার নতুন করে আমাব পুরনো ঘটনা মনে পড়তে লাগল।

জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার গাড়িতে। তিনি মিঠাপুব যাচ্ছিলেন তাঁর কোম্পানির কাজে, আর আমরা সেই গাড়িতেই উঠেছিলুম। মামা মামী স্বাতি আর আমি। জো রায় মিঠাপুরে নামতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গে ওখায় গেলেন, গেলেন বেট দ্বারকায়। ফিরলেনও আমাদের সঙ্গে। স্বাতিকে যত খুশী করবার চেষ্টা করেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন মামা মামীকে। মামীকে জয় করতেও পেরেছিলেন। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার তাঁকে চিনতেন, তাঁর দোষ গুণ সবই জানতেন ভাল করে। তাই তাঁকেও হাত করেছিলেন ঘুষ দিয়ে। আমার ঠিকানাও তাঁর নোটবুকে লেখা আছে। দরকার হলে আমার সাহায্যও প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তার দরকার হল না।

সোমনাথে আমি মূর্খের মতো ভেবেছিলুম, জো রায়কে বুঝি হারিয়ে দিতে পেরেছি। মামীর ব্যবহারেই তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল আজ তা বুঝতে পারছি।

এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বাজনীতিতে, সমাজচেতনায় হয় নি। আজও ভারতের অস্থি মজ্জায় পরাধীন সত্তার গ্লানি লেগে আছে। আজও আমরা মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি না, বিচার করি তার অর্থ সামর্থ্যে, তার সরকারী প্রতিপত্তি দেখে। এ দেশ আরও অনেক দিন পয়সার পুজা করবে।

আমি আশ্চর্য হয়েছি মামার কথা ভেবে। জো রায়কে তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর কথাবার্তাতেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি এ বিয়েতে রাজী হলেন কী করে! তবে কি স্বাতি নিজেই আগে রাজী হয়ে গেল.! সেও কি সম্ভব!

না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। স্বাতি আর যাই করুক, নিজেকে সে এমন ভাবে ঠকাবে না। জো রায় সম্বন্ধে; তার মনের কথা তো আমি জানি। নিশ্চয়ই সে তাকে নিয়ে খেলা করেছে। কিন্তু কেন তা করবে! সে তো তেমন মেয়ে নয়!

স্বাতি অনেক দিন আমাকে চিঠি পত্র দেয় নি। চিঠি সে কমই লেখে। কিন্তু এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সামান্য আভাসও আমাকে দেয় নি দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আমার সম্বন্ধে তার দুর্বলতার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার বিরাগের ইঙ্গিত। গির্নার পাহাড়ের উপরকোটে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করেছিল, এমন হাল্কা ভাবে আর কত কাল কাটাবে? বলেছিল, বড় অপমান বোধ হয়। আমি কি খেলার জিনিস, না বাজারের পণ্য? সেই সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না? তার পর নিজেই বলেছিল, এ যুগের বিচারে সত্যিই তোমার কোন দাম নেই।

আমি বলেছিলুম এ যুগ এক দিন বদলাবে, আর ঐখেনেই আমার সান্ত্বনা।

স্বাতির দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখেছিলুম। তাই তাকে বলেছিলুম, জান স্বাতি, স্বাধীনতা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। বুকের রক্ত ঢেলে আদায় করি নি বলেই স্বাধীনতার মর্ম আমরা বুঝি না। কিছু দিন যাক, চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে সবই আমরা বুঝতে পারব।

শান্ত গলায় স্বাতি বলেছিল, সেদিন আর ঝগড়া করতে আসব না। তারপরেই সে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসি। বলেছিল, তুমি কী বোকা গোপালদা।

তার সেদিনের আচরণও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে এ হেঁয়ালি নয়, এইটেই বুঝি তার সত্য

রূপ। ছলনা সমস্ত নারীরই প্রকৃতি। স্বাতি তো এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নারীর খণ্ড রূপকেই একটা সম্পূর্ণতা দিতে সেও সাহায্য করে। মায়াবিনী নারী!

আর এক দিনের মতো আজও আমি নিজেকে ধিক্কার দিলুম। ছি ছি, স্বাতির সম্বন্ধে এ আমি কী ভাবছি! আমি তাকে ভুল বুঝব! তার পরিহাসকে সত্য ভেবে আমি তার এত দিনের আন্তরিকতার অমর্যাদা করব মূর্খের মতো! স্বাতি আমাকে কী ভাববে!

তার পরে একটা নতুন প্রশ্ন এল আমার মনে। আমি নিজে কি স্বাতির প্রতি অবিচার করি নি! আমি যখন খবর পেয়েছিলুম যে স্বাতির বিয়ে হচ্ছে জো রায়ের সঙ্গে, তখন কি আমার কোন কর্তব্য ছিল না? জানা উচিত ছিল না স্বাতি স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করছে, না মুখ ফুটে বলতে পারে নি তার মনের কথা? জো রায়ের সম্বন্ধে স্বাতির মনের কথা তো আমি জানতুম! আমি বম্বে ছেড়ে চলে আসার পর কি তার মত পাল্টে গিয়েছিল?

সৌরাষ্ট্র ভ্রমণের অনেক খুঁটিনাটি কথা আমার মনে পড়তে লাগল। ঘটনা সামান্য হলেও তা গভীর অর্থবহ। এই সব ছোট ঘটনা বিশ্লেষণ করেও একটা সত্য আবিষ্কার করা যায়।

ওখা থেকে আমরা রাজকোটের ট্রেনে উঠেছিলুম সোমনাথে যাবার জন্যে। প্রথম শ্রেণীর কামরা একখানা খালি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে চারজনের জায়গা। জো রায় জামনগর পর্যন্ত যাবেন। তাই তাঁর স্থান হয়েছিল পাশের কামরায়। জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে জো রায় নিচে নেমে বললেন, আসছি। আর ইসারায় আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করতে যাচ্ছিলুম বলে মামা বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বললুম, মিস্টার রায়কে দেখে আসছি। কিন্তু মামা আমাকে বিশ্বাস করলেও স্বাতি করল না, আমার মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি মেলে রইল। দৃষ্টিতেই আমি তার উত্তর দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলুম।

পাশের ফাঁকা গাড়িতে আমাকে ডেকে নিয়ে জো রায় আমার ঠিকানা চাইলেন। আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে বললেন, কেন এমন না বোঝার ভান করছেন! জজ সাহেবের কাছে আর্জি থাকলে পেশকারের কাছেই তা পেশ করতে হয়!

নিজের সম্বন্ধেও তিনি যা বলেছিলেন তা আমার মনে আছে। বলেছিলেন, সে মশাই অবিশ্বাস্য ঘটনা। কলকাতা থেকে বিলেত। দেশ থেকে বিদেয় করে বাবা ভাবলেন, নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু মা এদিকে পা ছুঁইয়ে নানা রকম প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। আমি যাই কোথায় বলুন!

সব কথা না বুঝেও আমি গম্ভীর ভাবে বলেছিলুম, খুব সত্যি কথা। জো রায় খুশী হয়ে বলেছিলেন, এ সব কথা আবার বুড়ো বুড়ির কাছে বলবেন না যেন! তাঁরা যে স্কুলের তাতে আমার পরকালটা নষ্ট হবে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে স্বাতি আমাদের দেখছিল। তার উপর আমার চোখ পড়তেই সরে গেল। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল নিজের অজ্ঞাতসারে। তার প্রতি জো রায়ের প্রবল আকর্ষণের কারণ আমি মেনে নিলুম। কিন্তু জো রায় স্বাতিকে দেখতে পান নি। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখছেন?

বললুম, একটি মেয়ে যাত্রীকে। মেয়ে যাত্রী! বলেই জো রায় লাফিয়ে উঠেই জানালার কাছে গেলেন দেখতে। কিন্তু স্বাতিকে বোধহয় দেখতে পান নি। আমি তাঁর ভিতর ও বাহির দুটোই বোধ হয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলুম। তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ দিকে বদলি হয়ে এলেন কেন? প্রচুর ক্ষোভের সঙ্গে জো উত্তর দিলেন, আর বলবেন না, লক্ষ্মীছাড়ারা কিছুতেই সেখানে থাকতে দিল না। বলে, আমি নাকি অফিসের চেয়ে ক্লাবে কাটাই বেশি সময়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলে না।

আমার আর একটা কথা জানবার ছিল। তাই জিজ্ঞাসা

করেছিলুম, আপনার বাবা কী বলেন? তাচ্ছিল্যের সুরে জো বললেন, সব সময়েই বলেন, তোর চাকরি যাবে। যেন ওঁর জন্যেই আমার চাকরিটা আছে!

চাকরিতে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় আমি পেয়েছি। কাজ করতে এসে কাজের কথা ভুলে গেলেন। আমি নিশ্চয়ই জানি, ফেরার পথেও তিনি মিঠাপুরে নামবেন না। দায়িত্বশীল পদে অবহেলার অবকাশ নেই, তাইতেই বেশি মান, বেশি মাইনে। আমরা যখন সামান্য টাকা হাত পেতে নিই আর তুলনা করি বড সাহেবসুবোর সঙ্গে, তখন আমাদেব এই উত্তরই শুনতে হয়।

এই কয়েকটা টুকরো কথায় ও ঘটনায় জো রায়ের চবিত্র আমার কাছে কতকটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ সব কথা আমি কাউকে বলি নি। স্বাতিকেও না। আমার মনে হয়েছিল যে এ সব কথা কাউকে বললে নিজের কোন অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়বে, হয়তো নিজের কোন প্রচ্ছন্ন বাসনাব কথাও। তাই আমি নিজে কিছু প্রকাশ না করে অন্যের ভাবনা অনুভবের চেষ্টা করেছিলুম সযত্নে।

মিঠাপুরে জো রায় নামলেন না। তাঁর কোম্পানীর লোকজন এসেছিল অনেক খাতা পত্র ও ফাইল নিয়ে। জো রায় লাফিয়ে নেমে সেই সব কাগজ পত্রে এলোপাতাড়ি সই করতে লাগলেন। বইখাতা বেয়ারার হাতে, এক ভদ্রলোক পাতা ওল্টাচ্ছেন, আর সই করছেন জো রায়। মাঝে মাঝে বলছেন, বড় নোংরা বিশ্রী লেখা।

জো রায় যে কৈফিয়ৎ চান না ভদ্রলোক তা জানেন। তাই বললেন, খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি, ওরে ও মদনরাম—

আমি অন্য দিকেও কান রেখেছিলুম। মামী মামাকে বলছিলেন চুপিচুপি, বেশ ছেলেটি, তাই না? মামা গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, হুঁ। মামী বললেন, এত বড় চাকরি করে, অথচ অহঙ্কার নেই এতটুকু।

মামা এবারেও বললেন, হুঁ। আর মামী পরামর্শ দিলেন, ওর ঠিকানাটা লিখে রাখো, সেই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

স্বাতির দিকে চেয়ে আমার হাসি পেয়েছিল। দেখেছিলুম যে ডান পায়ের উপরে বাঁ পা তুলে সে দোলাতে শুরু করেছে। বসেছে সোজা হয়ে, বেশ গর্বের ভঙ্গীতে। আমি তাকাতেই সে একটা কটাক্ষ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তার একটা দাম আছে, যা আমি ছাড়া আর সবাই ভাল বোঝে। আমি কিছু বললুম না দেখে স্বাতি নিজেই বলেছিল, কেমন দেখছ? বলেছিলুম, ভাল। আর সে বলেছিল, ভাল মানে?

এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, ঠিক বড় লোকের দুর্গাপূজার মতো। চমৎকার মূর্তি, ঢাকঢোল, হৈ-হৈ রৈ-রৈ, গড় হয়ে প্রণাম করছে সবাই। তারপরেই বিসর্জন একেবারে এঁদো ডোবার পচা জলে, বরাত জোর থাকলে নদীতে। আর তারই পাশে গরিবের ঘরে লক্ষ্মীর পটের কথা ভাবো। ঘরের এক কোণে কিংবা উঠোনে গাছের নিচে লক্ষ্মীর একটুখানি উঁচু জায়গা, সিঁদুর লেপা, তার ওপর দুটো ফুল। কিন্তু পরিবারের সবাই তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। এক দিন দু দিন নয়, সারা জীবন, বোধহয় জন্মান্তরেও। সেই তো পুজো, সেই তো প্রেম।

শেষ শব্দটি বলবার সময় যথেষ্ট সাবধান হয়েছিলুম। মামা মামী যাতে শুনতে না পান সেই চেষ্টায়। তবু মামা প্রশ্ন করলেন, গোপাল কী বলছ?

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম, তারপরেই সামলে নিয়ে বলেছিলুম, লক্ষ্মীপুজোর গল্প। একবার গ্রামে এক নতুন ভদ্রলোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ হয়েছে। কী সব কারবারে ভদ্রলোক লাল হয়ে গেছেন। তাই ঘটা করে লক্ষ্মী পুজো। মহা ধুমধাম। খেতে বসে ভাল ভাল খাবারের গন্ধেই আমার বমি হয়ে গেল। সে কী লজ্জা!

মামা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, বল কি! আর আমি বলেছিলুম,

আমি উঠে পড়লুম। যখন বেরিয়ে আসছি তখন এক চাষী আমাকে বলল, গ্রাম থেকে কিছু না খেয়ে যাবেন তা হয় না। আমার বাড়িতে আসুন। সেইখানেই লক্ষ্মীর পাট দেখলুম। একখানা ছোট রেকাবিতে নারকেলের নাড়ু দিল আর গেলাসে জল। বলল, অন্য দিন বাতাসার ভোগ হয়, আজ নারকেলের নাড়ু।

স্বাতি খুব কঠিন দৃষ্টিতে আমাব মুখের দিকে চেয়ে ছিল। তা উপেক্ষা করেই বলেছিলুম, তখনও আমার পেটের ভেতরে মোচড় দিচ্ছিল, সেই নাড়ু আর জল খেয়ে শান্ত হল। মনে হল যে অনেক দিন পরে বুঝি মায়ের হাতের তৈরি নাড়ু খেলুম।

স্বাতি কোন কথা বলে নি, কিন্তু মামা বলেছিলেন, নাড়ুটা গ্রামের লোকেরাই ভাল করে।

কোন্ ফাঁকে এক ঝুড়ি খাবার গাড়িতে উঠেছিল, আমি তা দেখতে পাই নি। ট্রেন ছাড়বার পরে সেই ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে জো বলেছিলেন, এরা আমাকে খাতির করে খুব। মামা কিছু বলছেন না দেখে উত্তরটা মামী দিলেন, তা করবে বৈকি, কত বড় চাকরি!

গদ গদ ভাবে জো রায় তাঁর জামার কলারটা একটু উঁচু করেছিলেন, আর স্বাতির দৃষ্টি আরও কঠিন হয়েছিল।

রাতে খাবার সময় জো রায় বলেছিলেন, আপনাদের পাঁউরুটি মাখন আজ থাক। এই ঝুড়িতে অনেক খাবার আছে। বলে ঝুড়িটা খুলেছিলেন। প্রথমেই আচার বেরিয়েছিল। আর স্বাতির দু চোখ চকচক করে উঠেই নিবে গিয়েছিল। আর কেউ দেখতে না পেলেও আমি দেখেছিলুম তার এই পরিবর্তন। বলেছিলুম, কী হল? এর উত্তরে স্বাতি বলেছিল, আজ রাতে আমি খাব না, সকালের খাবার এখনও হজম হয় নি।

সেই মুহূর্তে স্বাতিকে আমি খুব স্বচ্ছ ভাবে দেখতে পেয়েছিলুম। শ্রদ্ধায় আমার দু চোখ জলে ভরে গিয়েছিল, কণ্ঠ রোধ হয়েছিল অদ্ভুত এক বেদনায়।

জো রায় চমকে উঠে বলেছিলেন, এই বয়সে ক্ষিধের অভাব। আর মামা বলেছিলেন, গোপালেরও বোধহয় ক্ষিধে নেই! মামা যে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, তা আর গোপন রইল না। তাই বললুম, শুধু ফল খাব ভাবছি। মামী স্বাতির জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিছু না খেয়ে সারা রাত কাটাবি, সে কেমন কথা হল!

স্বাতি তখন একটা পেঁপে বার করেছিল। মামা বললেন, পাঁউরুটিও বার কর। মামী আফশোষ করে বললেন, এমন সুন্দর খাবার থাকতে—

স্বাতি এ কথার কোন উত্তর দেয় নি।

এর পরের ঘটনা আরও মর্মান্তিক। আহারের পর জো রায় বলেছিলেন, সোমনাথ তাঁর দেখা হয় নি। মামী বলেছিলেন, বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে। জো রায় তাঁর দু হাত কচলে বলেছিলেন, আমাকে আপনি বলবেন না। উত্তর শুনে মামী খুশী হয়ে বলেছিলেন, তা বটে, তুমি তো আমার ছেলেরই মতো। আমিও মামীকে খুশী করবার জন্য জো রায়কে বলেছিলুম, একটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটালে কাজের আর কী ক্ষতি হবে! বাবা সোমনাথই সব পূর্ণ করে দেবেন। তারপর স্বাতির দিকে চেয়ে জো রায়কে বলেছিলুম, আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমি যাব পাশের গাড়িতে।

মামা গভীর ভাবে পাইপ টানছিলেন। আর মামী খুশী হয়েছিলেন আমার প্রস্তাবে। কিন্তু স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গিয়েছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল এবং শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলেছিল, সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না?

মামী রুখে উঠেছিলেন, এক সঙ্গে যদি দেখতে পারা যায় তো পরে দেখবে কেন!

স্বাতি বলেছিল, কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে! তার এই উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পায় নি, বরং আরও নম্র ও মিষ্টি শুনিয়ে-

ছিল তার কণ্ঠস্বর। জো রায় ব্যস্ত ভাবে বলে উঠেছিলেন, সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এ দিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে পাশের গাড়িতে গিয়েছিলেন। আব মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি তাঁর একটি কথাবও উত্তর দেয় নি।

এর পরে আমি জো রায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। কিন্তু সে যে নিতান্তই সাময়িক তা বুঝতে পাবি নি। বম্বেতে এসে মালাবার হিলে আমরা পাশাপাশি বসেছিলুম। স্বাতি আর আমি। সামনে মেবিন ড্রাইভ সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয় অর্ধচন্দ্রের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্রেব মতো তরঙ্গসঙ্কুল নয়, আবার স্থিরও নয়। ছলছল করে প্রাণেব আবেগে আছে উচ্ছল হয়ে, অন্ধকাব নামলেও এ দৃশ্য মুছে যাবে না। আলোর মালায় হয়তো আরও রমণীয় হয়ে উঠবে। স্বাতি বলেছিল, তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে না তো?

হেসে বলেছিলুম, অতীতের চর্চা করে রিক্ত মানুষ।

স্বাতি আশ্চর্য হয়েছিল আমার এই কথা শুনে। বলেছিল, নিজেকে হঠাৎ ধনী ভাবছ কেন? উত্তরে বলেছিলুম, ধন পেয়েছি বলে। স্বাতি বলেছিল, সে কি আজ নতুন পেয়েছ? আমি বলেছিলুম, না। আর সে বলেছিল, তবে? এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, ভয় ছিল দস্যুতে কেড়ে নেবার। আর স্বাতি বলেছিল, আজ বুঝি সে ভয় আর নেই?

নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলার অবকাশ আমি পাই নি। অদূরে কোন পরিচিত মানুষকে দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়েছিল। উপর থেকে নিচে নামছিল। যাকে চেনা মানুষ ভেবেছি, তাকে আড়াল করে ছিল একটি মেয়ে, পার্সি মেযের মতো তন্বী ও সুন্দরী। তার পায়ের ছন্দে ও মুখের হাসিতে একটি প্রাণবন্ত জীবনের ঘোষণা দেখেছি। পুরুষটি যে জো রায় তা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। কিন্তু স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম যে তার দৃষ্টি এখন অন্য ধারে।

জো রায়কে দেখলে এমন নির্বিকার ভাবে বসে থাকত না। কিন্তু এর পর তার আর বসে থাকতে ভাল লাগে নি। আমি বলেছিলুম, এ জায়গা ভাল না লাগলে আর কোথায় তোমার ভাল লাগবে জানি না।

স্বাতি বলেছিল, এলিফেন্টার গুহা।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলুম, পৃথিবীটা কি তোমাব ছোট হয়ে আসছে ?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলেছিল, নিজের জন্যে একটা জগৎ গড়বার চেষ্টা করছি, সেখানে জনতার উপদ্রব থাকবে না।

আমি বলেছিলুম, তোমার সঙ্গী একজন থাকবে তো ? এর উত্তরে স্বাতি বলেছিল, ভেবে দেখব। আর আমি বলেছিলুম, তাহলে আজই আমাব আর্জি পেশ করে রাখলুম।

কিন্তু জো রায় একা ছুটে এসে আমাদেব ধরে ফেললেন। মামা মামীব কাছে এসে বললেন, কাল সকালেই আপনাদের হোটেলে এসে জুটব। বম্বে দেখাবাব ভাব নিলুম আমি।

৮

ভোর বেলায় চাওয়ালাদের চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙল। ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছিল সমস্তিপুরে। মিনিট কুড়ি দাঁড়াবে। ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে ভাঁড়ের চা সংগ্রহ করা আমার চিরকালের অভ্যেস। আজও তাই করলুম। দু ভাঁড় চা সংগ্রহ করে বিনয়কে জাগিয়ে দিলুম। বিনয় সিগারেট ধরিয়ে চা খেল। এখান থেকে মজঃফরপুর এক ঘণ্টা দশ মিনিটের পথ। তাই চা শেষ করে আর অপেক্ষা করলুম না। মুখ হাত ধুয়ে ট্রেন থেকে নামবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম। বিনয়ও দেরি করল না। তবে ফিরে এসে বলল: বাথরুম তো নয়, নরক কুণ্ড।

আমি হেসে বললুম: দেশের কজনের ভাগ্যে এই বিলাস জোটে!

ননসেন্স!

বলে বিনয় আর একটা সিগারেট ধরাল।

হাবুলদা আমাদের নিতে স্টেশনে এসেছিল। খুব খুশী হল আমাকে দেখে। বলল: তুই না এলে আমি খুব দুঃখ পেতাম। কিছুতেই তোকে বলে আসতে পারি নি তো, তাই মনে হত যে এই জন্যেই বোধহয় তুই এলি না।

বাড়িতে এসেই মেসোমশাইকে আমরা প্রণাম করেছিলুম। মাসিমারাও খুশী হলেন। বিনয়ের মা বললেন: ভারি দুঃখ হয় তোর কথা ভাবলে। দিদি বেঁচে থাকলে কি তুই এ রকম হতে পারতিস?

তার পর রাঙা মাসিমার দিকে চেয়ে বললেন: দিদির বড়, সাধ ছিল, গোপাল জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। কিন্তু ও পরীক্ষাই দিল না।

খানিকটা দূরে মাধবীর সঙ্গে কথা বলছিল নীরা, বলল : হ্যাঁ, পরীক্ষা দিলেই পাস করে যেত।

কথাটা খুব সন্তর্পণে বললেও আমার কানে এল। যেন কিছু শুনতে পাই নি এমনি ভাবে আমি বললুম : পরীক্ষা দিলেই কি আর পাস করা যায় মাসিমা! ও সব কঠিন পরীক্ষা।

পরে শুনেছিলুম যে নীরা বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারে নি। তাই সে খুশী হয়েছিল আমার কথা শুনে।

বিনয় এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছে শুনে হাবুলদা রেগে গেল। বলল : তবে তোদের দেখাব কী! কাঠমাণ্ডু পৌঁছতেই তো তোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে!

বিনয় বলল : না, পুরো দুটো দিন হাতে থাকবে।

বুঝতে পারলুম যে আগে থাকতেই তাদের কথা হয়েছিল। তাই হাবুলদা বলল : এ দিকটা সামলে নিয়ে যেতে হবে তো!

নীরা বলল : তোমরা কি কাঠমাণ্ডু যাবে হাবুলদা?

হাবুলদা বলল : কেন, তুইও যাবি নাকি?

রাঙা মাসি বললেন : তোর যাবার দরকার কী!

কিন্তু নীরা বলল : মাধবীর বিয়ের পর এখানে বসে থেকেই বা করব কী! একটু ফূর্তি করে আসা যাবে!

হাবুলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : বিপদের কথা।

বিনয় বলল : বিপদ কিসের?

শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে, পথে মেয়ে নিয়ে বেরোবে না।

নীরা একটা ভেংচি কেটে বলল : শাস্ত্রের কথা কতই মানো যে এই কথাটা মনে রেখেছ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, এ কথা আগেই বলে রাখছি।

ঠিক এই সময়ে একটি অপরিচিত যুবক এসে বিনয়ের পায়ের উপরে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পায়ের ধুলো মাথায় বুলিয়ে সহাস্যে বলল : গোর লাগি বিনয় দাদা।

আমি যত আশ্চর্য হয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য হল বিনয়। কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেল না। তার আগেই সে আমাকে দেখতে পেয়ে বলল ঃ গোপাল দাদা না ?

বলে আমারও পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় হাত বুলোল।

হাবুলদা এক ধমক দিয়ে বলল ঃ কী করছিস পরমানন্দ, বয়সে ওরা তোর ছোটই হবে।

পরমানন্দ এক গাল হেসে বলল ঃ বয়সে ছোট হলে কী হবে, শুনেছি ওরা বিদ্যের এক একটা জাহাজ।

হাবুলদা বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল ঃ গোরখপুর থেকে ও রাঙা মাসিদের এনেছে। ওর বাবার সেখানে খুব বড় কারবার আছে।

পরমানন্দ সবিনয়ে বলল ঃ ভুরার কারবার।

ভুরা শব্দটি শুধু আমি নই, বিনয়ও কোন দিন শোনে নি বলে মনে হল। আমাদের মুখের দিকে চেয়ে হাবুলদা হেসে বলল ঃ ভুরা মানে বুঝলি না তো ?

কিন্তু আমরা কিছু বলবার আগেই পরমানন্দ বলল ঃ খান্‌সারি বোঝেন ?

না।

শক্কর ?

হাবুলদা বলে উঠল ঃ তোদের অত শত বুঝতে হবে না। শুধু জেনে রাখ, যে ভুরা মানে হল দেশী চিনি, অর্থাৎ গুড়ের চিনি। এইবারে বুঝেছিস ?

বিনয় মাথা নাড়ল। আর আমি বললুম ঃ গোঁড়া বাড়িতে পুজো-আর্চায় যে চিনির ব্যবহার হয় সেই চিনি।

হাবুলদা বলল ঃ ঠিক বুঝেছিস।

আর পরমানন্দ বলল ঃ এই জন্যেই আমি বিদ্যের জাহাজ বলেছিলাম।

বলে হে-হে করে হাসতে লাগল।

নীরা বলল : আনন্দ্, এখান থেকে আমরা কাঠমাণ্ডু যাচ্ছি। তুমি যাবে না ?

পরমানন্দ্ বলল : কাঠমাণ্ডু ! বেয়েত্রিণ জায়গা শুনেছি।

হাবুলদা বলল : তবে আর কি ! তুমিও চল। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন !

বলে বাইরে যাবার আগে বলে গেল : তোবা মুখ হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে নে, আমি বরযাত্রীদের ব্যবস্থা দেখে আসছি।

বিয়ে বাড়িতে সবার কাজ আছে, সবাই ব্যস্ত। নেই শুধু আমাদের দুজনের কোন কাজ। হাবুলদা বলেছে : তোরা বরযাত্রীদের দেখাশুনো করবি। দেখাশুনো মানে গল্প-গুজব। বেশ জমিয়ে রাখবি। ব্যাপারটা বুঝেছিস তো ? ওরা যেন খুঁৎ ধরবার সুযোগ না পায়।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল : গোপাল তো নানা জায়গার কথা জানিস, বাছাধনদেব গল্প ছেড়ে উঠতে দিবি না।

বললুম : কখন আসবে বরযাত্রী ?

হাবুলদা বলল : এইতো আমি যাচ্ছি তাদের আনতে। ফাস্ট্ প্যাসেঞ্জারে আসছে। দশটা পঞ্চান্নয় ট্রেন।

বিনয় বলল : আর এখান থেকে তাদের ফেরার ট্রেন কখন ?

বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

বলে হাবুলদা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয় বলল : তোর কথাই ঠিক হল দেখছি। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বরযাত্রী বিদেয় করার পর আমাদের ছুটি হবে। তার মানে সেই রাতের ট্রেন। সারা রাত জাগতে হবে।

হেসে বললুম : রাত জাগার এমন ভয় কেন তোর ! বিয়ে করলে তো বাসর জাগতে হবে। বলা যায় কি, এই বিয়েতেই রাত জাগতে হতে পারে।

অসম্ভব।

বলে বিনয় একটা সিগারেট ধরাল চারি দিক দেখে নিয়ে। বলল :

বাইরে এলে অসুবিধে নানা রকমের। সবার মন যুগিয়ে চলতে হয়। এ দেশে ওপেন্‌লি কিছু করার উপায় নেই, সবই লুকিয়ে চুরিয়ে।

এক প্রেম ছাড়া।

আমার কথা শুনে বিনয় আঁৎকে উঠে বলল : তুই বলছিস কী গোপাল! ওইটিই তো সবচেয়ে গোপনে করতে হয়! আর তুই বলছিস—

তার কথা শেষ হবার আগেই বললুম : নীরাকে দেখলি না, ভুরাওয়ালার ছেলেকে কেমন আদর করে সঙ্গে যেতে বলল!

বিনয় বলল : কী যা-তা বলছিস? নীরা ঐ ছেলেটার সঙ্গে প্রেম করতে যাবে ভেবেছিস! অ্যাব্‌সার্ড!

বললুম : একটু নজর রাখলেই অনেক কিছু দেখতে পাবি।

বলে আমি পরমানন্দ্‌-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। মেসোমশাই বললেন : ও রান্নার তদারক করছে। ওর চার্জেই ভাঁড়ার। খুব কাজের ছেলে তো, ওকে পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

ভাঁড়ারের সামনে গিয়ে পরমানন্দ্‌কে খুবই ব্যস্ত দেখলুম। কোমরে একখানা গামছা জড়িয়েছে শক্ত করে। দরদর করে ঘাম পড়ছে কপাল থেকে। সেই ঘাম জামার হাতে মুছছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হয়ে এগিয়ে এল। বলল : গোপাল দাদা এসেছেন! লেকিন ভারি গরম লাগবে এখানে।

বললুম : গরম এখনও পড়ে নি।

গরম তো চুলার আছে।

পরমানন্দ্‌ একখানা টুল এনে আমাকে বসতে দিল। বলল : বরাতের জন্যে দু রকম ব্যবস্থাই রাখতে হচ্ছে। এগারটায় ট্রেন আসছে তো, বাড়ি আসতে আরও আধ ঘণ্টা লাগবে। তারপর জল খাবার খাবেন, না চানটান করে ভাত, তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই দু রকম ব্যবস্থাই রাখতে হচ্ছে।

কোথায় উঠবেন তাঁরা ?

কেন, বৈঠকখানা বাড়িতে ব্যবস্থা দেখেন নি। বেশি লোক আসছে না বলে কোন বাড়ি নেওয়া হয় নি। ভালোই হয়েছে, এতে ঝামেলা আমাদেরও কম।

আমাদের ঝামেলা কম কেন ?

দু জায়গায় ছুটোছুটি করতে হত, দু জায়গায় রান্না।

বললুম : আপনার দেশ কোথায় ?

পরমানন্দ্ সভয়ে বলল : কেন, বাংলা ঠিক বলতে পারছি না নাকি ?

তাড়াতাড়ি বললুম : না না, বাংলা বেশ ভালোই বলছেন।

না গোপালদাদা, মিথ্যা বলবেন না। গোরখপুরে জন্ম তো, ও দেশের লোকের সঙ্গেই ওঠা-বসা। তাই আপনাদের মতো বাংলা বলতে পারি না। লেকিন আমরা বাঙালীই আছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সত্যি নাকি !

পরমানন্দ্ বলল : হ্যাঁ গোপাল দাদা, মিথ্যা বলব কেন। বাংলা থেকে আমার দাদা, মানে বাবার বাবা এসেছিলেন গোরখপুরে। তারপর কারবার বেড়ে উঠলে যা হয় আর কি, ঘরে' যাবার সময় পেতেন;না। বিয়েসাদি এ দিকের বাঙালীর সঙ্গেই হয়েছে। বহুগুণাজীর নাম শুনেছেন ?

বললুম : শুনেছি।

উনিও তো বাঙালী। বহুগুণা ওঁদের টাইটেল। ওঁর দাদা অনেক জানতেন বলে এ দিকের লোক এই টাইটেল দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম : আপনাদের এ রকম টাইটেল নেই ?

আমরা চৌধারী। কিন্তু আজকাল আর এ সব লেখা হয় না। জাত-পাত নিয়ে বড় গোলমাল তো, তাই অনেকেই ছেড়ে দিচ্ছে। আর আমরা কারবারী লোক, আমাদের আবার জাত কী !

বললুম: ঠিকই তো। তা লেখাপড়ার কোন অসুবিধা হয় না?

পরমানন্দ্ বলল: আগে বাংলা একটু আধটু শেখা হত, আজকাল আর হয় না। আর দরকারও বিশেষ হয় না। কারবার তো ইউ. পি তে, হিন্দুস্থানী জানলেই চলে যায়। হিন্দীব চেয়ে হিন্দুস্থানী ভাষাটাই সোজা, তবে লিখাটা হিন্দী অক্ষবেই চলে।

পরমানন্দ্ হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল: একটু চা খান। এই মহারাজ—

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: না না পরমানন্দ্‌বাবু, চায়েব কোন দরকার নেই।

সে আবার কী কথা! আপনাবা কলকাতা থেকে এসেছেন! কলকাতার বাঙালীরা শুনেছি ঘন ঘন চা খায়। না গোপাল দাদা?

বলে পরমানন্দ্ হে হে করে হাসতে লাগল।

কাজেই আমাকে টুলে বসে চা খেতে হল। পরমানন্দ্ চা খেল না, তার বদলে জর্দা দিয়ে পান খেল। বলল: আমরা এতেই রস বেশি পাই।

এরই মধ্যে আমি আরও অনেক কথা তার কাছে জেনে নিলুম। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে সে যায় নি। গোরখপুর থেকে অনেকেই যায় এবং সেখানে যাবার জন্যেও অনেকে গোরখপুরে আসে। কিন্তু দেখবার মতো তেমন কিছু নেই। শুধু হায়রানি, আর পয়সা নষ্ট। বুঝতে পারলুম যে কারবারী মানুষের কাছে ভ্রমণ একটা বাজে বিলাসিতা। কিন্তু এক কথায় কাঠমাণ্ডু যেতে রাজী হয়ে গেল ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। মনে হল, সে বোধহয় নীরার জন্যেই। নীরা এমন ভাবে কথাটা বলেছিল যে সে রাজী না হয়ে পারে নি। অথবা কাঠ-মাণ্ডুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তার মনে পড়ে গেছে। তাই ব্যাপারটা

জানবার জন্যে বললুম: কাঠমাণ্ডু জায়গাটা খুব ভাল বলছিলেন, আগে কখনও গেছেন সেখানে?

পরমানন্দ্ বলল: না গোপাল দাদা, আমি শোনা কথা বলেছি। সাহেব মেমরা দলে দলে কাঠমাণ্ডু যায়। দিল্লী এলেই কাঠমাণ্ডু যাবে। দিল্লী থেকে বানারস, তারপর পাটনা হয়ে কাঠমাণ্ডু। তারা সব হাওয়াই জাহাজেই যায়। কখনো-সখনো দু একজন লুম্বিনী দেখতে আসে। আপনি যেতে চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

বললুম: না, এ যাত্রায় আর দেখা হবে না। কখনও ও দিকে গেলে আপনার সাহায্য নেব।

না না, লজ্জা মনে করবেন না, আমাকে আপনার ছোট ভাই মনে করবেন।

নিশ্চয়ই।

হঠাৎ বিনয় এসে উপস্থিত হল, বলল: তুই এখানে বসে গ্যাজাচ্ছিস! এ দিকে আমি সারা বাড়ি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কেন, কিছু অঘটন ঘটল নাকি?

অঘটন আবার কেন ঘটবে! রাঙা মাসী তোর কথা জিজ্ঞেস করছে, তুই কোথায় গেলি, কিছু চাই কিনা এই সব।

আমি হেসে বললুম: তুই কী বললি?

বিনয় গম্ভীর হয়ে বলল: বললুম, তোর যা চাই তা শুধু রাঙা মাসীই দিতে পারেন—একটি পরীর মতন রাজকন্যে।

কিন্তু রাজকন্যে কি আমার উত্তরপাড়ার এঁদো ঘরে ঢুকবে? তার চেয়ে তোর নিজের জন্যে একটি রাজকন্যে যোগাড় কর্। সন্ধান পেলি কিছু?

বিনয় বলল: এক রাজকন্যায় আমার চলবে না। তার সঙ্গে সখী চাই অনেকগুলি। কলকাতায় তোর যদি সন্ধানে থাকে তো দিস আমাকে।

বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। আমি কোন রকমে পরমানন্দ্‌কে বললুম : আবার দেখা হবে।

পরমানন্দ্‌ বলল : সে তো নিশ্চয়ই।

আমার ভাল লাগল এই মানুষটিকে। সরল সদালাপী মানুষ। চাল নেই কোন, সত্যকে চাপা দেবার কোন বাসনাও নেই। এ যুগের ছেলে হয়েও যেন পুরনো যুগে রয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে তাই তার প্রভেদটা খুবই স্পষ্ট। এ রকম মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না।

৯

নির্বিঘ্নে মাধবীর বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমরা সবাইকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলুম। হাবুলদা এবারে অন্য মানুষ। বলল : যারা নেপালে যাবি, গুছিয়ে নে তাড়াতাড়ি।

পরমানন্দের দিকে চেয়ে বলল : তুইও এ কদিন খেটেছিস খুব, চল্ দুদিন ফুর্তি করে আসবি।

নীরাকে বলল : তোর খুব কষ্ট হবে। আর বিনয়েরও।

কেন ?

হাবুলদা বলল : দশ বারো বছর আগের কথা জানি। কোন বাজে হোটেলেও পঞ্চাশ টাকার কমে ঘর পাওয়া যেত না, দুজনের ঘর। সন্সটি আর অন্নপূর্ণায় ঘর ভাড়া ছিল একশো টাকার ওপর তখন আমাদের রাণীখেতে ঘর ভাড়া দশ টাকার কম।

পরমানন্দ বলল : ভাড়ার জন্যে ভাবনা কি হাবুলদা ?

হাবুলদা এক ধমক দিয়ে বলল : হ্যাঁ, তোর কাছে আমি ভাড়া নেব বৈকি।

বিনয় বলল : তুমি আমার কষ্টের কথা ভাবলে, কিন্তু গোপালের—

কথাটা শেষ করবার আগেই হাবুলদা হা-হা করে হেসে উঠল, বলল : গোপালকে তোরা কেউ চিনিস না। ওর জন্যে আমার কোন ভাবনা নেই। এক কথায় ও লাফিয়ে ট্রেনে উঠতে পারে, রাত কাটাতে পারে মন্দিরের উঠোনে। নায়িকার জন্যেও ওর কোন ভাবনা নেই। মাটির পুতুলের মতো ওরা মন্দিরেই রাত কাটায়। মাইরি গোপাল, এক পাতানো মামাতো বোন জুটিয়ে গল্পটা বেশ জমিয়েছিলি।

তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলল : নীরাও তো তোর পাতানো মাসতুতো বোন, এবারের গল্পটা ওকে নিয়েই জমাস।

পরমানন্দ্ বলল : গোপালদাদা গল্প লেখে নাকি ?

তুই হাঁদা শুনে কী করবি ? তুই তো বাঙলা পড়তে পারিস নে।

পরমানন্দ্ লজ্জিত ভাবে বলল : নীরাকে বলেছি বাঙলা অচ্ছরটা আমাকে শিখিয়ে দিতে।

তবেই হয়েছে। ও তোকে অচ্ছর লেখাই শেখাবে, অক্ষর চেনাতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত আমরা রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে নেপাল যাত্রা করলুম। আমরা পাঁচজন—আমি বিনয় পরমানন্দ্ ও হাবুলদা, নীরাও আমাদের সঙ্গে চলল। হাবুলদা বলল : ভয় নেই তোদের, রাত পৌনে দুটোয় পৌঁছব সগৌলি জংসনে, সেখানে ওয়েটিং রুম আছে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত টেনে ঘুমোতে পারবি মেঝেয় শুয়ে। রক্সৌলের ট্রেন ছাড়বে পৌনে ছটায়। স্টেশনেই মর্নিং টী জুটে যাবে। কিন্তু সাবধান, রক্সৌলে নেমে সোজা দৌড়তে হবে বীরগঞ্জের বাস স্টেশনে। দেরি করলেই মরেছ।

যে ট্রেনে আমরা যাত্রা করেছিলুম তা এসেছে শোনপুর থেকে। ট্রেনে ভিড় ছিল, কিন্তু আমরা খানিকটা জায়গাও পেয়েছিলুম। কোনার দিকে খানিকটা জায়গা দেখে হাবুলদা বলল : তুই শুয়ে পড় নীরা। একটু ঘুমিয়ে নে। আমরা সময় মতো জাগিয়ে দেব।

পরমানন্দ্ বলল : সেই ভাল।

বলে নিজের ব্যাগ থেকে এক জোড়া তাস বার করে বলল : বরযাত্রীদের তাসটা নিয়ে এসেছি হাবুলদাদা, দু হাত টোয়েন্টি নাইন হয়ে যাক।

হাবুলদা ফটাস করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল : তোর বুদ্ধি তো খুব। এগিয়ে আয় বিনয়।

বিনয় বলল : ও খেলা তো আমি জানি না।

তবে জানিস কী?

ফিশ ফ্ল্যাশ—

ছোঃ, ও সব আবার খেলা! যত সব জুয়াড়িদের কারবার! তুই জানিস নীরা?

নীরা বলল: গোলামচোর জানি হাবুলদা।

চুরি-চামারিই জানবি।

বলে হাবুলদা তাসের প্যাকেটটা পরমানন্দের দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি বললুম: তাহলে তুমি নেপালের গল্প বল।

তোর ঐ এক ধান্দা। নেপালের গল্প শুনেই তোর পেট ভরবে।

ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু হাবুলদা বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। বলল: দেখ্, কলকাতা থেকে নেপালে যাবার এটা কিন্তু সোজা পথ নয়। আমরা ঘোরা পথে যাচ্ছি।

বুঝতে পেরেছিলুম যে কিছু না বলে শুনে যাওয়াই নিরাপদ। হাবুলদা নিজে থেকেই অনেক কথা বলবে। বললও তাই: সোজা পথটা হল আকাশ দিয়ে। ও দিকে কলকাতা আর ঢাকা, আর এ দিকে পাটনা বেনারস আর দিল্লী—এই সব জায়গায় প্লেনে ওঠো, আর নামো এসে কাঠমাণ্ডুর গৌচার এয়ারপোর্টে। বীরগঞ্জ জানো? সীমানার এ পারে রক্সৌল, ও পারে বীরগঞ্জ। এই বীরগঞ্জের কাছেও একটা এয়ারপোর্ট আছে। নাম সিমরা। সেখান থেকেও কাঠমাণ্ডু যেতে পার রয়াল নেপাল এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের প্লেনে। তাদের এফ-২৭ ফকার ফ্রেণ্ডশিপ প্লেন দিল্লী পাটনা কলকাতা আর ঢাকার মধ্যে যাতায়াত করে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনও আছে, আছে বাঙলা দেশের প্লেন। এ সব বড়লোকদের জন্যে।

বলে বিনয়ের দিকে তাকাল। তাই দেখে আমি বললুম: আমাদের জন্যে কী?

হাবুলদা বলল: ট্রেন আর বাস। কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে আসবে না। যে ট্রেনে এসেছ, তাতে এলে সমস্তিপুরে নেমে সকাল

সাড়ে সাতটার প্যাসেঞ্জার ধরবে, আর সোজা রক্সৌলে এসে নামবে বিকেল চারটে নাগাদ। সন্ধ্যে বেলায় বীরগঞ্জে সিনেমা দেখে হোটেলে রাত কাটাবে, পরদিন সকালেই কাঠমাণ্ডুর বাস। আর যদি পাটনা হয়ে আসতে চাও তো তাও পার। সন্ধ্যেবেলায় মহেন্দ্রু ঘাট থেকে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে পালেজা ঘাটে ট্রেন ধর রাতে। ভোর বেলায় রক্সৌল। সগৌলিতে গাড়ি বদল করতে হবে কিনা তা টাইম টেবলে দেখে নিতে হবে। আর কোন খবর চাই?

বিনয় বলল : আর সব তো নিজের চোখেই দেখতে পাব।

কিন্তু হাবুলদা আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললুম : জনকপুরও তো নেপালে। জনকপুরে যাবার পথ কোন্‌টা?

হাবুলদা বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল : দেখলি তো! ওর প্রশ্নের কোন শেষ নেই। জনকপুরে যাবার পথটা জেনে নিয়ে বলবে, সেখানে দেখবার কী আছে? তারপর এই শোনা কথাই লিখবে ওর বইএ।

বিনয় বলল : সে কি রে, কোন জায়গায় না গিয়েই তুই সে জায়গার কথা লিখিস নাকি?

উত্তর আমাকে দিতে হল না। তার আগেই হাবুলদা বলল : না না, সে দিকে ওর টনটনে জ্ঞান। ভালো মানুষের মতো লিখবে, হাবুলদার মুখে শুনে লিখছি। ভুল হলে হাবুলদার দোষ, আর ঠিক হলে ওর গুণ। তবে চালাকি করে অনেক সময় হাবুলদার বদলে গাবুলদা লিখবে, আর নীরার বদলে মীরা। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কাউকে রাখবে না।

আমি হাসছিলুম। আর বিনয় জিজ্ঞেস করে বসল : তুমি এত কথা জানলে কোথায়?

হাবুলদা বলল : আরে বোকা, লেখকরা কি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে! সত্যি কথা ধরা পড়ে যাবেই।

বললুম : আমার উত্তর কিন্তু আমি এখনও পাই নি হাবুলদা।

তোর জনকপুরের পথ তো? তার জন্যেও তোকে সমস্তিপুরেই

নামতে হবে। তারপর বড় লাইনের গাড়ি থেকে ছোট লাইনের গাড়ি। কাটিহার থেকে আসে জানকী এক্সপ্রেস। সে ট্রেন বোধহয় ধরতে পারবি না, ভোর পাঁচটায় ছেড়ে যায়। তারপর প্যাসেঞ্জার আছে দুটো। তাতে চেপে দ্বারভাঙ্গা হয়ে জয়নগরে পৌঁছবি। সমস্তিপুর থেকে দ্বারভাঙ্গা দু ঘণ্টার পথ। এক্সপ্রেসে এক ঘণ্টা দশ মিনিট। আর দ্বারভাঙ্গা থেকে জয়নগর আড়াই ঘণ্টাব পথ।

তারপর ?

হাবুলদা বলল : তার পরের জার্নিটাই রোমাঞ্চকর।

বিনয় কৌতূহলী হয়ে বলল : কী রকম ?

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : নেপাল-জনকপুব-জয়নগর রেলওয়ে। জয়নগর থেকে সেই খেলনা গাড়িতে চড়ে একবার যাস জনকপুরে। সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : পথ কতটা ?

কিন্তু এই প্রশ্ন শুনে হাবুলদা রেগে উঠে বলল : এই তোর একটা বদ্ অভ্যেস গোপাল। যতটা জানি, আমি ততটাই তো বলব, না তোর জন্যে যা জানি না তাও বলতে হবে ?

বললুম : সে তো ঠিক কথা।

হাবুলদা বলল : হ্যাঁ, তবে আর একটা খেলনা ট্রেন চলে নেপালে —বীরগঞ্জ থেকে আমলেখগঞ্জ। এর দূরত্ব যদি জানতে চাস তো বলতে পারি। উনত্রিশ মাইল। রক্সৌলের লাগোয়া শহর বীরগঞ্জ থেকে হিমালয়ের ঠিক নিচে অবধি গেছে। তার পর থেকেই চড়াই। কিন্তু জয়নগরের মতো ট্রেনে চাপতে পারবি না।

কেন ?

এ ট্রেনে শুধু মাল চলে, মানুষ বহন করা হয় না। জয়নগর থেকে জনকপুরে দুই-ই চলে। সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে এই রেলপথের অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর।

একটু থেমে হাবুলদা বলল : আর এক জায়গায় এই অভিজ্ঞতা

হতে পারত। এর চেয়েও বেশি। কিন্তু সেখানেও শুধু মাল চলে, মানুষ চলে না।

কোথায় ?

রোপওয়েতে। আমলেখগঞ্জের রেল স্টেশন থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত এই রোপওয়ে নেপালের মাল বহন করে। দিনে কত মাল বইতে পারে জানিস ?

না।

ষাট টন। রোপওয়ে যখন নতুন ছিল তখন ঘণ্টায় আট টন বইতে পারত, এখন প্রায় সাড়ে পাঁচ টন বয়। তাও প্রায় বারো ঘণ্টার মতো। তবে শুনছি যে আমেরিকান সাহায্যে নাকি সম্প্রতি উন্নতি হয়েছে।

আমি বললুম ঃ তুমি জনকপুরের কথা বল।

হাবুলদা বলল ঃ তবে জেনে রাখ, জনকপুরে যাবার আর একটা পথ আছে। দ্বারভাঙ্গা থেকে রক্সৌলে যাবার পথে জনকপুর রোড নামে একটা স্টেশন আছে। সেখান থেকেও জনকপুরে যাওয়া যায়। যদি জনকপুরে যেতে চাস তো আসিস রামনবমী বা বিবাহ পঞ্চমীতে। বিরাট মেলা বসে সেই সময়ে। বহু যাত্রী আসে তীর্থ করতে।

তীর্থ করতে ?

করবে না! মা জানকীর জন্মস্থান, জনক রাজার রাজধানী, রামের বিয়ে হয়েছিল সীতার সঙ্গে। মা জানকীর মন্দির আছে মার্বল পাথরের। হিন্দুর কাছে যেমন রামের অযোধ্যা, তেমনি সীতার জনকপুর। তোর তো মন্দিরের কারুকার্য দেখার অভ্যেস, মন্দিরের সিলিঙে দেখবি সুন্দর কারুকার্য। আর মন্দির ঘিরে অনেকগুলো পুকুর। পুকুরে ডুব দিয়ে মা জানকীর দর্শন সেরে ফিরে আসবি।

তারপর ?

তারপর আবার কী! ভাবছিস ঐ দিক দিয়েই কাঠমাণ্ডু যাবি! সে গুড়ে বালি।

কেন ?

এইটেই নেপালের সমস্যা। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে এ দেশের যেখান থেকে গেছ সেখানেই ফিরে এসো, তার পর অন্য কোথাও এসে আবার নেপালে ঢোক। এই সমস্যা নিয়েই তো নেপাল এখনও হিমসিম খাচ্ছে। পূর্ব-পশ্চিমে এত বড় দেশ, কিন্তু যাতায়াতের সুবিধে নেই। সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলটা জুড়ে তরাই, তারপর হিমালয় পাহাড় আড়াআড়ি ভাবে। বিরাটনগর যাবে তো যাও আমাদের যোগবানীতে, জয়নগরেব মতো সীমান্তের এ পারে রেল স্টেশন যোগবানী, আর ওপারে বিরাটনগর।

বিরাটনগরের নামে আমার মহাভারতের বিরাট রাজার কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললুম : এ কি মহাভারতের বিরাটনগর ?

হাবুলদা আবার রেগে উঠল : আমাকে তুই কী পেয়েছিস বল্ তো ?

কেন হাবুলদা ?

আমি কি পণ্ডিত যে যা জানতে চাইবি, আমি তাই তোকে বলব। সেই ছেলেবেলায় মহাভারতের গল্প পড়েছি। বিরাট নগর কোথায় ছিল তা কি লেখা ছিল মহাভারতে !

তা ছিল না। কিন্তু নেপালের লোকেরা নিশ্চয়ই তা বিরাট রাজার রাজধানী বলে দাবী করে ! যেমন জনকপুরকে বলে জনক রাজার রাজধানী ! করে না ?

হাবুলদা বলল : না ভাই, এ রকম কথা আমি কারও মুখে শুনি নি। সবাই বলে যে বিরাটনগর একটা শিল্প নগর, মানে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি। নেপালের পূর্ব তরাই অঞ্চলে কোশি রিজিয়নের শহর। এখানে কোশি ড্যাম প্রজেক্ট হচ্ছে বলে অনেক দিন আগে শুনে ছিলাম। কত দূর কী হয়েছে জানি না। তবে এ দিকেও নাকি তীর্থ স্থান আছে, তার্থ যাত্রীরা যায়। কোথায় যায় তা কারও কাছে জেনে নিস।

পরমানন্দ বলল : তুমি তো বলেছিলে গোপালদাদা অনেক পড়া-শুনো করেছে। তা গোপালদাদা কী বলেন শোনা যাক না।

হাবুলদা বলল : তোর ঘটে তো বেশ বুদ্ধি আছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল : তুই বল্ না মহাভারতের বিরাট রাজ্যটা কোথায় ছিল।

বললুম : ভারী গোলমেলে কথা হাবুলদা। এক এক জন এক এক রকম কথা বলেছে।

যদি সে সব জানিস তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলি কেন?

জিজ্ঞেস করছিলুম এই জন্যেই যে নেপালীরাও যদি বিরাটনগরকে বিরাট রাজার রাজধানী বলে দাবী করে তো তাদের যুক্তিটাও শুনে রাখতে হবে। আমার কাছে তার একটাই যুক্তি। সেটা হচ্ছে, অজ্ঞাতবাসের জন্যে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলটা খুবই উপযোগী। বনবাসের পর পাণ্ডবরা এই অঞ্চলকে আত্মগোপনের উপযোগী বলে মনে করতে পারতেন।

ঠিক কথা।

কিন্তু বিপক্ষেও অনেক যুক্তি আছে।

কী রকম?

বিরাট হল রাজার নাম, তিনি মৎস্য দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর রাজধানীর নাম ছিল নিজের নামে বিরাটনগর। তিনি খুব ধনী ছিলেন, অর্থাৎ বহু গোধন ছিল তাঁর।

পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করল : গোধন মানে কি?

বললুম : গোরু। সে যুগে টাকা পয়সার চল বোধহয় বেশি ছিল না, তাই ধন বলতে গোধন অশ্বধনও বোঝাত।

হাবুলদা বলল : তারপরে কী হল বল্।

বললুম : মহাভারতের গল্প বোধহয় তোমার মনে আছে?

কোন্ গল্প?

সেই যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়ের কথা—কৌরব সৈন্য

নিয়ে সুশর্মা মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণের অংশ আক্রমণ করে গোধন হরণ করলেন, আর যুদ্ধ করতে গিয়ে বিরাট বন্দী হলেন সুশর্মার হাতে। আর ঠিক এই সময়েই দুর্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে নিয়ে তাঁর রাজ্যের উত্তরের অংশ আক্রমণ করে গোধন হরণ করলেন।

হাবুলদা বলল : সুশর্মা আবার কে?

বললুম : ত্রিগর্তের রাজা সুশর্মা। বিরাটের সেনাপতি ছিলেন তাঁর শালা কীচক। তাঁরই সাহায্যে বিরাট সুশর্মাকে পরাজিত করে তার রাজ্য অধিকার করেছিলেন। আর সুশর্মা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কাছে। তিনি যখন খবর পেলেন যে কীচক মরেছে, তখনই তাঁর রাজ্য উদ্ধারের জন্যে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণে আক্রমণ করেন, আর একই সঙ্গে উত্তরে আক্রমণ করেন দুর্যোধন।

তারপর?

তারপর আর কী! ভীম সুশর্মাকে ধরলেন, আর বৃহন্নলাবেশী অর্জুন রাজপুত্র উত্তরের সারথি হয়ে গেলেন উত্তর দিকের যুদ্ধ ক্ষেত্রে। দুজনেরই জয় হল।

তাতে তোর হল কী?

আমার এইটুকুই লাভ হল যে বিরাটনগর ছিল হস্তিনাপুরের কাছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে হলেও তা পশ্চিমের দিকে হতে পারে, কিন্তু পূর্বে হতে পারে না। কাজেই নেপালের বিরাটনগর মহাভারতের বিরাটনগর না হওয়াই সম্ভব বেশি।

তবে তোর মতে সেই বিরাটনগর কোথায় ছিল বল্।

বললুম : চারটি মত আমার জানা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো মত হল এ কালের জয়পুর রাজ্যই ছিল সেকালের মৎস্য রাজ্য। জয়পুরের কাছে বৈরাট নামে একটা জায়গা আছে, লোকে তাকেই বিরাটনগর বলে মনে করে।

তারপর?

অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন বিরাট রাজ্য ছিল বাঙলায়—রঙ-

পুর দিনাজপুর ও বগুরা জেলা নিয়ে ছিল বিরাট রাজ্য। কোন এক জায়গায় এখনও নাকি বিরাটনগরের প্রাচীন নিদর্শন আছে।

হাবুলদা বলল: তুই তো নেপালের বিরাটনগরকেই মানছিস না, তবে বাঙলায় মানবি কী করে?

বললুম: আমি মানামানিব কথা বলছি না, বলছি নানা মুনির নানা মতেব কথা।

তা হলে বলে যা।

বললুম: আর একটা মত হল উড়িষ্যাব ময়ূবভঞ্জ অঞ্চলে ছিল বিরাট রাজাব বাজ্য। কিন্তু এই দাবীব পেছনেও কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

তবে শেষ মতটাই বল্।

সে মত মেনে নেওয়া আরও কঠিন।

কেন?

তাহলে যেতে হবে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায়। গরু চুরি করবার জন্যে দুর্যোধনরা হস্তিনাপুর মানে মীবাট অঞ্চল ছেড়ে এত দূর দেশে যেতেন না। তাই আমাব মনে হয় যে বিরাটনগর জয়পুরের কাছে হওয়াই সম্ভব।

বুঝেছি।

তখন আমি নেপালীদের মত জানতুম না, জেনেছিলুম পবে কাঠমাণ্ডুতে এসে। বিরাটনগরকে তারা বিরাট রাজার রাজধানী বলে মনে করেন না। এই শহরেরও পূর্বে একেবারের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছে ভদ্রপুর নামে একটি ছোট শহর আছে। সেখানে শুধু বিরাট রাজার প্রাসাদ নয়, আরও অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে ছড়িয়ে। এই অঞ্চলেই আছে কীচক বন। কাঠমাণ্ডু থেকে উড়ো জাহাজে এখানে উড়ে আসা যায়।

রাত অনেক হয়েছিল। নীরা অনেকক্ষণ আগেই চোখ বুঁজে শুয়ে পড়েছিল। বিনয়ও এক ধারে কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জেগে আছি আমরা তিনজন। পরমানন্দ্‌ও হাই তুলল দেখে হাবুলদা বলল: তোরাও একটু ঘুমিয়ে নে, আমি ঠিক সময়ে তোদের জাগিয়ে দেব।

আমি বললুম: তোমার তো খুব খাটুনি গেছে এ কদিন, তুমিই চোখ বোঁজ, আমি তোমায় জাগিয়ে দেব।

তবে আয়, বসে বসেই আমরা চোখ বুঁজি। বোধহয় আর বেশি দেরি নেই সগৌলি পৌঁছতে।

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে আমরা চোখ বুঁজলুম।

১০

নীরা আমার সামনেই শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মিল নেই কোনখানে, তবু তার দিকে তাকালেই স্বাতির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। স্বাতি তার শরীরটাকে যেমন সারাক্ষণ ঢেকে রাখে, তেমনি মনটাকেও রাখে লুকিয়ে। নীরার সে চেষ্টা নেই। তার শরীরে যেমন উদ্ধত ভাব, মুখেও তেমনি। অথচ তার মা রাঙা মাসি আমার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ব্যবহার করেছেন। মেসোমশাই আসতে পারেন নি বলে তাঁর অভাবটাও ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। একটি কথা বলেছেন বার বার, নীরার বিয়ের কথা। বাঙলার বাইরের কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে তাঁদের নেই, তাঁরা চাইছেন কলকাতার কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ধনী ছেলে তাঁরা চান না, ছেলে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হলেই চলবে। বুদ্ধিমান ছেলে একটু সাহায্য পেলেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারবে, এই তাঁদের ধারণা। বিনয়ের মাও আমাকে এই কথা বেশ ভাল করে বুঝিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছের কথাও বলেছেন। নীরা মেয়ে ভাল, বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান বলেই একটু একরোখা। তা না হলে রূপে গুণে তার তুলনা নেই। বিনয়ের কাছে তাঁরা শুনেছেন যে আমি ইচ্ছে করেই কেরানীর কাজ করছি। এ কাজ ছেড়ে দিলেই কোন ভাল কাজ পেয়ে যাব। এ কথা নাকি আমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার। বিয়ে করলে বউই বোঝাবে। প্রয়োজন বাড়লে উন্নতির চেষ্টাও করবে। দেশে নাকি যোগ্যতার দাম এখনও আছে।

আমি চোখ বুঁজে রইলুম। কিন্তু নীরার ভাবনা আমার মনে এল না। আবার আমার স্বাতির কথাই মনে পড়ে গেল। তার নিঃশব্দ বিদ্রোহের কথা। মালাবার হিলে জো রায় বলেছিলেন, সকালেই আমাদের হোটেলে এসে জুটবেন। কিন্তু রাতে শোবার আগে স্বাতি

আমাদের চমকে দিয়েছিল। কোন ভূমিকা না করে বলেছিল, কাল সকালে আমরা পুনায় যাব। মামী বলবার চেষ্টা করেছিলেন, তা কাল কী করে হয়! কাল সকালে যে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলেছিল, কারও জন্যে বসে থাকতে তো আমরা এখানে আসি নি!

কথাটা মিথ্যে নয়। মামীও বুঝতে পেরেছিলেন যে মেয়ে আজ কোন কথা শুনবে না, তাই তিনি নিজের মান রক্ষার জন্যেই চুপ করে গিয়েছিলেন। আর আমরাও পর দিন প্রত্যূষে পুনা যাত্রা করেছিলুম। পুনা থেকে গোয়া।

কিন্তু সেখান থেকে বম্বে ফেরার সময় মামীর কথায় জো রায়কে খবর দিতে হয়েছিল। স্বাতির সেদিনের আচরণও আমার মনে পড়ছে। ট্রেন থামবার আগে আমি এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। কাঁধের কাছে নিঃশ্বাস পেয়ে ফিরে দেখলুম যে স্বাতি আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখেব পাশেই তার হাসি মুখ, আর দৃষ্টিতে কৌতুক যেন উপছে পড়ছে। আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাব কাঁধেব উপরে একখানি হাত রাখবার।

জো রায় স্টেশনে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাদের গাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। স্বাতি আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামল। জো রায়কে যেন দেখতেই পায় নি এমনি ভাব।

স্বাতির এই আচরণের কারণ আমি অনুমান করেছিলুম। সে বোধহয় আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চেয়েছিল জোকে। কিন্তু স্বাতি বুঝতে পারে নি যে তার ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই তা জো রায়ের জানা ছিল না। তিনি আমাদের ভাই বোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। হয়তো ভেবেছিলেন যে তাঁকে দেখেই স্বাতি পুলকিত হয়ে উঠেছে। জো রায়ের মনে ঈর্ষা জাগাতে স্বাতি সক্ষম হয় নি।

কিন্তু এর পর স্বাতির আচরণ আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জো রায়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে স্বাতির কথায় আমরা স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে রাত্রি যাপন করেছিলুম। ভোরবেলায় বন্ধ দরজার উপরে করাঘাতের শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছিল। তার পরেই শুনেছিলুম স্বাতির কণ্ঠস্বর ঃ আর কত ঘুমোবে বল তো!

বাবান্দায় বেরিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। আকাশে একটু আলো ফুটেছে বটে, কিন্তু বারান্দায় এখনও অন্ধকার আছে। স্বাতি আমাকে বেরোবার জন্যে তৈরি হতে একটুখানি সময় দিয়েছিল। তারপর নামিয়ে এনেছিল পথে। তাব পায়ের দিকে তাকিয়ে আমাব সন্দেহ ছিল না যে তার মনও প্রভাতের আলোর মতো ঝকঝক করছে। বলেছিলুম, আজ একি খেলা হল?

স্বাতি বলেছিল, খেলা আবাব কিসের! এক দিন লুকিয়ে বেরিয়েছিলাম, আজ না হয় জানিয়েই বেবোলাম।

ম্যাড্রাসের সেই ঘটনা আমাব মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলুম, সেদিন ধবা পড়ে গেলে লজ্জা পেতে, কিন্তু তোমার আজকেব কাজেব পরিণাম নিষ্ঠুর হতে পাবে। বিয়েটাই হয়তো আটকে যাবে।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল, যদি বলি মতলবটা ঐ রকমই কিছু! আমি বলেছিলুম, তাহলে আমি তা কোন্ ভাগ্যবানের জন্যে সে কথা জানতে চাইব। স্বাতি বলেছিল, সে থাকে তাল গাছের মাথায়, কাবিয়া পিরেত বা। আর আমি জিভ কেটে উত্তর দিয়েছিলুম, আরে মুংরি, তেরা সরম নেহি বা। তারপরে দুজনেই হেসেছিলুম অনেকক্ষণ ধরে।

এক সময়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোথায় নিয়ে যাবে? স্বাতি বলেছিল, অমন নীরস কথা আজ ভাল লাগছে না। বলেছিলুম, তবে কবিতায় বলি—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?

স্বাতি বলে উঠেছিল, নিরুদ্দেশে। বলে একটা খাবারের দোকানে

ঢুকে পড়েছিল। চাট ফুচকা গোলগাপ্পার দোকান, গরম গরম ভাজছে এই সকাল বেলায়। খদ্দেরও জুটছে। আমরাও জুটে গিয়েছিলুম। বেশ জাঁকিয়ে বসে স্বাতি বলেছিল, আজ তোমাকে ফতুর করে দেব। আমি বলেছিলুম, ফতুরকে আর ফতুর করবে কি! কিন্তু স্বাতি বলেছিল, এখানেই বিপদের শেষ ভাবলে ভুল করবে। দু পা এগিয়েই আবার খেতে চাইব। বলেছিলুম, রাজভোগ খেতে চাইলে ভয়ের কারণ ছিল। তুমি তো আমারই মতো বাদশাহ, ঘুগনি আর পকৌড়া পেলে কোপ্তা আর কালিয়া তোমার মুখে রোচে না। স্বাতি বলেছিল, আজ সারা দিন গাড়ি চড়ব।

খেয়ে দেয়ে যখন পয়সা দিচ্ছিলুম, স্বাতি জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার পকেটে আজ কত পয়সা আছে গোপালদা? বলেছিলুম, আছে কয়েকটা ফুটো পয়সা। পকেটটা ফুটো নয় তো? বলে স্বাতি হেসেছিল। আমার মনে হয়েছিল যে কোন স্কুলের মেয়ে আজ স্কুল থেকে ছাড়া পেয়েছে, তাই তার আনন্দের আর সীমা নেই। একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমাকে ঠেলে তুলেছিল। বলেছিল, চৌপাঠি চল। দূর থেকে চৌপাঠি দেখতে পেয়েই নেমে পড়েছিল। তারপর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, তোমার পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম।

চৌপাঠিতে একটু নিরিবিলি দেখে আমরা বালির উপরে বসে পড়েছিলুম। খানিকটা শুকনো বালি টেনে নিয়ে স্বাতি বলেছিল, এসো, এই বালি দিয়ে একটা মন্দির গড়ি। সেই মন্দিরে আমরা দুজনে তপস্যা করব।

বালির মন্দিরের নামে আমার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠেছিল। কিন্তু স্বাতি যে তা শুনতে পাবে, আমি সে আশঙ্কা করি নি। স্বাতি বলেছিল, কী হল? উত্তরে আমি সত্যি কথাই বলেছিলুম, বালির মন্দির আমরা আর কতকাল গড়ব? স্বাতি হেসে বলেছিল, সমুদ্রের তীরে যে শুধু বালি, পাথর আছে পাহাড়ের ওপরে। এর পরে আমরা হিমালয়ে যাব, হিমালয়ের মন্দির কোন দিন ভাঙে না।

ছেলে মানুষের মতো অনেক কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাকে। সহসা সে আমার ছেলেবেলার কথা জানতে চেয়েছিল। কেউ কোন দিন আমার শৈশবের কথা জানতে চায় নি, স্বপ্নেও ভাবিনি যে কেউ কোন দিন তা জানতে চাইবে। তাই নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। স্বাতি বলেছিল, তুমি কি খুশী হও নি? বলেছিলুম, খুশী! হ্যাঁ, তা হয়েছি বৈকি! যে কথা কেউ কোন দিন জানতে চায় নি, সেই কথা তুমি আজ জানতে চাইলে।

স্বাতির চোখে আমি এক রকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন আমিও এমনি একটি মুহূর্তের অপেক্ষা করেছি অনেক দিন ধরে। চেয়েছি এমনি একটি মানুষ যে আমার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বেঁধে দেবে স্নেহে ও প্রশ্রয়ে, আনন্দময় করে তুলবে জীবনকে। সেদিন আমি অকপটে অনেক কথাই বলেছিলুম স্বাতিকে। তার পর সমুদ্রের দিকে চেয়ে আমরা নীরবে বসে ছিলুম অনেকক্ষণ, তার গান শুনেছিলুম দু কান ভরে।

অকস্মাৎ জো রায়ের কণ্ঠস্বরে আমাদের ধ্যান ভেঙেছিল। পিছন থেকে তিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, আপনারা এখানে! আর আমি সমস্ত বোম্বাই শহর আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি!

কোন কথা না বলে আমরা জো রায়ের গাড়িতে এসে বসেছিলুম। এক মুহূর্তের জন্যেও স্বাতি আমাকে বুঝতে দেয়নি যে এর একটু পরেই সে আমাকে দেশে ফিরে যেতে বলবে। জো রায় স্বাতিকে বলেছিলেন, আপনি বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস! এই কথার উত্তরেই স্বাতি বলেছিল, গোপালদার মতো নই। আজ এখানে, কাল শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই না গোপালদা?

এ কথা শুনেই আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে। আমি ফিরে গেলে মামী নিশ্চিন্ত হবেন, খুশী হবেন

জো রায়। কিন্তু স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই আমি এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। এইবারে বলে ফেললুম, ভাবছি—

স্বাতি জিজ্ঞেস করেছিল, আজই ফিরবে? এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। বুকের ভিতরটায় একটা বেদনা মুচড়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন এমন হল সে কথা ভেবে দেখবার আগেই বলেছিলুম, আজই। মামা আমাকে বলেছিলেন, আব দুটো দিন কি থাকা চলে না? আমি একটা যন্ত্রণা বোধ কবেছিলুম। দুদিন কেন, আমি চিরদিন থাকতে পারি। কিন্তু স্বাতি যে আমায় চলে যেতে বলেছে! কোন্ সাহসে আমি তার আদেশ অমান্য করি! বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলুম, আমাকে ক্ষমা করুন।

শহর দেখতে বেরিয়ে জো রায় আমাদের ইণ্ডিয়া গেটে এনেছিলেন, টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রেব তীবে। কেন জানি না, তাজমহল হোটেলের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত ভাবনা আমাব মনে এসেছিল। মনে হয়েছিল, মামা মামী অনায়াসেই এই হোটেলে উঠতে পারেন, ইচ্ছে করলে জো রায়ও পারেন। কিন্তু আমি পারি না। আমার সমাজের গণ্ডি টানা আছে, তার বাহিরে বেরোবার অধিকার আমার নেই। এই গণ্ডি ভাঙবার জন্যে শক্তি চাই, সাহসও চাই। কিন্তু একজনকে শক্তি সঞ্চয় করতে দেখলে অন্য শক্তি এসে টুঁটি চেপে ধরে, কিংবা লোভ দেখায়। সেই লোভে হয় পদস্খলন।

আমি দূরে সরে যেতে স্বাতি কাছে এসে বলেছিল, এমন ভাবনা তুমি কবে থেকে ভাবছ? চমকে উঠেছিলুম আমি, কোন উত্তর দিতে পারি নি। আর স্বাতি বলেছিল, সাহসের অভাব? বলেছিলুম, অভাব সাহসের নয়, অপ্রিয় সত্য বলার নিষেধ আছে শাস্ত্রে। স্বাতি বলেছিল, তবু শুনি। এর উত্তরেই আমি বলেছিলুম, রথ চলে রাজপথ দিয়ে, তার ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক মুখর হয়। যে মাটির বুকে তার দাগ কেটে পড়ে, তার কান্না কি কেউ শুনতে পায়? পায় না। এ যুগের সভ্যতার রথ চলেছে মানুষের বুকের ওপর দিয়ে।

স্বাতি বলেছিল, আর একটু বুঝিয়ে বল। আমি বলেছিলুম, এই দেশের কথাই মনে কর। ঋচিক মুনি মহারাজ গাধীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, আপনার কন্যা সত্যবতীকে আমি বিবাহ করব। গাধী এদেশের ক্ষত্রিয় রাজা, আর ঋচিক একজন সামান্য তপস্বী ব্রাহ্মণ। সেদিন কোন বর্ণের প্রশ্ন ওঠে নি, ওঠে নি অর্থের প্রশ্ন। আবাল্য প্রাচুর্যে পালিত যুবতী রাজকন্যা এল এক ঋষির অরণ্য-আশ্রমে পরিচর্যার ভার নিয়ে। এমনি করেই লোপামুদ্রা এসেছিল অগস্ত্যের আশ্রমে। আরও অনেকে এসেছিল। এ দেশের বিস্মৃত ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু আজ?

গভীর দৃষ্টিতে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আর সাহস পেয়ে আমি বলেছিলুম, এ যুগের রাজকন্যা এসে ঐ তাজমহল হোটেলে উঠবে, আর ঋষিকে গলাধাক্কা দেবে হোটেলের দারোয়ান।

স্বাতি বলেছিল, দোষ কি ঋষির, না রাজকন্যার? বলেছিলুম, দুজনের কারও দোষ নয়। দোষ সভ্যতার। সভ্যতার মানদণ্ডে আজ আধ্যাত্মিক চেতনার ওজন নেই। ওজন শুধু আর্থিক কৌলিন্যের।

এর পরের ঘটনা আমি আগেই বলেছি। স্বাতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে এসেছিলুম। স্বাতি কলকাতায় ফেরে নি, ফিরেছিল দিল্লীতে। কোন চিঠি দেয় নি আমাকে। হঠাৎ তার বিয়ের খবর পেয়েছিলুম মামার চিঠিতে। তার পরের ঘটনাও বলেছি। হালদার মশায়ের কাছে শোনা কথাও।

পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে আমি তাঁদের দেখা পাই নি। তাঁরা দিল্লীতেই ফিরে গিয়েছিলেন। মামা আর কোন চিঠি আমাকে দেন নি। দেয় নি স্বাতিও। আমার সম্বন্ধে তাঁরা কী ভেবেছেন জানি না। কেন নীরবে আছেন তাও বুঝি না।

ট্রেনের কামরায় আলো জ্বলছে। এই আলোতে আমার ঘুম আসে না। কিন্তু আমার সামনে নীরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, অসংবৃত হয়েছে তার বুকের বসন। হাবুলদাও ঘুমিয়ে পড়েছে, আর নাক

ডাকছে পরমানন্দর। বিনয় তো আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাঁচ-জনের মধ্যে এখন আমিই শুধু জেগে আছি, আর ভাবছি আমার অতীত জীবনের কথা।

যা আমার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল তা ভুলতে পারি না কেন? কিসেব বাধা? পুরনো দিনের সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গেলে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারতাম। এ কাজে কেউ তো আমাকে বাধা দিচ্ছে না! নিজের মনই আমার বাধা, এ মন বুঝি আমার কথা আর শোনে না। শোনে আব একজনের কথা। দূরে থেকেও আমার অবাধ্য মনকে শাসনে রেখেছে তারই শক্তিশালী মন। তাব কবল থেকে আমার বুঝি মুক্তি নেই।

ঘড়িতে আমি সময় দেখলুম। বাত একটা বেজে গেছে। হাবুলদা বলেছিল, রাত পৌনে দুটোয় এই ট্রেন সগৌলিতে পৌঁছবে। সেখানে নেমে আমাদের রাত কাটাতে হবে ওয়েটিং-রুমে। সকাল পৌনে ছটায় ছাড়বে বক্সৌলেব ট্রেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রক্সৌলে পৌঁছব। তাবপর বাসে কাঠমাণ্ডু।

এ যাত্রায় স্বাতি আমার সঙ্গে নেই। আর কোন দিন সে আমাব সঙ্গে থাকবে কিনা জানি না। তার কাছে আমি কোন অপরাধ করেছি বলে মনে পড়ছে না। তার অবাধ্য তো আমি হইনি, হয়ে-ছিলুম মামার অবাধ্য। তিনি আমাকে দু-একটা দিন মাত্র থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু স্বাতির জন্যেই আমি থাকতে পারি নি। স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলেছিল। ইঙ্গিতে এ কথা বললেও তা ছিল আমার কাছে স্পষ্ট।

জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির ব্যবহার আমি দেখেছি। আমার মধ্যে যেটুকু অপমান-বোধ আছে, তাতেই আমি পিছিয়ে যেতুম। নির্লজ্জের মতো বার বার এগিয়ে যেতুম না তার দিকে। জো রায়ের দুর্বলতা যে স্বাতি জেনে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জো রায় তা বুঝতে পারছেন না কেন জানি না।

স্বাতি যখন আমাকে ফিরে যাবার কথা ইঙ্গিতে বলেছিল, তখন আমার মনে হয়েছিল যে সে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সোমনাথের পথে জো রায়কে যেমন করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, কতকটা তেমনি করেই। জো রায় বুঝতে না পেরে দেরি করেছিল গাড়ি থেকে নামতে, আর আমি তার ইঙ্গিতটাই ধরতে পেরে ফিরে আসার প্রস্তাব করতে পেরেছি নিজেই। মামা মামীর কাছে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু স্বাতির কাছে?

স্বাতি আমাকে মূর্খ ভাববার অবকাশ পায় নি। কিন্তু বুদ্ধিমান ভাবতে পেরেছে কি? সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে পুরুষের অহঙ্কার করবার যদি কিছু থাকে তো সে তার বুদ্ধি। অর্থ নয়, সামর্থ্য নয়, চরিত্রবলও বুঝি নয়। বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুই লুকনো যায়, কিন্তু বুদ্ধির অভাব লুকনো যায় না কোন কিছু দিয়েই। পুরুষের বুদ্ধিই তার শক্তি। পশুর শক্তি দেহে। পৃথিবী আজ যে শক্তির বড়াই করছে তা পাশবিক। এর সঙ্গে বুদ্ধির যোগ না হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

আমি গাড়ির সমস্ত যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলুম। প্রায় সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। যারা জেগে আছে, তারাও আছে চোখ বুঁজে। কথা বলছে না কেউ। এ ট্রেনের যাত্রা সগৌলিতেই শেষ হবে না, নাবকাটিয়াগঞ্জ নামে কোন দূরের স্টেশন পর্যন্ত যাবে। মজঃফরপুরে ট্রেনে চাপবার আগেই এ কথা জেনেছিলুম।

আর একবার আমি হাতের ঘড়ির দিকে তাকালুম। সময় যেন কিছুতেই এগোচ্ছে না। বড্ড ধীরে চলছে ঘড়ি। ঘড়ি পুরনো হলে কি ধীরে চলে! মানুষের জীবনও কি এমনি ঝিমিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। চলার গতি যায় কমে।

তারপর?

হঠাৎ একটা কলরব শুনে আমি চমকে উঠলুম। গাড়ির ভিতরে ও বাহিরে এক সঙ্গে অনেকে যেন কলরব করে উঠেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এই কলরব শুনেই আমি জেগে উঠলুম এবং

আশ্চর্য হলুম দেখে যে হাবুলদা চোখ মেলে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করেই চেঁচিয়ে উঠল : তোরা নিজেরাই নামবি, না কোলে করে নামাতে হবে ?

বলে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়েই সবাইকে ঠেলে তুলে দিল। আমাকে বলল : ঘুমোবাব অনেক সময় পাবি গোপাল, উঠে পড়, এখন।

আমরা সবাই নেমে পড়লুম সগৌলি জংসনের প্ল্যাটফর্মে। তারপর ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বাকি রাতটা কাটাবার জন্যে যে যার মতো ব্যবস্থা করে নিলুম। কাল সকালে আমরা নেপালে পৌঁছব।

১১

ওয়েটিং রূমে আমরা ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছিলুম। তারপর একে একে মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। নীরার ঘুম ভাঙছিল না দেখে হাবুলদা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। বলল ঃ তোর ঘুম যে কুম্ভকর্ণের চেয়েও বেশি দেখছি!

পরমানন্দ্ স্নান করে বেরিয়ে আসছিল। সে সুর করে গাইছিল ঃ

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সমুন্দর ভরপুর।
তুলসী চাতককে মতে সোঁয়াৎ বিনে সব ধুর॥

আমি প্রথম লাইনটার মানে বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু দ্বিতীয় লাইনের সোঁয়াৎ শব্দটির মানে জানি নে বলে এই দোঁহার অর্থবোধ আমার হল না। তাই পরমানন্দ্ থামতেই বললুম ঃ এর মানে কী হল পরমানন্দ্ ভাই?

হাবুলদা বলল ঃ তুইও তুলসীদাসের ভক্ত নাকি?

বললুম ঃ কথাটা মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে।

পরমানন্দ্ গদগদ ভাবে বলল ঃ ঠিক ধরেছেন গোপালদাদা, বড় মূল্যবান কথা। সবাই এ কথা বুঝে না। তুলসী বলছে যে চাতকেব কাছে আকাশের জল ছাড়া আর সবই ধূলো। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী আর সাত সমুদ্র জলে ভরপুর হলেও চাতক শুধু আকাশের জলই পান করে।

হাবুলদা বলল ঃ এ কথা তো সবাই জানে।

কিন্তু সবাই বলতে পাবে না। এর একটা আধ্যাত্মিক অর্থও আছে বলে মনে হচ্ছে।

কী রকম?

যারা ভক্ত, তারা শুধু ঈশ্বরের প্রেমই প্রেম মনে করে, আর কিছুকে নয়।

কথাটা আমি বলেছিলুম হাবুলদাকে, কিন্তু পরমানন্দ্ বলল : এই দোঁহার এই মানে নাকি গোপালদাদা ?

বললুম : আমার তো তাই মনে হয়।

পরমানন্দ্ গদগদ ভাবে বলল : দেখেছেন, লেখাপড়া জানাটা কত বড় জিনিস। মূর্খ বলে আমরা ভেতরের মানেটা ধরতে পারি না।

নীরা তার কাপড় ঠিক করতে করতে আমাদের কথা শুনছিল। হাবুলদা তাড়া দিয়ে বলল : যা যা, শিগগির মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে আয়, সন্ধ্যে পর্যন্ত আর সময় পাবি না।

বলে এক রকম জোর করে ঠেলে তাকে বাথরুমে পাঠিয়ে দিল।

আমি বললুম : পরমানন্দ ভাই, ততক্ষণ আর একটা দোঁহা শোনাও।

পরমানন্দ্ সবিস্ময়ে বলল : আরে, কী বলছেন গোপালদাদা, আমি আপনাকে দোঁহা শোনাব !

হাবুলদা বলল : ভনিতা না করে শোনা আর একটা।

পরমানন্দ্ এবারে সুর করে গাইল :

ধন অরু যৌবন কো গরব কবহু করিয়ে নাহি।

দেখ, তহি মিট যাত হয় যাও বাদরকে ছাহি॥

হাবুলদা বলল : ওর কাছে মানে শোনবার আগে তুই এর মানেটা বল্।

বলে আমার দিকে তাকাতেই বললুম : এর মানে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ধন আর যৌবনের গর্ব কখনও কোরো না। বাদলের ছায়ার মতো এ সব ক্ষণস্থায়ী। মেঘের ছায়া মিলিয়ে যেতে যেমন সময় লাগে না, ধন আর যৌবনের গর্বও তেমনি। তাই না পরমানন্দ্ ভাই ?

পরমানন্দ্ বলল : আপনি তো আমার চেয়ে ভাল বলেছেন।

হাবুলদা বলল : ভাল সাকরেদ পেয়েছিস। কিন্তু আর দেরি

করিস নে। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তোবা চায়েব চেষ্টা দেখ্। আমি মাল পাহাবা দিচ্ছি। বিনয় এলে ওকে ট্রেনে পাঠিয়ে দেব।

পরমানন্দ্ বলল : আমি তো চা খাই নে হাবুলদাদা, গোপাল-দাদার সঙ্গে তুমি চলে যাও। ওঁদের হয়ে গেলে আমি ওঁদেরও চায়েব দোকানে পাঠিয়ে দেব, আর আমি মালপত্র নিয়ে ট্রেনে গিয়ে উঠব।

দেখি তোর জন্যে দুধ পাওয়া যায় কিনা। আয় গোপাল।

বলে হাবুলদা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

সকাল পৌনে ছটায় আমাদের ট্রেন ছাড়ল এবং রক্সৌলে পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগল না। এরই মধ্যে হাবুলদা আমাকে ছোট-খাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে দিল। বলল : সবাই বলে যে শিবরাত্রির সময় নেপালে যেতে ভারতীয়দের কোন অনুমতি নিতে হয় না। কিন্তু তুই এ কথাটা তোর বইএ লিখিস না যেন।

কেন ?

এ রকমের কথা কোথাও পড়ি নি। লোকে নানা রকমের কথা বলে, কিন্তু সে সব তো ছাপার অক্ষরে লেখা উচিত নয়। তুই লিখবি যে ভারতীয়দের দরকার ডিস্ট্রিক্ট বা সিটি ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র অর্থাৎ আইডেনটিটি লেটার। কিন্তু অন্য দেশের লোক হলে পাসপোর্ট ও ভিসা চাই। অবশ্য ভারতের সিটিজেন হলে ভিসা না নিলেও চলতে পারে।

বিনয় বলল : কিন্তু আম'দের তো এ সব নেওয়া হয় নি !

হাবুলদা গম্ভীরভাবে বলল : তোরা কি আমাব সঙ্গে যাচ্ছিস না ?

পরমানন্দ্ বলল : তোমার সঙ্গে গেলে বুঝি কিছু নেবার দরকার হয় না ?

হুঁ।

বলে পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে হাবুলদা বলল মাথাটা সব দিকে চালাতে হয় বুঝলি ! বিয়ের সময় এক অনারারি

ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। চুপি চুপি তার হাতে এই কজনের নাম দিয়ে দিয়েছিলাম।

বলে চিঠিটা আবার ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল : আর একটা ঝামেলা—বুদ্ধি দিয়ে তা সামলাতে হবে ধরা পড়লে।

সেটা কি হাবুলদা?

হেল্‌থ সার্টিফিকেট। তাতে থাকবে যে কলেরা আর বসন্তের টিকে নেওয়া হয়েছে। ইণ্টারন্যাশনাল হেল্‌থ সার্টিফিকেট থাকলেই চলবে।

বিনয় বলল : ধরা পড়লে কী করবে?

জেলে তো আর আটকে রাখবে না! ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ততক্ষণে আমাদের সব দেখা হয়ে যাবে।

রক্সৌলে ট্রেন পৌঁছল ছটা চল্লিশ মিনিটে। আমি জানালার ধারে বসেছিলুম, আর হাবুলদা উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজার হাতল ধরে। ট্রেন থামবার আগে প্লাটফর্মের অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল : নেপালে যাবেন? কাঠমাণ্ডু?

হাবুলদা বোধ হয় মাথা নেড়ে বলেছিল : হ্যাঁ।

অমনই একজন গাড়ির হাতল ধরে ছুটতে লাগল। গাড়ি থামতেই কাবু করে ফেলল হাবুলদাকে। গাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়ে বলল : পাঁচখানা তো! এই নিন পাঁচখানা কাঠমাণ্ডুর টিকিট।

হাবুলদা বলল : বাস কত দূরে?

এই তো, স্টেশনের পেছন দিয়ে বেরোলেই দেখবেন আপনাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে। কোন কষ্ট করতে হবে না। শুধু বাসে উঠে বসবেন, বাকি সব কাজ আমি করব।

হাবুলদা বলল : দেখ বাবা, বিশ্বাস করছি তোমাকে। ডুবিও না যেন।

তখন আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছিলুম। পরমানন্দ্ বলল : একটা কথা বললে রাগ করবে না তো হাবুলদাদা ?

অমন ভনিতা করছিস কেন ! বল্ না কী করতে চাস ?

পরমানন্দ্ তাব ধুতির ট্যাঁক থেকে খান কয়েক একশো টাকার নোট বার করেছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলল : নেপালের এই খরচটা আমাকে দিতে দিন।

বলে টাকাটা হাবুলদার পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাবুলদা তেড়ে উঠে বলল : তোরা আমাদের গেস্ট্ না ? কোন্ সাহসে তুই আমাকে টাকা দিচ্ছিস ?

বিনয় বলল : তুমি একাই বা কেন খরচ করবে ! আমাদের শেয়ার করতে দাও।

হাবুলদা বলল : হাঁদারা বুঝবি না, এ আমার টাকা নয়, কারও টাকাই নয়।

তবে ?

এ হল বিয়ের ফাণ্ডের টাকা। পরমানন্দ্ গায়ে গতরে খেটে বরযাত্রী এণ্টারটেন্‌মেণ্টের টাকা বাঁচিয়েছে। এর মধ্যে গোপালেরও কৃতিত্ব আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই হাবুলদা বলল : বরযাত্রীদের একটা দলকে গাড়ি করে জনকপুর ঘুরিয়ে আনার কথা ছিল। কিন্তু গোপালের সঙ্গে জমে গিয়ে তারা সে কথা ভুলেই গিয়েছিল। অর্থাৎ এ আমাদের বিজনেসের প্রফিট। মা বলেছেন, এরা এই টাকাতেই ফুর্তি করে আসুক। আমরা চুরি বেইমানি করি নি তো ! বাবার মুখ বন্ধ।

তার পরেই পরমানন্দ্‌কে বলল : রেখে দে তোর টাকা। আমার পকেট ফাঁক হয়ে গেলেই তোদের টাকা নেব।

বলে বাসের ভাড়া নিজেই দিয়ে দিল।

সঙ্গে আমাদের মালপত্র সামান্যই ছিল। বাসের টিকিট বিক্রেতা

লোকটি হাবুলদার ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে একটা কুলির মাথায় তুলে দিল আর সকলের জিনিসপত্র। তারপর রেল-লাইন পেরিয়ে এগিয়ে চলল।

হাবুলদা হেঁকে বলল : ও দিকে কোথায় যাচ্ছ ?

লোকটি এগোতে এগোতেই বলল : অত ঘুরে যাবেন কেন ? এই দিক দিয়েই চলে আসুন।

নীরা বলল : কি জানি বাবা, কত দূর হাঁটাবে কে জানে !

কথাটা বোধহয় সে শুনতে পেয়েছিল। বলল : এই-তো এই লাইন কটা পেরোলেই আপনাদের বাস।

কিন্তু পথ যেন শেষ হতে চায় না। নীরা তার শাড়ি সামলে কোন রকমে হাঁটতে লাগল। কিন্তু ক্ষেপে গেল বিনয়, বলল : ইয়ার্কি মারবার আর জায়গা পাও নি, হতভাগা ! মজা দেখাচ্ছি তোমায়।

আরও খানিকটা হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার পর লোকটা চেঁচিয়ে উঠল : ঐ তো, ঐ আপনাদের বাস। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে। চলে আসুন তাড়াতাড়ি।

বলে সে নিজেই ছুটল। তার ভাব দেখে মনে হল যে বাসের জায়গা যাতে বেদখল হয়ে না যায়, তার জন্যে সে নিজেই ব্যস্ত হয়েছে বেশি।

পাঁচজন, পাঁচজন !

বলে সে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল দেখলুম। আব দু-তিনখানা রিক্সাও যাত্রী নিয়ে এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গেও মালপত্র আছে—বাক্স বিছানা। সে সব বাসের ছাদে উঠল, আর যাত্রীরা আমাদের আগেই বাসে জায়গা দখল করে বসলেন। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছলুম পরে।

নীরা বলল : আমি আগেই জানতাম' যে হাবুলদার সঙ্গে যখন বেরিয়েছি, তখন অনেক কষ্ট আছে কপালে।

হাবুলদা বলল ঃ জানতিস যদি তো এলি কেন মরতে

বিনয় টলতে টলতে বাসে উঠে জানালার একটা ধারে বসে বলল ঃ না হাবুলদা, লোকটাকে ছিড়ে দিও না, একটা সাজা দাও ওকে। আব যেন কাবও সঙ্গে সে এ রকম না কবে।

কিন্তু পরমানন্দ বলল ঃ রাগ করছেন কেন বিনয়দাদা! আপনি কলকাতাব মানুষ তো, তাই আপনার কাছে এটা দূব বলে মনে হচ্ছে। ওব কাছে এটা কোন দূবই নয়। ও আমাদের ভালোর জন্যেই করেছে। কিছু পয়সাও তো বেঁচে গেল। সেটাই বা কম কী!

হাবুলদা খুশী হয়ে বলল ঃ ঠিক বলেছিস!

বাস এ যুগের লাক্সারি বাস নয়, সেকেলে বাস। বসবার জায়গা মোটেই আরামপ্রদ নয়। হাঁটু মুড়ে বসতে হয়, তা না হলে সামনেব সীটের সঙ্গে ঠেকে যায়। বসেই বোঝা গেল যে এই ভাবে সারা দিন পথ চলতে বেশ কষ্ট হবে। নীরাও একটা জানালার ধারে বসেছিল, হাবুলদা বসেছিল তার পাশে। আমি বিনয়ের পাশে বসলুম, আর পরমানন্দ্ বসল আমার পিছনে। বিনয় তার পায়ের অসুবিধার কথা ঘোষণা করতেই পরমানন্দ্ বলল ঃ যাই বলুন বিনয়দাদা কোন হাঙ্গামা করতে হল না, এ যেন আমাদের রিজার্ভ করা বাস!

কিন্তু বিনয় বলল ঃ আমরা পাঁচজন ছিলাম। একটা ট্যাক্সি নিলেই তো ভাল হত!

হাবুলদা বলল ঃ হ্যাঁ, তা হত। তোর গাড়ি আনলে আরও ভাল হত। মজঃফরপুব থেকেই তোর গাড়িতে চড়ে আসতে পারতাম।

পরমানন্দ্ বুলল ঃ কিন্তু একটা ভাবনার কথা ছিল। ট্যাক্সি না পেলে এই বাসটাও ধরা যেত না।

হাবুলদা খুশী হয়ে বলল ঃ ঠিক বলেছিস।

যাত্রীবা সব উঠে পড়তেই বাস এই স্ট্যাণ্ড ছেড়ে একটুখানি এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। হুড়মুড় কবে আবার সবাই নেমে পডলেন। হাবুলদা বলল ঃ ব্যাপার কী?

একজন যাত্রীই উত্তর দিলেন : চেক্ পোস্ট্। আমাদের সমস্ত মালপত্র খুলে দেখাতে হবে। কারও কাছে ক্যামেরা-ট্যামেরা থাকলে—

এই সেবেছে! গোপালের জন্যে ছবি তুলব বলে, আমিই তো একটা ক্যামেরা এনেছি!

তার জন্যে ভাবনা নেই। চেক্ পোস্টে ডিক্লেয়ার করে যান, তাতে ফেরাব সময় আর হাঙ্গামা হবে না।

আর একজন যাত্রী বললেন : নেপালী টাকাও এখানে পাবেন।

অন্যজন বললেন : তাব দরকার হবে না। নেপালের সর্বত্র আমাদেব টাকা চলে। আর কয়েকটা পয়সাও বেশি পাওয়া যায়।

ছাদের উপর থেকে বাক্স বিছানা টেনে নামানো হল। তারপর খুলে দেখা হল সে সব। জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে গেল বলে বিরক্ত হলেন কিছু যাত্রী। কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস পেলেন না। আমাদের ব্যাগগুলো হাঁতড়ে দেখে ছেড়ে দিল। হাবুলদাকে তার ক্যামেরার বিবরণ দিতে হল একটা কাগজে লিখে।

নীরার ব্যাগে হাত দিয়েছিল বলে সে রেগে গিয়েছিল। ছেড়ে দিতেই বলল : আর কিছু ?

কিন্তু এ কথার উত্তর কেউ দিল না। এর উত্তর একটাই—আরও হয়রানি চাই ? কিন্তু মহিলা বলেই বোধহয় তারা নীরবে রইল।

সেখান থেকে ছাড়া পেতেই আবার বাস ছাড়ল। এবারে আরও খানিকটা এগিয়ে বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাবুলদা চেঁচিয়ে উঠল : এবারে কী ?

যে লোকটা আমাদের টিকিট দিয়েছিল তার টিকি আমরা আর দেখতে পাই নি। সে কখন কোথায় কেটে পড়েছিল তা বুঝতেও পারি নি। একজন সদাশয় যাত্রী বললেন : এটা বীরগঞ্জের বাজার। এখান থেকেই বাস ছাড়বে। আশেপাশে অনেক দোকানপাট আছে, কিছু খাবার দরকার থাকলে খেয়ে নিন। এর পর আর কিছু পাবেন না।

তাই নাকি!

বলে বিনয় লাফিয়ে নামল সবার আগে। তার পিছনে নীরা। বলল : এসো বিনয়দা, তাড়াতাড়ি একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসা যাক। তা না হলে—

পিছনে হাবুলদাকে দেখেই থেমে গেল। কিন্তু হাবুলদা বলল : তা না হলে কী ?

নীরা বলল : তোমার পাল্লায় পড়লে কপালে অনেক দুঃখ আছে।

তা তো আছেই।

বলে পরমানন্দ্‌কে বলল হাবুলদা : তুই তো দাঁতে দড়ি দিয়ে আছিস. নেমে আয় তাড়াতাড়ি। কিছু খেতে হবে না ?

পরমানন্দ্‌ বলল : তোমরা তো চা খাবে হাবুলদা !

হাবুলদা বলে উঠল : তুই না হয় দুধ খাস। তার সঙ্গে হালুয়া পুরি, কিংবা পুরি জিলেবি। নেপালের বড় বাজার এটা জানিস ! যা চাই, তাই পাবি এখানে।

আমি বললুম : তারপর একটা জর্দা পান।

পরমানন্দ্‌ তখন নেমে এসেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা খাবারের দোকানে ঢুকলুম। যাত্রীরা সবাই তখন যে যার মতো জলযোগ করবার জন্যে বাস থেকে নেমে পড়েছিল। নেপাল রাজ্যে আমরা পদার্পণ করেছি। রক্সৌল থেকে মাইল দুয়েক দূরে এই বীরগঞ্জ শহর। কাঠমাণ্ডু থেকে এখানে ফিরে এলেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে।

নীরা বলছিল : কী বাস রে বাবা, এইটুকু আসতেই কোমর ধরে গেছে।

হাবুলদা বলল : মরতে এলি কেন !

পরমানন্দ্‌ বলল : 'সবাই কি তোমার মতো হাবুলদাদা যে সারাক্ষণ পরের কথা ভাববে ! নিজের কথাও তো থাকতে পারে !

হুঁ, যত সব।

বলে হাবুলদা আহারে মন দিল।

১২

সকাল আটটায় আমাদের যাত্রা শুরু হল। নীরা বলল: কখন পৌঁছব আমরা?

হাবুলদা আমরা মুখের দিকে, তাকাল দেখে আমি বললুম: বিকেলে।

নীরা বলল: বিকেল তো দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যের অন্ধকার না নামা পর্যন্ত।

বললুম: তা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও হতে পারে।

কী রকম?

বলে হাবুলদা আমার দিকে আবার ফিরে তাকাল। কিন্তু উত্তর দিলেন একজন যাত্রী। তিনি বললেন: ঠিকই বলেছেন। রাস্তায় চাকা বদলাতে হবে, সেই চাকা মেরামত করে নিতে হবে দ্বিতীয় বার বদলাবার জন্যে। তারপর ক্লাচ্ ফেল করতে পারে, ব্রেক ফেল করতে পারে। কপাল মন্দ হলে সবই হতে পারে একটার পর একটা। এ সবের মার্জিনও তো রাখতে হবে।

হাবুলদা বলল: এ সবও হয় নাকি?

হয় মানে! আকছার হয়। আর ফেরার পথেই হয় বেশি। তরাইএর জঙ্গলে এসে পৌঁছবে অন্ধকার হবার পর, তারপর একটা গণ্ডগোল হবেই। ট্রেন ধরা তো দূরের কথা, রাত কাটাতে হবে বনের মধ্যে।

নীরা সভয়ে বলল: ওরে বাবা, এ রকম কথা তো কখনও শুনি নি!

ভদ্রলোক বললেন: নেপালে তো প্রথম আসছেন! এবারে অনেক নতুন কথা জানবেন।

আমি বললুম ঃ হাবুলদা, এসব উপরি লাভ। এর নামই অ্যাড্‌ভেঞ্চার। বনের মধ্যে রাত কাটাতে হলে, বাঘ ভালুকেরও দেখা মিলবে।

নীরা বলল ঃ সর্বনাশ! এ রকম জানলে কে আসত নেপালে!

বিনয় বলল ঃ আমি তাহলে প্লেনেই ফিরব হাবুলদা!

হাবুলদা বলল ঃ ফেরার আর দরকার কী! বাস থামিয়ে নেমে যা না এখানেই। হেঁটেই বীরগঞ্জে পৌঁছতে পারবি!

বাস হঠাৎ গর্জন করে উঠল। তারপরে ধাক্কা খেলুম সামনের সীটের সঙ্গে। ওই সীট না থাকলে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম। কিন্তু বাস থেমেও থামল না। আবার গোঁ-গোঁ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

নিজেকে সামলে নিয়ে হাবুলদা বলল ঃ কী হল?

ভদ্রলোক বললেন ঃ কিছু হয় নি তো! ড্রাইভার আমাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করল।

মানে?

মানে গাড়ির অ্যাক্সিলারেটর ক্লাচ ব্রেক এসব যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। পাহাড়ে উঠতে হবে তো।

নীরা বলল ঃ পাহাড় কোথায়?

এখানে পাহাড় দেখবেন কী! পাহাড় এখান থেকে অনেক দূরে। পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত নেপালের রেল-লাইন চলে।

সে তো আমলেখগঞ্জ পর্যন্ত।

যাবার সময় সে পর্যন্ত নির্ভয়ে যেতে পারবেন। ভাবনা পাহাড়ে ওঠানামার সময়ে।

বীরগঞ্জ শহর আমরা ছাড়িয়ে এসেছিলুম, যাচ্ছিলুম সিমরা নামে একটা জায়গা দিয়ে। জানতে পারলুম যে এই সিমরাতেই এখানকার এআরপোর্ট। নেপালী প্লেন কাঠমাণ্ডুর গৌচার থেকে এখানে এসে নামে এবং এখান থেকে বীরগঞ্জ বা রক্সৌলে যেতে হয়। এই রকম

এআরপোর্ট নেপালে অনেক আছে। সে সবের মধ্যে নেপাল এআর লাইন্‌স কর্পোরেশনের ডিসি-থ্রি প্লেন যাতায়াত করে। এই সব জায়গার মধ্যে আছে গোর্খা পোখরা ভৈরোয়া নেপালগঞ্জ ভরতপুর বিরাটনগব জনকপুর প্রভৃতি কয়েকটি জানা নাম। যাঁরা লুম্বিনি যান, তাঁরা নামেন ভৈরোয়া এআরপোর্টে। পোখরা এখন শড়ক পথেও যুক্ত হয়েছে।

এও জানতে পারলাম যে ত্রিভুবন রাজপথ আরম্ভ হয়েছে ভঁয়সে থেকে। আমলেখগঞ্জের পরে চুরে, তারপর ভঁয়সে। সেখান থেকেই হিমালয়ের চড়াই উৎরাই আরম্ভ।

হাবুলদা বলল ঃ পশুপতিনাথের নাম শুনেছিস তো?

বললুম ঃ হ্যাঁ।

ছোটবেলায় আমরা শুনেছিলাম যে পাঁচটা পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হয় পশুপতিনাথ দর্শনে। সে নাকি এক অসাধ্য কাজ, সবাই পারে না এই সব পাহাড় ডিঙোতে।

তবে তীর্থ যাত্রীরা যেত কী করে?

অনেক কষ্ট করে যেতে হত।

বললুম ঃ তীর্থ যাত্রা মানেই তো কষ্টের যাত্রা, আব সেই কষ্টের শেষেই দেবতার দর্শন। আজকাল অমরা কোন কষ্ট করি না বলেই দেবতার দর্শন পাই নে।

হাবুলদা বলল ঃ ঠিক বলেছিস।

এই কথাটা হাবুলদা মাঝে মাঝেই বলে। কোন কথা পছন্দ মতো হলেই বলে, ঠিক বলেছিস। তাই আমি পুলকিত হয়ে আরও কিছু বলার চেষ্টা করলুম না। সকালের বাতাসে একটা খুশির আমেজ ছিল বলেই আমি দুধারে দেখতে দেখতে চললুম।

নেপাল সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই মনে পড়ছে। নেপাল স্বাধীন দেশ। ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুতার। এ দেশের আয়তন প্রায় চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইল, বিহার রাজ্যের প্রায় অর্ধেক,

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের চেয়ে অনেক বড়। পশ্চিম বঙ্গের আয়তন প্রায় চৌত্রিশ হাজার বর্গ মাইল। হিমালয়ের কোলে নেপালেব বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় পাঁচশো মাইল। নেপালের দক্ষিণে ভারত এবং উত্তরে তিব্বত। মানস সরোবর ও কৈলাসে যাবার পথ তার পশ্চিমের সীমান্ত ঘেঁষে। পূর্ব সীমান্তে সিকিম রাজ্য এখন ভাবতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারও পূর্বে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা পেরিয়ে আব একটি স্বাধীন দেশ ভুটান। ভুটান এখনও টুরিস্টদেব নিকটে নেপালের মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পাবে নি। কিন্তু অদূব ভবিষ্যতে নেপালের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হবে শ্যাংগ্রিলার মতন। দুর্গমতাব জন্যই ভুটানের সম্বন্ধে ধারণা আমাদেব অনেক কম।

বিনয় চোখ বুঁজে চলেছিল, আমি ছিলুম চোখ খুলে। নীরা চোখ বুঁজে চলেছে না চোখ মেলে, তা দেখতে পাচ্ছিলুম না। পরমানন্দ আমার পিছনে বসেছিল বলে তাকেও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। হাবুলদা হঠাৎ পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে বলল: গোপাল চুপ করে আছিস কেন, কিছু ভাবছিস নাকি?

বললুম: তোমার কথাই ভাবছি।

আমার কথা!

হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তো একটা নতুন দেশ দেখা হচ্ছে, বাকি থেকে যাবে সিকিম আর ভুটান।

হাবুলদা বলল: আমার জন্যে আবাব কি রে, তোর কপালে ছিল তাই দেখছিস। আর সিকিম ও ভুটান তো তোদের ঘরের কাছেই। কপালে থাকলে তাও দেখা হবে। আর তোকে তা দেখতেই হবে, না দেখলে লিখবি কেমন করে?

বললুম: হাবুলদা, শখটা তো লেখবার নয়, শখ দেখবার। তারপর যদি লিখতে ইচ্ছে করে—

কিছুক্ষণ আগেই যে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন,

তিনি বোধহয় আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন : সে কি মশাই, আপনি আবার বই-টই লেখেন নাকি!

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে বললেন : আমার কথা যেন লিখে বসবেন না, আমি ও রকম কথা বলেই থাকি।

বললুম : আপনার পরিচয়টা যদি দিতেন—

কেন মশাই, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবেন নাকি?

শেষ পর্যন্ত পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম রামলাল, পদবি পরিত্যাগ করেছেন ব্যবসার প্রয়োজনে। বীরগঞ্জে হিন্দীতে কথা বলেন, আর কাঠমাণ্ডুতে নেপালী ভাষায়। তাতে ব্যবসার সুবিধা হয়। কিন্তু ব্যবসা কিসের, তা তিনি বললেন না।

এক সময়ে বললেন : এ দেশে অসুবিধা কী জানেন? দেশটা উত্তর-দক্ষিণের চেয়ে পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচ গুণ বড়, কিন্তু পথ আছে উত্তর-দক্ষিণেই। পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াতের কোন পথ এখনও তৈরি হয় নি। আমরা ভারতের দিল্লী থেকে কাঠমাণ্ডু আসতে পারি, আর কাঠমাণ্ডু থেকে তিব্বতের লাসাও চলে যেতে পারি। কিন্তু কাঠমাণ্ডু থেকে পূবে বা পশ্চিমে কোথাও যেতে পারি নে। এখন পোখরা যাবার পথ হয়েছে; কিন্তু পশ্চিমে নেপালগঞ্জেও যেতে পারি না, পূবে জনকপুর বা বিরাটনগরেও না। তার জন্যে প্লেনে চাপুন, নয় রক্সৌল থেকে ট্রেনে চেপে যান। এই ভাবে কি ব্যবসা চালানো যায়! তবে শোনা যাচ্ছে যে সরকার এ কথাটা বুঝতে পেরেছেন, ব্যবস্থাও নাকি হচ্ছে!

আমি বললুম : পথ তৈরির অনেক কিছু অসুবিধা আছে শুনেছি।

রামলাল বললেন : অসুবিধার চেয়ে টাকার অভাবটাই বেশি। এই ত্রিভুবন রাজপথ আপনাদের সাহায্যে হয়েছে, কাঠমাণ্ডু থেকে লাসা পর্যন্ত মহেন্দ্র রাজপথ হয়েছে চীনের সাহায্যে। শুনতে পাচ্ছি যে পূর্ব-পশ্চিমের পথটা নাকি রাশিয়ার সাহায্যে হচ্ছে।

বললুম : এই সব সাহায্য নিয়ে কোন ক্ষতি হয় নি তো আপনাদের ?

রামলাল বললেন : একটা সত্যি কথা বলব ?

নিশ্চয়ই বলবেন।

যখন আমরা আপনাদের সাহায্য নিযেছিলাম তখন আপনারা এ কথা ভাবেন নি। কিন্তু যখন চীনের সাহায্য নিয়েছি, তখনই আপনাবা ক্ষতিব কথা ভেবেছেন। তার কারণ চীন কমিউনিস্ট্ দেশ, আপনাদেব সঙ্গে তার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা কী ভেবেছিলাম জানেন ?

না।

সব বিষয়েই আমবা আপনাদের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ দেশ থেকে বেরোতে হলেই ভাবত। যত দিন সম্পর্ক ভাল আছে, তত দিনই মঙ্গল। তা খাবাপ হলেই বিপদ, আমবা বন্দী হয়ে যাব। তাই আমরা আমেরিকাব সাহায্য নিয়ে আকাশেব পথও খুলেছি। ১৯৫০ সাল থেকে নেপালে এবোপ্লেন চলছে। কাঠমাণ্ডুব কাছে গৌচারে একটা ফেয়ার-ওএদার ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করে কাঠমাণ্ডু পাটনা ডিসি-থ্রি সার্ভিস চালু হয়। তারপব নেপালেব নানা জায়গায় এআর স্ট্রিপ তৈরি হয়েছে। আমেরিকা এরোপ্লেনও দিচ্ছে, আর তিব্বতের সীমান্তে একটা এআর স্ট্রিপও তৈরি করে দিয়েছে।

এ কথার উত্তবে আমি কিছু বললুম না। আমি এইটুকুই জানি যে রাজনীতিতে আমার কোন দখল নেই। কে কার বন্ধু ও কে কী উদ্দেশ্যে অপরকে সাহায্য করে, তা বুঝি না। কিছু বলতে গেলেই নিজের মূর্খতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই নীরবে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবি।

রামলাল বললেন : আপনারা এই রাজপথ তৈরি করে দিয়েছেন ১৯৫৬ সালে। তার আগে আমরা কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় মোটর গাড়ি দেখেছি। সে সব গাড়ি নাকি কুলির পিঠে যেত, মানে গাড়িটা খুলে

আলাদা করে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে অ্যাসেম্ব্ল্ করা হত। আর আমাদের বাপ দাদারা তো এ সব দেখেন নি। তাঁদের সময়ে শুধু কুলি আর জানোয়ার ছিল মাল বইবার জন্যে। নিজেদের হাঁটতে হত, আর পয়সা থাকলে ঘোড়া। এখনও অনেক জায়গায় আমাদের এই ভাবেই যেতে হয়।

বললুম: আর বেশি দিন এ ভাবে যাতায়াত করতে হবে না।

কেন?

যে ভাবে কাজ চলছে বলে শুনেছি তাতে আর অল্প দিনের মধ্যেই আপনারা সর্বত্র যেতে পারবেন এই ভাবেই। তবে একটা কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে।

কী কথা?

আপনারা আমাদের মতো সমতলবাসী নন, আপনারা হলেন হিমালয়ের প্রজা। হিমালয়কে জয় করা তো সোজা নয়, তাকে চিরকালই আপনাদের সম্মান দিয়ে চলতে হবে। আমরাও যেখানে হিমালয়ের প্রজা, সেখানে তার প্রাপ্য সম্মান আমরাও দিই।

রামলাল বললেন: মন্দ বলেন নি।

এখানে আসবার আগে আমি নেপালের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনো করে এসেছিলুম। তাতে দেখেছি যে নেপালকে তিনটি মূল অংশে ভাগ করা যায়। এই অংশগুলির উত্তরে মহান হিমালয়, দক্ষিণে তরাই অঞ্চল ও মাঝখানে মধ্যাঞ্চলের কাঠমাণ্ডু উপত্যকা ও পোখরার সমভূমি। মহান হিমালয়কে ইংরেজীতে বলা হয়েছে গ্রেট হিমালয়। তার উচ্চতা বারো হাজার ফুটেরও বেশি এবং অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন শৃঙ্গে এই অঞ্চলটি বিভক্ত হয়েছে। কয়েকটি নদী তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে গভীর খাদ কেটে দক্ষিণে এসেছে হিমালয় ভেদ করে। ২৬,৮১১ ফুট উঁচু ধবলগিরি ও ২৬,৪৯২ ফুট উঁচু অন্নপূর্ণার মাঝখান দিয়ে গভীর গিরিবর্ত্ম কেটে বয়ে এসেছে কালী গণ্ডকী। এর পূর্ব দিকে ত্রিশূলী গণ্ডকীর মধ্যে আছে আরও কয়েকটি গিরিশৃঙ্গ।

তাদের মধ্যে প্রধান হল ১৫,৮০১ ফুট উঁচু হিমলচুলি, ২৬,৬৫৮ ফুট উঁচু মানসলু, ২৩,৩৬১ ফুট উঁচু গণেশহিমল ও ২৬,২৮৯ ফুট উঁচু গোঁসাইথান। গণেশহিমল ও গোঁসাইথানের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে ত্রিশূলী গণ্ডকী। এই নদীর তীর ধরে তিব্বতে যাবার একটি গিরিপথ আছে।

২৯,০২৮ ফুট উঁচু মাউন্ট এভারেস্ট নেপালে সাগরমাতা নামে পরিচিত। বিশ্বের এই উচ্চতম শৃঙ্গ নেপালের পূর্ব প্রান্তে কোশী অঞ্চলে অবস্থিত। মাঝখানে ২৭,৮৯০ ফুট উঁচু লোৎসে, পশ্চিমে ২৬,৭৫০ ফুট উঁচু চো-য়ু ও পূর্বে ২৭,৭৯০ ফুট উঁচু মাকালু। গৌরী শঙ্কর প্রভৃতি আরও অনেক শৃঙ্গ আছে এই অঞ্চলে।

এই মহান হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের মাঝেই অন্তর্হিমালয় বা নেপালের মধ্যাঞ্চল। এরই দক্ষিণাংশে চুরিয়া পর্বত এই অঞ্চলকে তরাই অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। চুরিয়া শিবালিকেরই অংশ। পশ্চিমের দিকে মহাকালী নদী থেকে পূর্বে কোশীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত মহাভারত লেখ গিরিশ্রেণী। এরই উত্তরে মিলিত হয়েছে কর্ণালী গণ্ডকী ও কোশী নদীর স্রোতধারা। তারা তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে হিমালয় ভেদ করে নীচে নেমেছে এবং এদেরই মিলিত ধারা মহাভারত লেখ গিরিশ্রেণী ভেদ করে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে ঘর্ঘরা সপ্তগণ্ডকী ও সপ্তকোশী নামে। এই সমস্ত নদী ভারতে এসে গঙ্গায় মিলেছে।

আমরা কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় যাচ্ছি। কাঠমাণ্ডুর উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট। পোখরাও এই মধ্যাঞ্চলে। তিনটি বিশাল পোখর বা হ্রদ আছে বলেই এর নাম পোখরা হয়েছে।

নেপালের এক-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে দক্ষিণের তরাই অঞ্চল। গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন বলে এই অঞ্চল আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। অথচ এখানে বাস করে নেপালের এক তৃতীয়াংশ লোক। বর্ষার সময়ে নেপালীরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে এখানে আসে না, আসে শীতের

সময় ক্ষেতের ফসল কেনা বেচা করতে। তরাই অঞ্চল সমুদ্রতল থেকে দু হাজার ফুট উঠেছে। তারপরেই আরও দুহাজার ফুট লাফিয়ে উঠেছে মধ্যাঞ্চলে। এই সব অঞ্চলে কয়েকটি নূতন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন পশ্চিমের সরু উপত্যকাগুলি দূন নামে পরিচিত, সছিদ্র বালি-মাটি ও ঢালু মাটিকে বলে ভাবর এবং পূর্বাঞ্চলে দুয়ার বা ডুয়ার্স শব্দটিই সমধিক প্রচলিত।

এক সময়ে আমরা আমলেখগঞ্জ পেরিয়ে গেলুম। নেপালের ছোট লাইন শেষ হয়েছে এইখানে, আর শুরু হয়েছে রোপ ওয়ে।

এর পর আমরা চুরে পেরোব। চুরিয়া গিরিশ্রেণীর সঙ্গে চুরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। তারপর ভঁয়সে থেকে শুরু হবে ত্রিভুবন রাজপথ।

হাবুলদা এবারে পিছন ফিরে বলল: তুই বড় চুপচাপ চলেছিস গোপাল!

বিনয় আমার পাশে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। বললুম: একা একা কথা কইলে লোকে পাগল ভাববে।

ঠিক বলেছিস, কিন্তু এ কথাটা আমার সব সময় মনে থাকে না। তাই আশেপাশে কেউ না থাকলেও আমি অনেক সময়ে কথা বলে ফেলি, আর তার জন্যে লজ্জাও পাই। এরা বেশ আছে।

বলে হাবুলদা নীরাকে দেখাল। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ির ঝাঁকানিতে অনেকেরই ঘুম আসে। আমারও যে আসে না তা নয়। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে চলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয় বলে আমি জেগে থাকবারই চেষ্টা করি।

পিছন থেকে পরমানন্দ বলল: দিনের বেলায় ঘুম করাটা কাজের কথা নয়।

হাবুলদা বলল: ঘুম করা আবার কিরে, ঘুমনো বল্।

পরমানন্দ বলল: আমার ভুল ধরে আমাকে শিখাচ্ছ ঠিকই। কিন্তু যারা ভুল ইংরেজী বলে, আর ভুল হিন্দী, তাদের কী

করবে? আমি তো দেখতে পাই সবাই ভুল বলে। তাই না গোপালদাদা?

আমি বললুমঃ পরমানন্দ্ ভাই ঠিকই বলেছে। এখন কলকাতার বাঙলা শুনেও দুঃখ হয়। কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক, তা আর বুঝতে পারি না। নিজে ঠিক বলছি কিনা তাতেই সন্দেহ হয়।

কেন?

পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছে ১৯৪৭ সালে। এই দুই বঙ্গের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে এক সঙ্গে এক রকমের কথাবার্তা বলে। এখন তাদের মধ্যেই অনেক লেখক হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে বাঙলা ভাষায় এমন সব সংলাপ ঢুকেছে যা আগে প্রচলিত ছিল না। অথচ এখন দুই বঙ্গের ছেলেমেয়েবাই সেই ভাষা অবাধে ব্যবহাব করছে। কিছু দিন পবে হয়তো পরমানন্দ্ ভাইএর বাঙলাই শুদ্ধ বাঙলা বলে মনে হবে।

হাবুলদা হো হো করে হেসে উঠল। আর নীরা চমকে জেগে উঠল। তারপর চারি দিকে চেয়ে দেখে বলল ঃ কে হাসল?

আমি।

আমি ঘুমোচ্ছি বলে?

হাবুলদা বলল ঃ ঘুমোবার জন্যেই বেরিয়ে থাকিস তো বাড়িতে শুয়ে ঘুমোলেই তো ভাল করতিস। বাসে কাৎ হয়ে না ঘুমিয়ে বিছানায় পাশ বালিশ নিয়ে ঘুমোতে পারতিস।

নীরা বলল ঃ পাশ বালিশ আমি পছন্দ করি না।

এবারে করবি, করতে হবে। সেই ব্যবস্থা পাকা করবার জন্যেই তোকে নিয়ে বেরিয়েছি।

বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা কটাক্ষ করল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম ঃ তাহলে আমি একটু চোখ বুঁজি।

১৩

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ ছিল ইণ্টারন্যাশনাল টুরিস্ট ইআর। সেই বছর কাঠমাণ্ডু থেকে প্রকাশিত হয়েছিল নেপাল ট্রাভেল কম্পানিয়ন নামে একখানি সংক্ষিপ্ত গাইড বই। এই বইএ নেপালের যে ইতিহাস আছে তাতে আমি একটি নূতন কথা পড়েছিলুম। ভারতের সম্রাট অশোক নেপালের রাজা ধর্মপালকে নিজের কন্যা চারুমতীকে সম্প্রদান করেছিলেন। স্কুলে আমরা যে ইতিহাস পড়েছি, তাতে অশোকের এক পুত্র ও কন্যাও একজন। তাদের নাম মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা। এঁরা দুজনেই সিংহলে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য। চারুমতী নামে অশোকের কোন কন্যার নাম আমার জানা নেই। মনে হয় যে ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তবে চারুমতী রাজ-পরিবারের কোন কন্যা, অশোকের কন্যা নন। তবে অশোক গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে এসেছিলেন এবং একটি স্তম্ভও নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি বলে নেপাল আজও একটি বৌদ্ধ তীর্থ।

আমি আরও একটি নূতন কথা পড়েছি এই গাইড বইএ। এতে আছে যে সপ্তম কিরান্ত রাজার রাজত্ব কালে গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে এসেছিলেন। তিনি বাস করেছিলেন স্বয়ম্ভুর পশ্চিমে পুচ্ছাগ্র চৈত্যে এবং স্বয়ম্ভু মঞ্জুশ্রী ও গুহেশ্বরীর অর্চনা করেছিলেন। কাঠমাণ্ডুতে তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ছিল সাড়ে তেরোশো।

আমি জানি যে গৌতম সংসার ত্যাগ করে ছয় বৎসর নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং গয়ার নিকটে তপস্যা করে বুদ্ধ হবার পরে পঁয়তাল্লিশ বৎসর নানা স্থানে ঘুরে তাঁর নূতন ধর্ম

প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গিয়েছিলেন এবং কোথায় যান নি সে সম্বন্ধে আমার সঠিক ধারণা নেই। তবে যে কটি স্থান বৌদ্ধ তীর্থ রূপে সমাদৃত, তার সব কটি নামই আমি জানি। তাঁর জন্মস্থান লুম্বিনীর পরেই সিদ্ধি লাভের স্থান বুদ্ধ গয়া এবং বেনারসের নিকটে সারনাথে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। কুশীনগরে তাঁর মহানির্বাণ হয়েছিল। রাজগৃহে তিনি বহুকাল বাস করেছিলেন এবং লিচ্ছবিদের আমন্ত্রণে বৈশালীতে গিয়েছিলেন। শ্রাবস্তী ও সঙ্কাশ্যও বৌদ্ধ তীর্থ। এ ছাড়া সাঁচী নালন্দা ও অজন্তা-ইলোরাও বৌদ্ধ নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বুদ্ধ এসে কাঠমাণ্ডুতে বাস করেছিলেন এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁর জীবদ্দশাতেই উপাসনার জন্য চৈত্য নির্মিত হয়েছিল এবং কাঠমাণ্ডুর পুচ্ছাগ্র চৈত্যে তিনি বাস করেছিলেন, এও আশ্চর্য হবার মতো কথা। স্বয়ম্ভুনাথ একটি বৌদ্ধ চৈত্য এবং কাঠমাণ্ডু শহর থেকে মাইল দুই দূরে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। গুহ্যেশ্বরী পার্বতীর মন্দির, হিন্দুর তীর্থ। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের কাল আমার সঠিক জানা নেই। তাই বুদ্ধ এসে কাঠমাণ্ডুতে এই সব মন্দির দেখেছেন ও অর্চনা করেছেন বলে মেনে নিতে কেমন যেন দ্বিধা হয়। তবে অনেক কিছুই জানি না বলে অবিশ্বাস করতেও সাহস হয় না।

লিচ্ছবি রাজাদের সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে এই বইএ। এই রাজাদের রাজত্বকালেই ছিল নেপালের স্বর্ণযুগ। অসাধারণ প্রতিভায় নাকি তাঁরা এই দেশটাকে গড়েছিলেন এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রায় এসেছিল সমৃদ্ধি। একটি ছোট দেশকে তাঁরা দিয়েছিলেন একটি বৃহৎ দেশের সম্মান। মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে তাঁদের শাসন পদ্ধতির প্রভেদ ছিল না। বিবাহ-সম্বন্ধেই স্থায়ী বন্ধুতা হয়, এই ধারণা নিয়ে তাঁরা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন প্রতিবেশী দেশ ভারত তিব্বত ও চীনের সঙ্গে। শিল্প ও স্থাপত্যের চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিল তাঁদের সময়ে। কৈলাসকূট ভবন ও মানগৃহে সেই শিল্প-

স্থাপত্যের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এই বংশের রাজাদের মধ্যে প্রধান হলেন মানদেব অংশুবর্মন ও নরেন্দ্র দেব। অসাধারণ বীরত্বে তাঁরা রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এই বিবরণে সন তারিখ নেই এবং নেপালের কোন্ অঞ্চলে তাদের রাজধানী ছিল তাঁরও উল্লেখ নেই। লিচ্ছবি রাজারা যে নেপালে রাজত্ব করেছেন, এ কথা আমি ইতিহাসে পেয়েছি। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে আছে যে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বৃহৎ জনপদ ছিল ষোলটি। তাদের মধ্যে একটি হল বৃজি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘ। এতেই ছিল ক্ষত্রিয় জাতির লিচ্ছবিরা এবং তাদের রাজধানী ছিল বৈশালীতে। শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্ম হয়েছিল বৈশালীর উপকণ্ঠে কুন্ডগ্রামে। তাঁব মামা চেতক নয়টি লিচ্ছবি ট্রাইব, নয়টি মল্ল ট্রাইব এবং কাশী ও কোশলের আঠারোটি গণরাজ্য নিয়ে গঠিত বৃজি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজিদের ধ্বংস করবার জন্য একটানা ষোল বছরেরও বেশি যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়েও তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। অজাতশত্রুব রাজত্বকাল আনুমানিক ৪৮৪ থেকে ৪৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের উদ্ভব হয়েছিল। তৃতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীকে। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুপ্ত সংবৎ প্রচলন করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্র গুপ্ত দিগ্বিজয় করেছিলেন। মনে হয় যে এঁরই রাজত্বকালে লিচ্ছবি রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই সময়েই নেপালে লিচ্ছবি রাজবংশের আবির্ভাব হয়। চীনের পরিব্রাজক হিউএন চাঙ নেপাল যাত্রা করেছিলেন ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী। নেপাল ভ্রমণের পর তিনি লিখেছেন যে নেপালে অংশুবর্মা নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন ও বিদ্বান ব্যক্তির সমাদর করতেন। শব্দ বিদ্যার উপরে তিনি

নিজেও একখানি গ্রন্থ বচনা করেছেন। তাঁর সুখ্যাতি নেপালে বহু বিস্তৃত।

পার্বতীয় বংশাবলীতেও আছে যে সূর্যবংশীয বাজা বিশ্বদেব বর্মা ঠাকুববংশীয অংশুবর্মাকে কন্যাদান কবেন। এই সময়েই বিক্রমাদিত্য নেপালে এসে তাঁব অব্দ প্রচলিত কবেন। অংশুবর্মাও বাজা হয়েছিলেন এবং কৈলাসকূটে তাঁব বাজধানী স্থাপন কবেন। ঐতিহাসিকেবা মনে কবেন যে অংশুবর্মা সবপ্রধান সামন্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে লিচ্ছবি বাজাদেব নিকটে বাজোচিত সম্মান লাভ কবেছিলেন। তাঁব অভ্যুদয়েব সময়ে ধ্রুবদেব লিচ্ছবি বাজধানী মানগৃহে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিউএন চাঙ্ অতি অল্প কালেব জন্যে নেপালে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, আমবা নানা পবত অতিক্রম কবে উপত্যকায় এসে নেপালে প্রবেশ কবলাম। এ দেশ তুষাবাচ্ছন্ন পর্বতমালায় বেষ্টিত। পর্বত ও উপত্যকা পবপব সংযুক্ত। অধিবাসীদেব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, এখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই উভয সম্প্রদায়ই এক সঙ্গে বসবাস কবে। সংঘাবাম ও দেবমন্দির ঘন সন্নিবিষ্ট। এখানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী দু হাজাব শ্রমণেব বাস। এখানকাব রাজা লিচ্ছবি বংশীয় ক্ষত্রিয়। তিনি অভিজ্ঞ নির্মল চরিত্র ও উন্নত প্রকৃতিব। বৌদ্ধ ধর্মে তাঁব গভীর বিশ্বাস।

অনেকে মনে কবেন যে হিউএন চাঙ যে বাজাকে দেখেছিলেন তিনি নরেন্দ্র দেব। নেপালেব বৌদ্ধ সমাজে তাঁব সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় জয়দেবেব শিলালিপি থেকেই জানা যায় যে নবেন্দ্র দেবেব আগে থেকেই লিচ্ছবি বাজারা বৌদ্ধ শাসনেব পক্ষপাতী হয়েছিলেন।

কখন থেকে আমবা পাহাডেব গা বেয়ে এঁকে বেঁকে উপরে উঠতে আবম্ভ কবেছি তা খেয়াল কবি নি। ভঁয়স পেরিয়ে এসেছি কিনা, তাও দেখতে পাই নি। প্রশস্ত বাঁধানো পথ ক্রমান্বয়ে উপরে উঠছে। এক ধারে সবুজ পাহাড় স্নিগ্ধ শীতল। এ পথ ওঠা-নামা করে অগ্রসর

হয়েছে, মাঝ পথেই পৌঁছবে সর্বোচ্চ স্থানে। তার উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট বলে শুনেছি। কিন্তু আমার মন এ দিকে ছিল না, আমি ডুবে গিয়েছিলুম অতীতের ইতিহাসের কথায়। হাবুলদাই আমাকে টেনে আনল বাস্তবের জগতে। পিছন ফিরে বলল : কি রে গোপাল, ঘুমিয়েই দিনটা কাটিয়ে দিবি? খেতে হবে না কিছু?

বিনয় জেগে ছিল, বলল : আমি তো ভেবেছিলাম, আজ আমাদের উপোস করেই থাকতে হবে।

নীরা বলল : পথেই মরে যাব তাহলে।

হাবুলদা বলল : শিবরাত্রির উপোস করিস না বুঝি?

পিছন থেকে পরমানন্দ্ বলে উঠল : সে তো সবাইকেই করতে হয়।

বিনয় বলল : আমি উপোস-টুপোসের ধার ধারি না।

সে কি রে, শিবরাত্রির ছুটি হয় না তোদের?

বোধহয় হয়।

নীরা বলল : বাবা মা উপোস করেন।

হাবুলদা বলল : তবে আয়, আজ আমরা চেষ্টা করে দেখি। কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছেই আমরা খাব।

নীরা বলল : ফুটপাথে বসে রাত জাগতে বলবে না তো! শিবরাত্রির উপোস করলে নাকি রাত জাগতে হয়।

তাহলে রাতে আহার নেই। একেবারে সকালে শিবের মাথায় ফুলবেলপাতা আর গঙ্গাজল চাড়িয়ে উপবাসের পারণ। তার আগে ব্রাহ্মণ ভোজন।

পরমানন্দ্ বলল : সেটাই তো নিয়ম আছে।

হাবুলদা বলল : সেটাই নিয়ম বললেই যথেষ্ট, আছে বলবার দরকার নেই।

পরমানন্দ্ বলল : তোমার সঙ্গে কিছু দিন থাকলে বাঙলা আমি ভালই শিখে যাব।

তাথেকেহ যা না আমার কাছে! তোর কাছেও আমি অনেক কিছু শিখতে পারব।

কথায় কথায় আমবা একটা লোকালয়ে পৌঁছে গেলাম। আমাদের বাস এসে দাঁড়াল কিছু ঘর বাড়ির সামনে। যাত্রীদের অনেকেই নেমে পড়লেন।

আমি বামলালের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিন এখানে। এর পর খুব দেরি হয়ে যাবে।

নীরাই সবার আগে লাফিয়ে নামল এবং একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ল। আমরা সবাই তাকে অনুসরণ করলুম। বাস কতক্ষণ অপেক্ষা করবে জানি না বলে ঝটপট যা পাওয়া গেল তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি কবলুম। পবে দেখলুম যে অনেকেই বেশ সময় নিয়ে পুবোদস্তুব খেলেন। বাসেব ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরও খেয়ে নিল। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই হাবুলদাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। বাসে বসে নীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: হাবুলদা কোথায়?

বিনয় বলল: তাই তো!

আমি কোন উত্তর না দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লুম। আমাকে নামতে দেখে গাড়ির একেবারে ধার থেকে হাবুলদা বলল: কি রে, নেমে পড়লি কেন? আমাকেই খুঁজতে নাকি?

বললুম: হ্যাঁ।

হাবুলদা বলল: ভয় নেই, হারিয়ে যাব না।

হাবুলদার পাশে দাঁড়িয়ে রামলাল সিগারেট খাচ্ছিলেন, তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহাস্যে বললেন: ইনি আপনাদের গার্ডিয়ান তো, তাই নানা রকম খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

ও, তুমি এই কাজ করছ! বলে দিচ্ছি সবাইকে।

বলে বাসে উঠতে যাবার সময়েই ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে যাত্রীদের ডাকল। হাবুলদা বলল: কথাটা ঠিকই।

কোন্ কথা?

যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর। তুই বই লিখে নাম করবি, আর আমি তোর জন্যে খেটে মরছি।

বলে আমার পিছনে উঠে পড়লেন। রামলাল উঠলেন তাঁর সিগারেটে শেষ টান দেবার পরে। কিন্তু হাবুলদা তাঁকে তাঁর পুরনো জায়গায় বসতে দিল না। বিনয়কে বলল: তুই তো বাসে উঠে অবধি ঘুমোচ্ছিস, তুই এবাবে রামলালবাবুর জায়গায় বসে টেনে একটা ঘুম দে। আর আপনি

বলে হাবুলদা রামলালকে বললেন: আপনি বসুন বিনয়ের জায়গায় ঐ জানালার ধারে। তাতে আমিও পেছন ফিরে আপনাকে দেখতে পাব।

বিনয় কোন প্রতিবাদ না করে চলে গেল রামলালের জায়গায়, আর রামলাল এসে আমাব পাশে বসলেন। হাবুলদা বলল: দেখলি তো, তোর কী উপকার করলাম!

বললুম: তুমি না দেখলে আমাকে দেখবে কে বল!

হাবুলদা বলল: ঠিক বলেছিস।

রামলাল বললেন: এত কষ্ট করে আপনারা কাঠমাণ্ডু যাচ্ছেন, কিন্তু দুদিনে আর নেপালের কতটুকু দেখবেন! ভাল করে কাঠমাণ্ডুই তো দেখতে পারবেন না।

কেন?

শহর বড় না হলেও দেখবার জায়গা তো অনেক। তারপর শহরের বাইরেও যেতে হবে। পাটন ভাদগাঁও এ সব না দেখেও ফিরতে পারবেন না! বুড়ানীলকণ্ঠ সুন্দরীজল এ সবই বা বাদ দেবেন কী করে! আর হিমালয়! সাগরমাতাকে দেখতে হলে নগরকোটে গিয়ে এক রাত থাকতে হবে, নয় ফেরার পথে দামনে রাত কাটিয়ে ভোর বেলায় হিমালয় দেখে ফিরতে হবে।

হাবুলদা বলল: তাহলে তো আরও একটা দিন কমল।

রামলাল খুশী হয়ে বললেন : এই জন্যই তো বলছিলাম, আরও দুদিন থেকে যান।

হাবুলদা বলল : তা সম্ভব হলে কি আর থাকতাম না! এরা সব বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছে, সবাইকে বাড়ি ফিরতে 'হবে, কাজকর্ম আছে তাদের। ট্রেনেব টিকিট কাটাও আছে।

রামলাল বললেন : তবে এক কাজ করুন। কাঠমাণ্ডু পৌঁছেই একটা ট্যাক্সির সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিন। সাবা দিন আপনাদের ঘুরিয়ে সব কিছু দেখিয়ে দেবে।

কিন্তু কী দেখবাব আছে তা না জানলে যে ফাঁকি দেবে আমাদের!

তা দেবে। তবে দেখবেনও অনেক কিছু।

আমি বললুম : যা দেখা যাবে না, তাই আমাদের বলুন।

হাবুলদা বলে উঠল : ঠিক বলেছিস। কী জিজ্ঞেস করা যায় বল্ তো!

বললুম : নেপালীদের সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

কথাটা বোধহয় হাবুলদার পছন্দ হল না, কিন্তু কিছু বলবার আগেই রামলাল বললেন : আপনার প্রশ্নটা খুব ছোট, কিন্তু উত্তরটা তত ছোট নয়, সহজও নয়। নেপালীদের কথা মানে তো শুধু নেপালের অধিবাসীর কথা নয়, তাদের আচার ব্যবহার ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি সবই বোঝায়। আমি কারবারী মানুষ, আমার তো এ বিষয় সামান্যই জানা।

বললুম : আপনার যে সামান্য জানা, তাই আমাদের কাছে যথেষ্ট। আপনি কোন দ্বিধা না করে বলুন তো!

রামলাল বললেন : আমাদের দেশটা আপনাদের দেশের মতো নয়। আমরা যে তরাই অঞ্চলটা পার হয়ে এলাম, সেটাকে আপনা-দের দেশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে আপনারা সব জাতের লোক পাবেন—ব্রাহ্মণ ছত্রি ঠাকুর রাজপুত কুর্মি কোইরি ধনুক মুশার ধীবর রাজবংশী থারু ভিল্লা মুসলমান সব জাতই পাবেন।

এরা নেপালী ভাষায় কথা বলে না, বলে আপনাদের দেশেরই নানা ভাষা। যেমন মৈথিলী ভোজপুরী মগধী বা অবধী প্রভৃতি ভাষা। তরাইএর জঙ্গলে যারা বাস করে, তাদের আদিবাসী ভাষা মৈথিলী বা ভোজপুরীর মতোই। এদের এমন সব নাম যে বললেও আপনারা মনে রাখতে পারবেন না।

হাবুলদা আমাকে বলল: লিখে রাখবি? তোর পকেটে তো আবার কাগজ পেনসিল নেই।

বললুম: না হাবুলদা, কিছু টুকে রাখার অভ্যেস আমার নেই।

বলে রামলালকে বললুম: আপনি তারপর বলুন।

রামলাল বললেন: নেপালের এই পাহাড়ী উপত্যকা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা তো আছেনই, আছেন ঠাকুরী নেবার মগর গুরুং তামাং রাই লিম্বু প্রভৃতি জাত। এদের ভাষা হল নেপালী নেবারী প্রভৃতি ভাষা।

আমি বললুম: শেরপা?

রামলাল হেসে বললেন: শেরপারা হিমালয়ের খাস তালুকের প্রজা। তাদের সঙ্গে ভোটিয়া প্রভৃতি জাতও আছে, আছে মগর তামাং গুরুং ঠাকালিরাও। তাদের নিজেদের ভাষাও আছে।

এত সংক্ষেপে বললেন!

রামলাল বললেন: সবার সব কথা তো জানি না।

যাদের জানেন, তাদের কথাই বলুন।

শেরপা শব্দটির মানে হল পূর্বাঞ্চলের মানুষ। নেপালের পূর্বাঞ্চলে বাস করে বলেই বোধহয় এই নাম হয়েছে। সেখান থেকেই তারা দার্জিলিঙ ও সিকিমে গেছে। তাদের ঘন বসতি হল সোলোখুম্বু থেকে হেলমু ও অরুণ নদীর উপত্যকা, আর জীবিকা হল চাষ বাস। খুব সরল মানুষ তারা, কিন্তু খুব কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। হাসিখুশি প্রকৃতির, অতিথি-বৎসল ও পরোপকারী। অপরিসীম সাহসের জন্যে তারা বিখ্যাত এবং এই জন্যেই বোধহয় তারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের

পর্বতারোহীর কাছে এমন প্রিয় ও অপরিহার্য। তাদের নিজেদের ভাষা আছে, সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মও তাদের নিজস্ব। কিন্তু—

বললুম ঃ বলুন।

ইতিহাসে তারা এ দেশের আদিম অধিবাসী বলে পরিচিত নয়।

আপনি বোধহয় কিরাত জাতির কথা বলবেন !

আমরা কিরান্তা বলি। লোকে বলে ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে তারা এখানে এসেছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও নাকি তারা ঘন বসতি স্থাপন করে আছে। অনেকের ধারণা যে আসামের কাছারীরাও এদেরই একটা শাখা।

বললুম ঃ আপনি নেপালের কিরান্তাদের কথাই বলুন।

রামলাল বললেন ঃ মহাভারতের কালে নেপালে আমরা কিরান্তাদের নাম পাই। এরা সবাই শৈব বলে অনেকের ধারণা যে এদের আদি নিবাস ছিল কৈলাসে। এদের দুটি প্রধান শাখার নাম রাই আর লিম্বু, গোত্র অনেক। যুদ্ধপ্রিয় বলে এদের খ্যাতি আছে এবং বিগত ও এই শতাব্দীতে যুদ্ধ করে এরা নাম করেছে। এদের একটি ধর্মীয় কাব্য আছে, তাতেই আছে এদের সামাজিক ও ধর্ম জীবনের সমস্ত বিধি নির্দেশ।

তারপর ?

কিরান্তাদের পরেই নেবারীদের কথা বলতে হয়। অনেকের মতে এরাই নেপালের আদিবাসী। তাই কেউ বলেন যে নেবার থেকেই নেপাল নাম, কারও মতে নেপালের অধিবাসী বলেই নেবার নাম।

অর্থাৎ পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র।

আমার কথাটা বুঝতে না পেরে রামলাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাই দেখে আমি বললুম ঃ পণ্ডিতরা এই রকমই বলেন, তার জন্যে কোন ভাবনার দরকার নেই। আপনি বলে যান।

রামলাল আশ্বস্ত হয়ে বললেন ঃ এদের আদি নিবাস কোথায় ছিল

তা জানা যায় না, তবে কোন প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কোন রক্তের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় তারাই প্রধান অধিবাসী। নেবারীদের মধ্যে যারা হিন্দু শৈব, তাদের মধ্যে চারটি জাতই আছে। দেওবাজুরা ব্রাহ্মণ, মল্ল প্রধান শ্রেষ্ঠ বন্দেল রাজবংশী অমাত্য ও মস্কেরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হল থার পঞ্চ ও লাকোলরা এবং চাষাদের মধ্যে জয়াপু ও পোরে ছায়ামে এরা শূদ্র। বৌদ্ধ নেবারীদেরও তিনটি শাখা। বরলরাই সবচেয়ে সম্মানিত, তারা থাকে গোম্পায়। বরল বজ্রাচারি ও ভিক্ষুরা উঁচু জাতের, তারপর উদাসরা। জয়াপুরা সব থেকে নিচু, তারা মিস্ত্রি মজুরের কাজ করে। নেবারীরা শিক্ষা দীক্ষায় খুব উন্নত, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় এবং শিল্প সংস্কৃতিতেও তারা খুব অগ্রগামী।

রামলাল নীরব হতেই আমি বললুম: আর কিছু বলবেন না?

রামলাল বললেন: ভাবছি।

তারপরেই বললেন: তরাই অঞ্চলের ও মহাভারত পর্বত অঞ্চলের মগররাও নাকি পুরাকালে খুব শক্তিশালী ছিল। এই সব অঞ্চলে ছিল তাদেরই আধিপত্য। বর্তমানে এরা সেনা বিভাগে খুব নাম করেছে। গুরুংদের নাম শুনেছেন তো? এরা থাকে একেবারে উত্তরে গণ্ডকী এলাকায়। একটা মস্ত বড় গ্রামে তারা একসঙ্গে বাস করতেই ভালবাসে। তাদের ঘর বাড়ি একটা উঠোনের চারিদিক ঘিরে। রোদি ঘর হল তাদের ক্লাব। সেখানেই তাদের আনন্দ-উৎসব। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে নাচে গায়।

হাবুলদা মুখ ঘুরিয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলুম যে এই আলোচনা তার ভাল লাগছে না। তাই আমি গোর্খাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চাইলুম না। কিন্তু রামলাল একটু দম নিয়ে বললেন: কিরান্তাদের মতো তামাংরাও নিজেদের শিবের বংশধর বলে দাবী করে। তারা থাকে গণেশ হিমালয়ের দক্ষিণে। তাদের মধ্যে লামাও আছে দু জাতের --পদ্‌নে ও নেপদ্‌নে।

রামলাল হঠাৎ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কোন জাতের মানুষকে বাঁদর খেতে দেখেছেন ?

হাবুলদা বোধহয় অন্যমনস্ক ছিল, তাই পিছন ফিরে বলল : বাঁদর !

আমি বললুম : দেখি নি তো !

রামলাল বললেন : কর্ণালি এলাকায় রৌতিয় নামে এক জাতের লোক আছে, তারা বাঁদর খায় বলে শুনেছি।

হাবুলদা বলল : বলেন কি !

আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ! পূর্বাঞ্চলে কুকুর যদি প্রিয় খাদ্য হতে পারে তো বাঁদর খেতে দোষ কী ! আর মানুষ কী খায় না ? আফ্রিকার জঙ্গলে তো মানুষখেকো মানুষও আছে শুনেছি।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছেন।

১৪

দুপুরের আহারের পর আমার একটা ঝিমুনি এসেছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু নীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, হাবুলদাও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর জেগে উঠেই পিছনের দিকে ফিরে বলল: এখন তো আমরা বেশ চলেছি, কিন্তু বিপদ হবে বাস থেকে নামলেই।

রামলাল বললেন: বিপদ কিসের?

হাবুলদা বলল: ফুটপাথে তো রাত কাটানো যাবে না, একটা আশ্রয় চাই।

তার জন্য ভাবনা কী! কাঠমাণ্ডুতে কি হোটেলের কোন অভাব আছে!

অভাব নেই বলেই তো ভাবনা। আমরা তো ফরেন টুরিস্ট্ নই যে পকেটভর্তি টাকা! তিনটে রাত থাকতে দেবে, এই রকমের একটি আশ্রয়ের দরকার।

রামলাল হেসে বললেন: নেপাল কোন বড়লোকের দেশ নয় মশাই, অত ভয় পাবেন না।

আমি বললুম: ইন্টারন্যাশনাল টুরিস্ট্ ইয়ারের খবর আমার জানা আছে। তাতে দেখেছি যে সবচেয়ে কম দামের হোটেলের চার্জ দিনে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপর শতকরা দশ টাকা সার্ভিস চার্জ। এ রকম এক স্টারের হোটেল একটাই আছে। দু স্টারের হোটেল আছে চারটে, চার্জ পঁয়ষট্টি টাকা; তিন স্টারে আশি টাকা; অন্নপূর্ণা চার স্টারের হোটেল, তার চার্জ পঁচানব্বই টাকা। আর পাঁচ স্টারের হোটেল সোয়ালটির চার্জ একশো পঁচিশ। এই যদি নেপালের ট্যারিফ

হয় তো আমাদের পাঁচ জনের জন্যে দৈনিক কত খরচ হবে ভাবুন। হাবুলদার ভাবনা হওয়া কিছু অন্যায় নয়!

ঠিক বলেছিস।

তারপরেই চমকে উঠে বলল: তুই ঠিক বলছিস তো?

বললুম: বেঠিক বলব কেন! তবে আমার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই হাবুলদা, আমি বাস স্ট্যাণ্ডেই রাত কাটিয়ে দেব। আর তা না হলে কোন মন্দিরের ভেতর।

হাবুলদা করুণ ভাবে বলল: কিন্তু আর সবার কী হবে? নীরা তো বাড়ি থেকে কড়ার করে নিয়েছে যে ওকে একটা লাগোয়া বাথরুম-ওয়ালা ঘর দিতে হবে। সগৌলিতে ওর মেজাজ দেখেছিস তো!

বললুম: না।

তবে তোর আড়ালে আমাকে বলেছিল।

রামলাল বললেন: ও সব বইএর কথা আপনারা ভুলে যান। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে কোন হোটেলে গিয়ে উঠবেন, অত খরচ আপনাদের লাগবে না। আর ·ার ফারের কথা মুখে আনবেন না। ও সব আমাদের জন্য নয়। যাঁরা প্লেনে আসবেন আগে থেকে হোটেলে জায়গা বুক করে, ও সব তাঁদের জন্যে। আপনারা হোটেলে যাবেন, ঘর পছন্দ হলে দর করবেন, দরকার হলে দরাদারি, না পোষালে অন্য হোটেলে চলে যাবেন। আপনারা যখন পয়সা দেবেন, তখন খাতির কিসের!

হাবুলদা বলল: ঠিক বলেছেন।

আমি বললুম: আপনি ঠিক কারবারী লোকের কথা বললেন। এই বারে নেপালের সম্বন্ধে আর কিছু নতুন কথা বলুন তো!

হাবুলদা আমাকে একটা ধমক দিয়ে বলল: তুই একটু থাম তো। দু একটা কাজের কথা আমি জেনে নিই।

বুঝতে পারলুম যে হাবুলদা এতক্ষণ বেশ এক চোট ঘুমিয়ে নিয়েছে। তাই নেপালের মানুষ নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনার সময়ে তার

কাজের কথা একবারও মনে পড়ে নি। ঘুম ভাঙবার পরেই এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

রামলাল বললেন : বলুন আপনার কাজের কথা।

হাবুলদা বলল : খাবার হোটেলেই পাওয়া যাবে, না বাইরে যেতে হবে?

সে আপনাদের খুশি। হোটেল আপনাদের কাছে ঘরের ভাড়া নেবে, খেতে চাইলে খেতেও দেবে। তার আলাদা চার্জ দেবেন। খাবার পছন্দ না হলে বা দাম বেশি মনে হলে বাইরে খাবেন।

ঠিক বলেছেন।

আপনারা কি নিরামিষাশী?

হাবুলদা বলল : দু রকমই খাই।

তবে আপনাদের নিরামিষ খাওয়াই ভাল।

কেন বলুন তো!

আপনারা মাছ ভালবাসেন জানি। কিন্তু মাছ তো সব হোটেলে পাবেন না। মাংস পাবেন। কিন্তু সব মাংস কি আপনারা খান? কাঠমাণ্ডুতে মোষের মাংস খুব চলে।

হাবুলদা যেন আঁৎকে উঠল। বলল : না না, আমরা নিরামিষই খাব। দু তিন দিন মাছ মাংস না খেলে আমাদের কোন কষ্ট হবে না।

পিছন থেকে পরমানন্দ বলল : বিয়ের সময় তো অনেক মাছ মাংস খাওয়া হয়েছে হাবুলদাদা, কিছু দিন না হয় নাই খেলেন।

রামলাল বললেন : নেপালের নিরামিষ খাওয়া আপনাদের ভালই লাগবে। ভাত ডাল, মাশ মুগি দু রকমই ভাল পাবেন, তার সঙ্গে আলু কো আচার আর সিকারনি।

হাবুলদা বলল : সিকারনি কী?

দইএর জিনিস।

চমৎকার খাবার। আর একটা কথা জেনে নিই। ট্যাক্সিতে মিটার আছে, না ভাড়া নিয়ে দরাদরি করতে হবে?

আমি কোন প্রশ্ন করবার অবকাশ পেলুম না। মুগি নিশ্চয়ই মুগের ডাল, কিন্তু মাশ বলতে কলাই না মসুর ডাল বোঝায় তা জানবার ইচ্ছা ছিল। এর সঙ্গে আলুর আচার। আচার মানে যদি আচারই হয় তো কোন তরকারি থাকবে না? কিন্তু হাবুলদা এ সব না ভেবেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

রামলাল বললেন : মিটার নেই অনেক ট্যাক্সিতেই। সে সব ট্যাক্সিতে উঠবার আগেই দরাদরি করে ভাড়া ঠিক করে নেবেন। সবচেয়ে ভাল হয় হোটেলের ম্যানেজারকে বলে গাড়ি ঠিক করলে। দু পয়সা বেশি দিতে হলেও ঠকবার ভয় নেই।

হাবুলদা আবার বলল : ঠিক বলেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার আর কিছু জানবার আছে হাবুলদা?

হাবুলদা বলল : আচ্ছা, তুই এবারে জিজ্ঞেস কর্।

অনুমতি পেয়ে রামলালকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আমরা কত দূর এসেছি?

রামলাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন : বিপদে ফেললেন তো!

কেন?

বেলা পড়ে এসেছে মনে হচ্ছে!

আমরা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলেছিলুম। ওঠা-নামা করেছি অনেক। মেঘ ও কুয়াশার ভেতর দিয়েও বেরিয়ে এসেছি। এক সময়ে আমার একটু অশান্তি বোধও হয়েছিল। তখন গোঁ গোঁ শব্দ করে বাস ক্রমাগত উপরে উঠছিল, তারপর নিচে নেমেছে। গল্পের মধ্যে আমরা ডুবে গিয়েছিলুম বলে পথের দিকে লক্ষ্য রাখি নি।

হাবুলদা বলল : সত্যিই তো, সূর্য পাহাড়ে আড়াল হয়ে আছে না সূর্য ডোবার সময় হয়েছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না।

আমি বললুম : এই পথে কোন বড় জায়গা নেই?

রামলাল বললেন : আছে বৈকি। ভঁয়সে থেকে তো ত্রিভুবন রাজপথ আরম্ভ হয়েছে, সিম্‌ভঞ্জিয়ানের উচ্চতাই এ পথে সবচেয়ে বেশি। তার পরে দামন আট হাজার ফুট উঁচুতে। আমরা এখন কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় চলেছি পালৌঙ তিস্তুং ও থানকোট হয়ে।

বললুম : দামন নামটা আমার শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই আপনাদের শোনা নাম। বহু যাত্রী যাতায়াতের পথে দামনের টুরিস্ট্ বাঙলোয় রাত কাটায় সাগরমাতাকে দেখবার জন্য।

সাগরমাতা!

হ্যাঁ, মাউণ্ট এভারেস্ট্‌কেই আমরা সাগরমাতা বলি। পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ নেপালেরই সীমান্তে, এক ধারে নেপাল আর অন্য ধারে তিব্বত। শুধু সাগরমাতা নয়, ধৌলাগিরি থেকে আরম্ভ করে কারিয়োলুঙ পর্যন্ত হিমালয়ের প্রায় সমস্ত শৃঙ্গগুলিই দেখা যায়। অপূর্ব এই দৃশ্য, দেখলে জীবন সার্থক হয়েছে বলেই মনে হবে। এই সব দেখবার জন্য নেপালের সরকার কংক্রিটের একটা ভিউ টাওআর তৈরি করে দিয়েছিল ১৯৬৩ সালে। ত্রিভুবন রাজপথ থেকে বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে এই টাওআরের নিচে পৌঁছতে হয়, তারপর আটত্রিশ ফুট উঠতে হয় টাওআরের মাথায়। সেখানে অবজারভেশন প্ল্যাটফর্ম আছে, আর তার ওপরে খোলা জায়গা থেকে পালং উপত্যকাও দেখা যায়।

হাবুলদা বলল : সব সময়ে দেখা যায়?

রামলাল বললেন : তাহলে তো কথাই ছিল না। সকালের দিকেই ভাল দেখা যায়, তাও কপাল ভাল হলে। মেঘের সঙ্গে বরফের খেলা তো জানেন! তবে এক কাজ করতে পারেন আপনারা। ফেরার সময় কাঠমাণ্ডু থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন, সামনে দাঁড়িয়ে ভিউ টাওআর থেকে হিমালয় দেখে চলে যেতে পারেন বীরগঞ্জে।

আর তা সম্ভব না হলে?

নগরকোট কিংবা কাকানিতে গিয়েও দেখে আসতে পারেন।

আমি বললুম : আপনি দামনের কথা আগে শেষ করুন।

রামলাল বললেন : ত্রিভুবন রাজপথে দামন কিন্তু সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়, সিম্‌ভঞ্জিয়ান দামনের চেয়েও দুশো ফুট বেশি উঁচু। বরফের পাহাড় দেখার সিজন এখনও যায় নি, কিন্তু হেমন্ত কালে এলে রডোডেনড্রন ফুলের বাহারও দেখতে পেতেন। রঙে রঙে পাগল হয়ে যেতেন আপনারা। বলতে কি, অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত হল এ দেশের সিজন।

আমি বললুম : দামন থেকে কোন্ কোন্ পাহাড় দেখা যাবে ?

রামলাল বললেন : উত্তরে মুখ করে দাঁড়াবেন তো ! তাহলে পশ্চিমে মানে আপনার বাঁ হাতে প্রথম ধৌলাগিরি, তারপর অন্নপূর্ণা তিন আর দুইএর মাঝখানে মচ্ছপুচ্ছারে।

হাবুলদা বলল : অন্নপূর্ণা তিন আর দুই মানে কি ?

রামলাল বললেন : অন্নপূর্ণার তিনটে শৃঙ্গ দেখা যায়। দামন থেকে তিন আর দুএর মাঝখানে মচ্ছপুচ্ছারে, কিন্তু নগরকোট থেকে ধৌলাগিরির পাশেই মচ্ছপুচ্ছারে, তার পাশে অন্নপূর্ণা এক আর দুইএর নিচে তিন। দু জায়গা থেকেই তারপরে দেখবেন হিমলচুলি, মানসলু, গণেশহিমল, ল্যাংট্যাং। নগরকোট থেকে এর পর গোঁসাইথান দেখতে পাবেন, কিন্তু দামন থেকে তা দেখা যাবে না।

তারপর ?

তারপর দোর্জেলাক, ফুর্বি ও চিয়াচু দেখবেন দামন থেকে, কিন্তু নগরকোট থেকে এই তিনটি শৃঙ্গ দেখতে পাবেন না। এর পর চোবা ভামরে, গৌরীশঙ্কর ও চো য়ু দেখতে পাবেন দু জায়গা থেকেই।

তারপর ?

দামন থেকে সাগরমাতার বাঁ পাশে দেখবেন নুপ্‌ৎসে আর ডান পাশে লোৎসে, তারপর মাকালু নুম্বুর ও কারিয়োলুঙ। কিন্তু নগরকোট থেকে নুপ্‌ৎসে দেখতে পাবেন না, দেখবেন মাকালু

আর মুস্ত্রের মাঝখানে আপনাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা। কারিয়োলুঙও দেখতে পাবেন না।

হাবুলদা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এইবারে সবিস্ময়ে বলল : আপনি এই সমস্ত পাহাড় চেনেন ?

রামলাল সগৌরবে বললেন : দেখে দেখেই চিনেছি।

কিন্তু আমরা কি চিনতে পারব ?

রামলাল বললেন : ম্যাপ দেখে ঠিক চিনে নেবেন। তবে পাহাড়ের ওপর মেঘ জমে থাকলেই গোলমাল হয়ে যাবে।

বললুম : এবারে তাহলে নগবকোটের কথা বলুন।

রামলাল বললেন : নগরকোট কাঠমাণ্ডুর খুব কাছে। আপনারা তো ন মাইল দূরে ভক্তপুর মানে ভাদগাঁও দেখতে যাবেনই, সেখান থেকে আর নয় মাইল দূরে নগরকোট। তার মানে কাঠমাণ্ডু থেকে আঠারো মাইল। আর উচ্চতাও দামনের চেয়ে কম, সাত হাজার ফুটের সামান্য বেশি, বোধহয় সাত হাজার একশো তেত্রিশ ফুট। ট্যাক্সিতেই আপনাবা টুবিস্ট বাঙলোব দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন।

হাবুলদা বলল : তারপব ?

রামলাল আমার দিকে চেয়ে বললেন : তারপর কি কাকানির কথা বলব ?

আমি বললুম : সে আবার কোন্ জায়গা ?

রামলাল বললেন : কাকানি থেকেও আপনারা হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাবেন।

তবে বলুন না কাকানির কথা।

কাকানিও কাঠমাণ্ডু থেকে দূরে নয়, এও আঠারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে। উচ্চতা কিছু কম, সাড়ে ছ হাজার ফুটের মতো। এক দিকে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা, অন্য দিকে ত্রিশূলি নদীর উপত্যকা। ত্রিশূলি রোড ধরে আপনারা বালাজু ওয়াটার গার্ডেন দেখতে নিশ্চয়ই যাবেন,

সেই রাস্তাই কাকানি পাহাড়ের নিচে পৌঁছবে। পাহাড়ের মাথায় টুরিস্ট্ বাঙলো। ট্যাক্সিতে গেলে সেখানেই পৌঁছে যাবেন।

কী দেখব সেখানে?

প্রায় একই দৃশ্য। তবে গণেশহিমলের চারটে শৃঙ্গ দেখবেন ঠিক চোখের সামনে।

তারপর টুরিস্ট্ বাঙলোয় থাকবার ব্যবস্থার কথা বললেন: কাঠমাণ্ডুতেই আপনারা টুরিস্ট্ বাঙলোয় থাকার ব্যবস্থা করে যেতে পারবেন। বসন্তপুরে টুরিস্ট্ ইনফর্মেশন সেণ্টার আছে, সেখানেই বুকিং হয়।

আমি বললুম: বসন্তপুর আবার কোথায়?

রামলাল হেসে বললেন: কাঠমাণ্ডু শহরেই। রিক্সায় চেপে বলবেন, বসন্তপুর চল—ইনফরর্মেশন সেণ্টার। দশ মিনিটে আপনাকে পৌঁছে দেবে।

বুঝেছি।

সেখানে বলবেন, কোথায় কখানা ঘর চাই। কাকানিতে আছে চারখানা ঘরে আটখানা বেড, মাথাপিছু ভাড়া তিন টাকা। রান্না ও খাবার বাসন পাওয়া যাবে, কিন্তু নিজেদের রেঁধে খেতে হবে। বিকেল চারটের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে যে আগে যাবে সে-ই ঘর পাবে। নগরকোটেও এই ব্যবস্থা। কিন্তু দামনে একটি মাত্র ঘর। তাতে দুজনে থাকতে পারে।

লোক বেশি হলে?

সমূহ বিপদ। সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সকালের দিকেই যাত্রা করুন, ভাগ্য ভাল হলে সাগরমাতার দর্শন পেয়ে যাবেন। পয়সা কিছু বেশি লাগবে, কিন্তু পাঁচজন আছেন তো, পুষিয়ে যাবে। আর এইভাবে পা মুড়ে চলার অভ্যাসও তো আপনাদের নেই!

বিনয়ের বোধহয় খুবই কষ্ট হচ্ছিল। বলল: বাস যে এই রকমের হয়, এ নেপালে এসেই দেখলাম।

কিন্তু দেখলি তো, এ বাস কোথাও আটকালো না!

বলে হাবুলদা রামলালের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: বলবেন না, আরও অনেকটা পথ আছে। কিছু বেগড়ালেই বিপদ।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে। পথে আমরা দু-তিনবার দাঁড়িয়েছিলুম। এক জায়গায় চা-ও খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু এ সব জায়গার নাম জেনে নেবার সুযোগ পাই নি। রামলাল বাস থেকে নেমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন সিগারেট খাবার জন্যে।

আমরা যখন বিষ্ণুমতী নদীর কাছাকাছি এলুম, তখন অন্ধকার নেমে গেছে। রামলাল খুশী হয়ে বলে উঠলেন: আমরা তাহলে কাঠমাণ্ডু এসেই গেলাম।

হাবুলদা বলল: আর ভয় নেই তো?

ভয় আছে। আর থাকবেও। আপনাদের সঙ্গে তো বোঝা বেশি নেই! আপনারা হেঁটেই পৌঁছে যেতে পারবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে মাল আছে অনেক, আমাকে বসে থাকতেই হবে।

দেখতে দেখতেই আমরা বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরিয়ে গেলুম। রামলাল বললেন: এখান থেকে অল্প দক্ষিণে বিষ্ণুমতী বাগমতীর সঙ্গে মিলেছে। বাগমতী পশুপতিনাথ মন্দিরের পিছন দিয়ে হিরণ্যবর্ণ মহাবিহারের পাশ দিয়ে পাটন হয়ে এখানে এসেছে, তারপর বিষ্ণুমতীর সঙ্গে মিলে দক্ষিণে ছোবার হয়ে ফার্পিঙ দক্ষিণকালীর ধার দিয়ে নেমে গেছে ভারতে।

আমি বললুম: একখানা ম্যাপ পেলে বোঝবার খুব সুবিধে হত।

টুরিস্ট্ অফিসে গিয়ে চেয়ে নেবেন। হোটেলের ম্যানেজারের কাছেও পেতে পারেন। অনেকে এনে রাখে বলে শুনেছি। ম্যাপ না পেলেও কোন লিটারেচার পেয়ে যাবেন।

এর পরেই আমরা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলুম। তারপর এসে দাঁড়ালুম কাঠমাণ্ডুর বাস স্ট্যাণ্ডে।

হাবুলদা উঠে দাঁড়িয়ে আদেশ করল : নেমে দাঁড়িয়ে থাক সবাই। আমি ফেবার টিকিট কেটে হোটেলের খোঁজ নেব।

নীরার কোমর ধরে গিয়েছিল, বলল : নামতেই যে পারছি না হাবুলদা, দাঁড়িয়ে থাকব কী করে?

হাবুলদা বলল : বিনয় তুই সামলা নীরাকে।

পরামানন্দ এগিয়ে এসে বলল : আমি নামিয়ে দেব?

নীরা বলল : তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও।

আমি নামলুম হাবুলদার সঙ্গে। বললুম : বাসেই ব্যবস্থা করবে? বকুনি খেতে হবে না তো?

রেখে দে ওদের বকুনি!

বলে হাবুলদা অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৫

হাবুলদা সব ব্যবস্থা করে এসে বলল : চল এবারে।

একজন ট্যাক্সির ড্রাইভার বলল : আসুন আমার সঙ্গে।

বলে কিছু জিনিস পত্র হাতে নিয়ে এগোল। বাকি জিনিস নিয়ে আমরা তার অনুসরণ করে ট্যাক্সিতে উঠলুম।

ড্রাইভার অনেক কসরৎ করে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল। হাবুলদা বলে উঠল : কী হল ?—

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বলল : এই আপনাদের হোটেল।

হাবুলদা রেগে গেল। বলল : এর জন্যে তুমি আমাদের ট্যাক্সিতে তুললে! এইটুকু পথ তো আমরা হেঁটেই আসতে পারতাম।

ড্রাইভার সবিনয়ে বলল : আমরা থাকতে আপনারা হাঁটবেন কেন ?

পয়সা কি আমাদের খোলামকুচি !

বলে হাবুলদা গটমট করে হোটেলের ভিতরে ঢুকে গেল। আমি তার সঙ্গে গেলুম। ম্যানেজার ভদ্রলোক প্রসন্ন চেহারার মানুষ। মাঝবয়সী এবং বিনয়ী। তাই দেখে হাবুলদাকে কিছু বলতে না দিয়ে আমি বললুম : আমরা পাঁচজন এসেছি; একজন মহিলার জন্যে আলাদা ঘর চাই উইথ অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম। আমাদের জন্যে দুখানা ডবল বেড ঘর হলেই ভাল। পাওয়া যাবে ?

ম্যানেজার বললেন : ঘর ওপরতলায়, পছন্দ হয় কিনা দেখে আসুন।

বলে একজন বেয়ারা সঙ্গে দিলেন।

হাবুলদা তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতেই আমি চুপিচুপি বললুম : বাস স্ট্যাণ্ড থেকে আমরা একটা ট্যাক্সিতে এসেছি দূরত্ব জানতাম না বলে। ঘর পছন্দ হলে আপনি ওর ভাড়া দিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক আমার ইঙ্গিতটা বুঝে হেসে বললেন : আচ্ছা।

আমি উপরে গেলুম না। ম্যানেজারের সঙ্গেই গল্প জুড়ে দিলুম। বললুম : আমাদের হাতে সময় খুব কম। তিনটি রাত থাকতে পারব, মানে শনিবার সকালের বাসেই আমাদের ফিরতে হবে।

ম্যানেজার বললেন : আপনারা তো নেপাল দেখতে এসেছেন, দুটো দিনে আর কতটুকু দেখবেন!

বললুম : দেখতে তো পয়সাও লাগে, পয়সা আমাদের কোথায়! শখ আছে বলেই চলে এসেছি। কাছেই একটা বিয়ের ব্যাপারে এসেছিলুম, একটু ঘুরে যাচ্ছি আর কি! সঙ্গে আমাদের বোন না থাকলে আমরা কোন ধর্মশালায় উঠতুম। আমরা তাই করি।

ভদ্রলোক তাঁর ড্রয়ার হাঁতড়ে একখানা টুরিস্ট লিটারেচার বার করে বললেন : আজ এর ওপরে একটু চোখ বুলিয়ে রাখবেন। কাল সকালে আমি আপনাদের দেখবার ব্যবস্থা করব।

বিনয়ের সঙ্গে নীরা দাঁড়িয়ে ছিল খানিকটা তফাতে। ট্যাক্সির ড্রাইভারও বাকি মালপত্র রেখে অপেক্ষা করছিল। সে ধরে নিয়েছিল যে এই হোটেল আমাদের পছন্দ হবে। হোটেলের নিচের তলায় খাবার ঘর আছে, আর পাশে একটা দোকান। সেখানে কিছু কেনা বেচা হচ্ছে। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। শীতের আমেজ আছে একটু। মন্দ লাগছে না। হাবুলদা নেমে আসছে দেখে আমি বললুম : ঘরের ভাড়া রিজনেব্‌ল হলে আমরা এখানেই থাকব, আর খাবার ব্যবস্থা যখন আছে—

হাবুলদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে আমি বললুম : আমাদের চলে যাবে, তাই না?

বলে ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললুম : আমরা আপনাদের

সরকারী রেট জানতে চাইছি না, কত টাকায় আপনি আমাদের তিনটি রাত আশ্রয় দিতে পারেন তাই জানতে চাইছি।

ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাদের পাঁচজনের দিকেই চেয়ে দেখলেন। উস্কোখুস্কো চেহারা, সারাদিনের ধকলে অবিন্যস্ত শ্রান্ত। বিনয়ের মুখে অপরিসীম বিরক্তি এবং নীরা মনে মনে বোধহয় অভিশাপ দিচ্ছে আমাদের। কিন্তু পরমানন্দের কোন ভাবান্তর নেই। ভৃত্যের মতো নির্বিকার ভাবে সে মালপত্রের পাহারা দিচ্ছে। ম্যানেজার হাবুলদার দিকে তাকিয়ে বললেন: রেট তো কম করা যায় না, তবে শনিবার সকালে আপনারা ঘর ছেড়ে দেবেন বলে একটা কনসেসন করতে পারি। আপনারা তিনখানা ঘরের জন্যে পঁচাত্তর টাকা ভাড়া পার ডে হিসেবে দেবেন তিন দিনের ভাড়া।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তাহলে ট্যাক্সির ভাড়াটা আপনি কাইণ্ডলি দিয়ে দিন, আমরা অ্যাড্‌ভান্সের সঙ্গেই দিয়ে দেব। এসো হাবুলদা।

বলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললুম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাবুলদা বলল: ও ব্যাটা ড্রাইভার অনেক টাকা চেয়েছিল।

তা জানি বলেই তো ম্যানেজারকে লাগিয়ে দিলুম।

ম্যানেজার যদি পুরো টাকা দিয়ে দেয়?

দেবে না। আমি আগেই বলে রেখেছি।

নীরার ঘরখানা বেশ ছোট, কিন্তু অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম পেয়ে সে বেশ খুশী হল। আর একখানা ডবল বেডের ঘরের সঙ্গেও বাথরুম ছিল। তাই দেখে আমি বললুম: হাবুলদা, তুমি এই ঘরে থাকো বিনয়কে নিয়ে। আমি পরমানন্দ্‌ ভাইএর সঙ্গে ঐ কোনার দিকে থাকব।

পরমানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলল: ভাল বলেছেন গোপালদাদা, আমরা দুজনে ঐ ঘরে বেশ থাকব।

হাবুলদা বলল ঃ তুই বেশ কম পয়সায় ম্যানেজ করলি তো!

কম পয়সায় করলুম না ঠকে গেলুম তা জানি না। তবে এদের সরকারী রেট অনেক বেশি। এরা টুরিস্ট্ ডিপার্টমেন্টের স্টার চিহ্ন পায় নি বলেই ভাড়ার ব্যাপারে একটু নরম আছে। তা না হলে এরাও গলা কাটত।

হাবুলদা বলল ঃ দুশো টাকা আমি আজই জমা রেখে দেব। তুই মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে কাল পরশুর জন্যে একটা টেরিফিক প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেল্।

তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলল ঃ গোপাল অনেক ঘুরেছে তো, কায়দা-কানুন ও বেশ রপ্ত করেছে। আমাদের আর ভাবতে হবে না।

বলে নীরাকে তার ঘরের ভিতরে ঠেলে দিয়ে বলল ঃ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে, ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

বিনয় আগেই তার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আমি বললুম ঃ পরমানন্দ্ ভাই, তুমি আগে যাও।

পরমানন্দ্ বলল ঃ না গোপালদাদা, তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে কাজে যাও।

হেসে বললুম ঃ তুমি তো ভাই লক্ষ্ণৌএর নবাব নও, তোমার এমন তকল্লুফ্ কেন!

আমার তো কোন কাজ নেই গোপালদাদা, কাজ তোমার। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে নাও না!

শেষ পর্যন্ত আমিই আগে বাথরুমে গেলুম এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে নেমে গেলুম নিচে ম্যানেজারের কাছে। টুরিস্ট্ লিটারেচারখানা আমার হাতেই ছিল, বললুম ঃ এইবারে একটু সাহায্য করুন। কাল সকালে একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিন শহর দেখবার জন্যে।

ম্যানেজার বললেন ঃ আপনাদের হাতে সময় একেবারে নেই। তা না হলে কম খরচে ভাল ব্যবস্থা ছিল দেখবার।

কী রকম?

ডি-লাক্স কোচে শহর দেখাবার জন্যে রাইনো টুর আছে, তাতে ইংরেজী-জানা গাইডও আছে। কাল তো বিস্যুৎবার—

বলে তাঁর ড্রয়ার থেকে একখানা লিফলেট বার করে পড়লেন: রবি মঙ্গল ও বিস্যুৎবার টুর নম্বর তিন ও চার। সকাল আটটা থেকে বারোটা মহাবৌদ্ধ, দরবার স্কোয়ার, হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার, পাটন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ও সিংহ দরবার। তারপর দুপুর দেড়টা থেকে পাঁচটা ছোবার, তৌদাহা, হাতিবন ও সিকা নারায়ণ॥

আমি নীরবে শুনছিলুম। তাই আমাকে মনোযোগী দেখে তিনি বললেন: সোম বুধ ও শুক্রবার টুর নম্বর এক ও দুই। সকালে পশুপতিনাথ, বোধনাথ ও ভাদগাঁও, আর দুপুরে মচ্ছেন্দ্রনাথ, হনুমান ঢোকা, নেপাল মিউজিয়ম, স্বয়ম্ভুনাথ ও বালাজু।

আর শনিবার কী?

টুব নম্বব পাঁচ। সকাল বেলাতেই ধুলিখেল ও বানেপা। ভাড়া মাথা পিছু আট টাকা এক বেলার জন্যে।

তাহলে আমাদের সস্তা কিছু হত না।

কেন?

পাঁচজনের জন্যে চল্লিশ টাকা করে আশি টাকা লাগত দিনে। ট্যাক্সিতে শহর দেখতে কি এত টাকা লাগবে?

ম্যানেজার একটু ভেবে বললেন: কথাটা মন্দ বলেন নি। একজনের জন্যে সুবিধে, কিন্তু পাঁচজন এক ট্যাক্সিতে গেলে আর বাছা বাছা কয়েকটা জায়গা দেখলে মনে হয় কম সময়েই বেশি দেখতে পাবেন। আমার জানা দুখানা ট্যাক্সি আছে—একখানা পুরনো ভ্যানগার্ড, আর একখানা নতুন টোয়েটা। ভ্যানগার্ডের ড্রাইভার কম পয়সায় রাজী হতে পারে, আর গাইডেরও কাজ করবে ভাল।

আমি বললুম: বেশ তো, তার সঙ্গেই একবার কথা বলে দেখুন না!

ম্যানেজার বললেন: তাই বলব। এখন তো ভাড়া খাটতে গেছে, ফিরুক রাতে। রাতেই কথা বলে রাখব।

যাতে সকালেই তাকে পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করবেন।

ম্যানেজার বললেন : কী ভাবে দেখবেন সব ?

বললুম : সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব। প্রথমে পশুপতিনাথ এবং তারপর ঐ দিকটা।

মানেজার বললেন : গুহ্যেশ্বরীও কাছে। বোধনাথ স্তূপ সেখান থেকেই দেখতে পাবেন। কাছে গিয়ে যদি দেখতে না চান, তবে গোকর্ণ গর্জের ভেতর দিয়ে সুন্দরীজলে যাবারও তেমন দরকার নেই।

দূর কত ?

পশুপতিনাথ এখান থেকে তিন মাইল দূরে। বোধনাথ ফিরে এসে অন্য পথ ধরে যেতে হয়, সেও মাইল চাবেক দূরে। সুন্দরীজল সেখান থেকে পাঁচ মাইল।

বললুম : বাদ দিন তাহলে।

যদি বালাজু যান, তবে সাত মাইল দূরে বুড়ানীলকণ্ঠও বাদ দিতে পারেন। দু জায়গাতে একই জিনিস, অনন্তশয্যায় নারায়ণ। বুড়ানীলকণ্ঠে আর কিছু নেই, বালাজুতে নাগার্জুন পাহাড়ের কোলে একটি সুন্দর বাগানও দেখতে পাবেন। আর বালাজু দেখবেন নেপাল মিউজিয়ম ও স্বয়ম্ভূনাথ দেখবার সময়। দু তিন মাইলের মধ্যেই এই সব দেখতে পাবেন।

তারপর বললেন : ভাদগাঁও আর পাটন আপনাদের দেখতেই হবে। কাঠমাণ্ডুর মতো এ দুটিও এক সময়ে রাজধানী ছিল। এখনও অনেক কিছুই দেখবার আছে। তাই আমার মনে হয় যে পশুপতিনাথ দর্শনের পর আপনারা ভাদগাঁও ঘুরে আসুন। এখান থেকে দূরত্ব প্রায় ন মাইল হবে। দেখতেও সময় লাগবে অনেকটা।

তারপর ?

ফিরে এসে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। তারপর বিকেলে যদি বেরোন তবে মিউজিয়ম স্বয়ম্ভূনাথ বালাজু দেখে চলে আসুন পাটনে। পাটনেও আপনাদের অনেক সময় দিতে হবে।

আমি বললুম : পরদিন সকালে দেখলে হয় না? বিকেলে আমরা কাঠমাণ্ডু শহরটা দেখতে পারতুম।

সকালের দিকে কাঠমাণ্ডুর বাইরে গেলে ভাল লাগত। ছোবার গর্জ ও ফার্পিং দেখে দক্ষিণ কালী দর্শন করে আসতে পারতেন। যাবার সময় ডান হাতে নেপালের আর একটি রাজধানী কীর্তিপুরও নজরে পড়ত। সেখানেই তৈরি হচ্ছে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি।

কাঠমাণ্ডু দেখব কখন?

বিকেল বেলায় হাঁটতে হাঁটতে হনুমান-ঢোকায় চলে যাবেন। সেখানেই ছিল কাঠমাণ্ডুর পুরনো রাজধানী। পায়ে হেঁটেই সব দেখে নিতে পারবেন।

বললুম : আমার একবার টুরিস্ট অফিসে যাবার দরকার ছিল।

তাহলে একটা রিক্সা নিয়ে প্রথমে টুরিস্ট অফিসে চলে যাবেন। ফেরার পথে নামবেন হনুমান ঢোকায়। আপনার হাতে যে বইখানা আছে, তাতেই সব দেখবার জায়গার নাম আছে।

পরমানন্দ কখন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা খেয়াল করি নি। এইবারে সে প্রশ্ন করল : কম সময় থাকবার জন্যে আমরা কী দেখতে পাব না?

ম্যানেজার বললেন : কাঠমাণ্ডু উপত্যকারই তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন না, তার বাইরে সবই আপনাদের অদেখা থেকে যাবে।

মানে কী না দেখার জন্য আমাদের আপসোস করতে হবে?

সেটা আপনারা ভাল বুঝবেন। আমি তো দেখি, এখানে নানা রকমের টুরিস্ট আসেন। কেউ সাত দিন ধরেই শহরটা দেখে চলে যান, কেউ পাটন আর ভাদগাঁও দেখেন দু তিন দিন করে, কীর্তিপুরও দেখেন। কেউ এ সব না দেখে, বুড়ানীলকণ্ঠ শিবপুরী সুন্দরীজল ভাদগাঁও না দেখে চলে যান নগরকোট। আর কেউ গোদাবরী দেখেন, দেখেন বজ্রবারাহী টিকা ভৈরব, সরস্বতী কুণ্ড পর্যন্ত চলে যান।

আবার অনেকে পশুপতিনাথ দর্শন করে প্লেনে চলে যান পোখরায় মুক্তিনাথ দর্শনেব জন্য।

মুক্তিনাথ!

অনেক হাঁটতে হয়। গোঁসাইকুণ্ডেও যান অনেকে। যাঁদের ট্রেকিংএব শখ, তাঁরাই এ সব করেন। পূর্বে নামচেবাজার হেলাম্বু যান, কিংবা পশ্চিমে রাপ্তি উপত্যকা। আবার অনেকে এখানে না এসেও বলেন নেপাল দেখেছি।

কেমন করে?

গোরখপুব থেকে লুম্বিনী দেখে আসেন, কিংবা দ্বারভাঙ্গা থেকে জনকপুর। আর তা না হলে যোগবানি থেকে বিরাটনগর। নেপালের তিনটে বড় শহর দেখা হয়ে গেলে নেপাল দেখা হয়েছে বলবেন না কেন!

পরমানন্দ্ বললেন: আমি তো গোবখপুরে থাকি, আমি এখনও লুম্বিনী দেখি নি।

বললুম: আমি লুম্বিনীর কথা জেনে নিয়েছি।

কার কাছে?

হেসে বললুম: বেনারস থেকে যে ববযাত্রী এসেছিলেন, তাঁদেরই একজনের কাছে।

তবে তো ভালই হল। আপনার কাছেই লুম্বিনীব কথা শোনা যাবে।

হাবুলদা ঠিক এই সময়েই নিচে নেমে এল, বলল: তোরা এইখানে! আমি এতক্ষণ তোদেব জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

আমি বললুম: ওরা কোথায়?

হাবুলদা বলল: নীরা মাথা ধরা নিয়ে শুয়ে পড়েছে, আর বিনয় তার চুল পালিশ করছে। পরমানন্দ্, তুই ওদের ডেকে নিয়ে আয়।

বলে ম্যানেজারকে বলল: কিছু অ্যাডভান্স্ নিয়ে নিন।

তারপর খুব সাবধানে প্যান্টের ভেতবের পকেট থেকে দুশো টাকা বার করে ম্যানেজারের হাতে দিল।

ম্যানেজার বললেন: আপনার ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আপনি বোধহয় দশ টাকা কবুল করেছিলেন। আমি তাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বিদেয় করেছি।

হাবুলদা খুশী হয়ে সেই পাঁচ টাকাও বার করে দিয়ে বলল: আপনার ডিনাবের সময় হয়েছে তো! চার্জ কত আপনার?

নিরামিষ খাবার সাড়ে তিন টাকা।

হাবুলদা বলল: খুব ভাল কথা, আমরা নিরামিষই খাব। কী বলিস গোপাল?

আমি বললুম: তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি একটা কাজ করেছি হাবুলদা।

কী কাজ?

কাল সকালে পশুপতিনাথ ও গুহ্যেশ্বরী দর্শন করে পুরনো রাজধানী ভাদগাঁও, আর বিকেলে মিউজিয়াম স্বয়ম্ভূনাথ বালাজু দেখে পাটন।

কিন্তু নীরা এত ধকল সইতে পারবে না।

ট্যাক্সিতে যেতে আসতে পারবে না? হাঁটতে না পারে, বসে থাকবে ট্যাক্সিতে।

ঠিক এই সময়েই নীরা বিনয়ের সঙ্গে ওপর থেকে নামল, পিছনে পরমানন্দ। বলল: খুব পারব।

বললুম: তার পর দিন সকালে দক্ষিণকালী।

বিকেলে?

যে হাঁটতে পারবে, সেই বেরোবে। কাঠমাণ্ডু শহর আমরা হেঁটে দেখব।

নীরা বলল: অসম্ভব, হেঁটে কোন শহর দেখা যায় না।

হাবুলদা বলল: কালকের প্রোগ্রামটা তো হোক, তারপর দেখা যাবে।

আমরা সবাই মিলে খেতে বসলুম। হাবুলদা সবার জন্যেই

নিরামিষ খাবারের অর্ডার দিল। কিন্তু নীরা বলল: আমি নিরামিষ খাব না।

হাবুলদা বলল: তবে তোর জন্যে কী দেবে? মাছ না মাংস?

বেয়ারা বলল: এ বেলায় মাছ নেই, মাংস আছে।

তবে মাংসই দাও।

বিনয় বলল: আমার জন্যেও মাংস।

কিন্তু মাংসের প্লেট দেখে তুজনের চোখই চড়ক গাছ। বিরাট আকারের এক পিস মাংস, পাঁঠা বা খাসির বলে মনে হল না।

বিনয় লাফিয়ে উঠে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল: এ কি মোষের মাংস নাকি?

ম্যানেজার বললেন: এ হোটেলে মোষের মাংস আসে না।

অন্য হোটেলে আসে বুঝি!

ম্যানেজার এ কথা অস্বীকার করলেন না। পরমানন্দ মৃত্নু স্বরে বলল: কী দরকার ও সব খেয়ে!

কোন দরকার নেই। তবু তারা তুজনেই সেই মাংস পরিতৃপ্তি সহকারে খেল।

নীরা আমার সামনে বসেছিল। ঝকঝকে শাড়ি পরেছে একখানা, ঠোঁটে লাল রঙ। প্রসাধনের উগ্র গন্ধ পাচ্ছি। পথে আমি মোষের মাংসের কথা শুনেছি। তাই সামনে তাদের সেই মাংস খেতে দেখে বারে বারেই একটা অতৃপ্তি জেগে উঠছিল। অন্য টেবলে বসে পরমানন্দ বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। সে বসেছিল আমাদের দিকে পিছন ফিরে।

১৬

খেয়ে দেয়ে উঠবার সময় পরমানন্দ সোৎসাহে বলল : গোপাল-দাদার কাছে আজ লুম্বিনার কথা শুনব।

হাবুলদা বলল : সে কি রে, লুম্বিনীর কথা তুই নিজে বলবি, না গোপালের কাছে শুনবি ?

আমি তো লুম্বিনী দেখি নি।

গোপাল দেখেছে বুঝি ?

পরমানন্দ গদগদ ভাবে বলল : গোপালদাদা জানছে অনেক।

হাবুলদা বলল : জানছে নয় রে, জানে। আর সব যে নিজে জানে তাও নয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয়। এখান থেকে ফিরে গিয়ে দেখবি নেপালের ওপরেই একখানা জাব্দা বই লিখে ফেলেছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল : তা বেশ তো, তুই আজ আমাদের কিছু বল্ না।

উপরে পৌঁছেই নীরা বলল : আমি শুয়ে পড়ছি।

হাবুলদা বলল : তুই শুনবি না ?

আমার মাথা ধরেছে।

বিনয় বলল : আমারও ঘুম পাচ্ছে।

বলে তারা দুজনেই শুতে চলে গেল। হাবুলদা আশ্চর্য হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল : চল্, তবে তোদের ঘরেই যাই।

ছোট ঘর। চেয়ার ছিল মাত্র একখানা। আর টেবল একটা। তাতেই মনে হচ্ছিল যে ঘরে আর জায়গা নেই। হাবুলদা চেয়ারখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল : তুই আরাম করে বোস্, আমরা তোর খাটে বসছি। লুম্বিনীর কথাই আগে শুনবি নাকি ?

বলে পরমানন্দের দিকে তাকাতেই সে বলল : তোমার যদি কিছু জানবার থাকে তবে আগে জেনে নাও।

হাবুলদা বলল : কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি অনেকগুলো পুরনো রাজধানীর নাম শুনলাম কিনা, তাই জানতে ইচ্ছে করছে এ দেশের এতগুলো রাজধানী হল কেমন করে ?

আমি বললুম : আমাকে তোমরা কী পেয়েছ বল তো ?

হাবুলদা বলল : রাগ করছিস কেন ? তুই অনেক জানিস বলেই তো তোর সঙ্গে আমরা এসেছি। তুই না বললে কে বলবে আমাদের ?

পরমানন্দ বলল : না না, গোপালদাদা একটুও রাগ করে নি। একটু লজ্জা করছে।

করছে নয় রে, পাচ্ছে। লজ্জা পাচ্ছে।

সে একই কথা হাবুলদাদা।

সে নয়, ও। ও একই কথা। কিন্তু আমিও তো মজঃফরপুরে মানুষ হয়েছি, কিন্তু গোরখপুরে তোদের এই হাল হল কেন ?

পরমানন্দ অপরাধীর মতো বলল : আমাদের তো কলকাতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আমরা একেবারে গোরখপুরিয়া হয়ে গেছি !

হাবুলদা এবারে আমার দিকে ফিরে বলল : নে, তুই আরম্ভ কর্।

বললুম : আমি নিজে লুম্বিনী যাই নি হাবুলদা, তোমাদের বরযাত্রী এক ভদ্রলোকের কাছে শুনেছি। তিনি বললেন, গোরখপুর থেকে গোণ্ডা লাইনের ট্রেনে উঠতে হয়, আর নামতে হয় নৌগড় নামে একটা স্টেশনে। নৌগড় থেকে কাঁকুড়হা পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। সেখানেই নাকি ভারত ও নেপালের সীমানা। এই সীমান্ত থেকে লুম্বিনী মাত্র ছ সাত মাইল দূরে। কিন্তু পথ খুব খারাপ।

কেন ?

সে ভদ্রলোক বললেন, ১৯৫৬ সালে বুদ্ধ জয়ন্তীর সময় উ থাণ্ট্

সাহেবের চেষ্টায় এই শড়কটি পাকা করা হয়েছিল, কিন্তু তার পর থেকে আর কখনও মেরামত হয় নি। বোধহয় দরকারও হয় না।

কেন ?

বিদেশী টুরিস্ট এলে কাঠমাণ্ডু থেকে ভৈরোয়ায় আসে উড়ে, সেখান থেকে লুম্বিনী আসা যায়। আর এ দেশ থেকে কেউ যেতে চাইলে গাড়ি নিয়ে কোন রকমে পৌঁছনো যায়।

তবে গরিব লোকে যায় কী করে ?

হেঁটে বা সাইকেল রিক্সায়। পথ তো ছিল, কোন রকমে যাওয়া নিশ্চয়ই যায়।

হাবুলদা বলল ঃ ঠিক আছে। ধরে নে, কোন রকমে পেঁাছে গেছি। এবারে বল্ তো কী দেখবার আছে সেখানে।

বললুম ঃ কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা বেশ বড় একটা জায়গা, তার নাম লুম্বিনী পার্ক। প্রবেশ পথের ডান হাতে লুম্বিনী ধম্মোদয় সভা একটি সরকারী অফিস, আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকে মহেন্দ্র স্তম্ভ নেপালের রাজার প্রতিষ্ঠা। মার্বল পাথরের বেদীর ওপরে এই সাদা পাথরের স্তম্ভটি অশোক স্তম্ভের মতো মনে হবে। আসল অশোক স্তম্ভটি এর দক্ষিণে। এরই গায়ের শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছিল যে গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন এইখানে। এই স্তম্ভটি সম্পূর্ণ নয় এবং অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের মতোও নয়। এর দক্ষিণে রুম্মিনদৈ বা রুখিনদই মন্দির। মন্দিরের ভেতরে গৌতম বুদ্ধের জননী মায়া দেবীর একটি ভাঙা মূর্তি আছে, তেল সিঁদুর মাখিয়ে তাঁর পূজা করা হয়। পাশে গৌতমকে বরণ করবার জন্যে প্রজাপতি বা ইন্দ্র উপস্থিত আছেন।

হাবুলদা আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ বলিস কি রে, এ সবেরও দৈন্য দশা!

বললুম ঃ তাই তো শুনেছি। মন্দিরের পাশে অনেক স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। এইখানে মাটি খুঁড়ে অনেক মুদ্রা ও পেতলের ভাঙা মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। শুধু অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি নয়, গণেশ ও তারার মূর্তিও।

আর কী দেখবার আছে ?

পাশাপাশি দুটি নতুন বৌদ্ধ মন্দির। একটি তিব্বতীদের তৈরি, অন্যটি নেপালী বৌদ্ধদের। এই মন্দিরে বুদ্ধের বিশাল মূর্তির দু পাশে নেপালের রাজা বিক্রম এ তাঁর রানীর মূর্তি। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁদেরও নাকি পূজা হয়। মন্দিরের পাশে একটি ধর্মশালাও আছে।

হাবুলদা বলল : এই শেষ ?

বললুম : হ্যাঁ। একদিন যা শাক্য রাজাদের রাজধানী কপিলাবাস্তুর উপকণ্ঠে মনোরম উদ্যান ছিল, আর একটি শাল গাছের নিচে জন্ম হয়েছিল গৌতমের, সেই লুম্বিনী এখন রোদে পুড়ে খাঁ খাঁ করছে।

কপিলাবাস্তু কোথায় ?

সে নাকি লুম্বিনী থেকে ন মাইল দূরে পিপরাওয়া গ্রামে।

কী আছে সেখানে ?

বোধহয় একটা ধ্বংস স্তূপ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য যিনি তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর পূর্ণ মর্যাদা কি আমরা দিতে পেরেছি। তিনি কল্পনার দেবতা ছিলেন না, ছিলেন আমাদেরই মতো রক্ত মাংসের মানুষ। তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত মাত্র চারটি স্থান আমাদের তীর্থ—লুম্বিনী রাজোদ্যান তাঁর জন্মস্থান, বুদ্ধগয়ার নিকটে উরুবিল্ব গ্রাম তাঁর সম্বোধি লাভের স্থান, বেনারসের নিকটে সারনাথে তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান ইসিপত্তন মৃগদাব এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণের স্থান কুশীনগর। এর প্রথমটি নেপালে ও বাকি তিনটি আমাদেরই দেশ ভারতে। আজও আমার এর একটিও দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

হাবুলদা আমাকে একটা তাড়া দিয়ে বলল : কি রে, ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

আমি চমকে উঠে বললুম : না তো!

তবে চুপ করে রইলি কেন ?

কী বলব তাই ভাবছিলুম।

হাবুলদা পরমানন্দ কে বলল : তুই যেন আর কী শুনতেচেয়েছিলি ?

পরমানন্দ্ বলল : এখানে এতগুলো রাজধানী হয়েছে কেন, সেই কথা হাবুলদাদা।

সত্যিই তো, ওর মাথায় একটা ভাল প্রশ্ন এসেছে। বল্ না গোপাল।

হেসে বললুম : এ প্রশ্নটা তোমারই, তুমিই শুনতে চেয়েছিলে। কিন্তু এর উত্তর দিতে গেলে নেপালের ইতিহাস বলতে হয়।

হাবুলদা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে বলল : রাত তো বেশি হয় নি, লম্বা হলে সংক্ষেপে বল্।

বললুম : দেখো, কোন বড় ইতিহাসের বই থেকে আমি বলছি না, আমি বলছি নেপাল থেকে প্রকাশিত একখানা গাইড বই থেকে।

হাবুলদা রেগে গিয়ে বলল : তুই কি ভাবছিস যে তোর কথা শুনে আমরা একটা থিসিস লিখব ডক্টরেট পাবার জন্যে ! এই রকম বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে যা জানিস তা চট করে বলে ফেল্।

পরমানন্দ্ একটু নড়ে চড়ে বসে বলল : বল গোপালদাদা।

বললুম : তোমরা যা জানতে চাইছ তা কিন্তু এই গাইড বইএর ইতিহাসে নেই। সেখানে এক কথায় আছে যে মল্ল রাজাদের সময়ে এখানে তিনটি রাজ্য ছিল—কাঠমাণ্ডু পাটন আর ভাদগাঁওএ।

আমরা তো এই কথাটাই জানতে চাইছি—এত কাছাকাছি তিনটে রাজ্য আর তিনটে রাজধানী হল কী করে ?

বললুম : আমি তো এই কথাই বলছিলুম। এর জন্যে কোন ইতিহাসের বই দেখা দরকার।

তার মানে তুই জানিস না, এই তো !

তা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে।

তবে বলছিস না কেন ?

বললুম : হাতের কাছে কোন ইতিহাসের বই না পেয়ে আমি

এখানে আসবার আগে বিশ্বকোষে নেপালের ইতিহাস পড়েছিলুম। তাতে দেখেছি যে পার্বতীয় বংশাবলীতে গুনকাম নামে এক রাজার নাম আছে। ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই কাঠমাণ্ডু নগর স্থাপন করেন। গুনকাম কোনও রাজার উপাধি বলে মনে হয় এবং ইনি পরচক্রকাম নামে পরিচিত দ্বিতীয় জয়দেবও হতে পারেন। জয়দেব লিচ্ছবি রাজ-সিংহাসনে বসেন, বিবাহ করেন হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে। এই হর্ষদেব হর্ষবর্ধন নন, তিনি কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্মার পুত্র বা পৌত্রস্থানীয় ছিলেন।

তারপর?

তার পরের আড়াই শো বছরের ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই সময়ের ইতিহাস নাকি কেউ সংগ্রহ করতে পারেন নি।

তাহলে তার পরের কথা বল্।

৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজা রাঘবদেব ২০শে অক্টোবর থেকে এক নতুন অব্দের প্রচলন করেন। এটাই নেপালী সংবৎ। মল্ল নামের রাজা পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। যিনি তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে নেপাল রাজ্য ভাগ করে দেন, তাঁর নাম যক্ষমল্ল। সে ঘটনা ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের। একজন ভাদগাঁওএ রাজা হলেন, আর একজন রইলেন কাঠমাণ্ডুতে। ভাদগাঁওএর রাজবংশ শেষ হয়েছে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ মল্লের পর।

হাবুলদা বলল: পাটনের কী হল?

বললুম: কাঠমাণ্ডুতে মহীন্দ্রসিংহ রাজত্ব করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁরই এক উত্তরাধিকারী পাটনে গিয়ে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন।

কাঠমাণ্ডুতে কেউ রইল না?

সেখানেও একজন রইলেন। অর্থাৎ মল্ল বংশের তিনজন রাজা তিন জায়গায়—ভাদগাঁও, কাঠমাণ্ডু ও পাটনে।

তারপর?

তারপর গোর্খা রাজত্বের অরম্ভ। কিন্তু—

হাবুলদা বলল : আবার কিন্তু কেন! বলেই ফেল্ না কী বলতে চাস।

বললুম : ভারতকোষের বিবরণ কিছু অন্য রকম। তাতে আছে যে ঠাকুরী বংশের রাজারা ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নেপালে রাজত্ব করেন। নেপাল নামটি প্রচলিত হয় ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঠাকুরা বংশের পর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মল্লবংশের রাজত্ব শুরু হয় এবং মল্লরা তিনশো বছর রাজত্ব করেন। সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই সময়-টাকেই স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে।

তারপর ?

গণ্ডগোল তার পরেই। পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করবার পর যক্ষ মল্ল তাঁর রাজত্ব চারজনের মধ্যে ভাগ করে দেন ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই এই চারটি রাজত্ব ছিল কাঠমাণ্ডু, ললিতপুর বা পাটন, বানেপা ও ভক্তপুর বা ভাদগাঁও। গোর্খা রাজার আক্রমণ পর্যন্ত এঁরাই রাজত্ব করেন।

হাবুলদা বলল : তিনটে নামই সামলাতে পারছি না, আবার একটা জুড়ে দিলি। বানেপা আবার কোথায় ?

ঠিক জানি না। ললিতপুর ভক্তপুরের মতো কীর্তিপুর নাম শুনেছি। বানেপা কীর্তিপুরেরই নাম কিনা কে জানে! মনে হয়, তা নয়। জেনে নেব কারও কাছে।

হাবুলদা বলল : তাহলে গোর্খাদের কথা বল।

বললুম : আমি যে গাইড বইএর কথা বলছিলুম তাতে বর্তমান রাজবংশকে শাহ ডাইনাস্টি বলা হয়। তাতে বলেছে যে শাহ বংশ নামে পরিচিত এই ঠাকুরীদের রক্তের সম্পর্ক ছিল চিতোরের শিশোদীয় রাজবংশের সঙ্গে। মুসলমানদের হাতে চিতোরের পতন হলে তাদের একটি শাখা উজ্জয়িনী থেকে নেপালে আসে এবং কালক্রমে গোর্খা শহর দখল করে বসে। এই শহরটি কাঠমাণ্ডু থেকে আটচল্লিশ

মাইল পশ্চিমে। গোর্খার দ্রব্য শাহই এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

হাবুলদা বলে উঠল : দাঁড়া, ব্যাপারটা তুই গুলিয়ে দিলি।

কী রকম ?

নেপালীরাই তো গুর্খা! তুই এদের শহর বলছিস কেন ?

গুর্খা বা গোর্খা আসলে একটি শহরেরই নাম। কেন এই নাম হল তা বলতে গেলে ইতিহাস ছেড়ে গোরক্ষনাথের কথা বলতে হবে, তার আগে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ আর নাথ ধর্মের কথা। তাতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

হাবুলদা তাড়াতাড়ি বলল : তবে সে কথা এখন থাক। তুই ইতিহাসের কথাই শেষ কর তাড়াতাড়ি।

বলে আবার তার ঘড়ি দেখল।

বললুম : নেপালের গাইড বইএ কিন্তু বানেপার নাম নেই। এতে তিনটি রাজ্যেরই উল্লেখ আছে—কাঠমাণ্ডু, ললিতপুর আর ভক্তপুর। গোর্খারাজ পৃথ্বিনারায়ণ শাহ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজাদের আক্রমণ করে এগারো বছরের চেষ্টায় তাঁদের জয় করেন। তিনি হিমালয়ের ছোট ছোট অনেক রাজ্য জয় করেন, এমন কি কুমায়ুন গাড়োয়াল থেকে সিকিম পর্যন্ত অধিকার করেন। এই রাজারাই নেবারী ভাষার পরিবর্তে নেপালে গোর্খালী বা নেপালী ভাষার প্রচলন করেন হিন্দী লিপিতে।

হাবুলদা বলল : তা তো বুঝলাম, কিন্তু কুমায়ুন গাড়োয়াল সিকিম এ সব তাদের হাতছাড়া হল কেমন করে ?

বললুম : ইতিহাসে নেপাল যুদ্ধের কথা তোমার মনে নেই! স্কুলের ইতিহাসেই তো আমরা ইংরেজের সঙ্গে গুর্খাদের যুদ্ধের কথা পড়েছি!

সে সব কি আর মনে আছে!

বললুম : পৃথ্বিনারায়ণ শাহর মৃত্যু হয় ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু

গুর্খারা প্রায়ই বৃটিশ রাজ্যে ঢুকে লুটপাট করত। লর্ড হেস্টিংস তখন ভারতের বড়লাট। তিনি নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজে সেনাপতি হয়ে আক্রমণ করলেন। কিন্তু নিজেদের অযোগ্যতার জন্যে তাঁদের পরাজয় হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কার জন্যে বৃটিশের জয় হয়েছিল তা মনে আছে তো ?

না।

কলকাতায় শহিদ মিনারের পুরনো নাম মনে আছে ? অকটার-লোনি মনুমেণ্ট। সেই অক্টারলোনি যখন নেপালের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন, গুর্খারা তখন সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধি হয়েছিল কোথায় জানো ?

হাবুলদা বিরক্ত হয়ে বলল : অত প্রশ্ন করছিস কেন ? যা বলতে চাস, নিজেই বল্ না।

বললুম : যে সগৌলি স্টেশনে আমরা ট্রেন বদল করলুম আজ সকালে, সেখানেই সন্ধি হয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে গুর্খাদের। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ বেধেছিল, আর সন্ধি হল দু বছর পরে। সন্ধির শর্ত অনুসারে নেপাল দরবারকে ছেড়ে দিতে হল কুমায়ুন গাড়োয়াল সিকিম ও তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ জমি। এর ওপর তাদের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে নিতে হল একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট্।

আর কখনও যুদ্ধ হয় নি এর পর ?

না। নেপালের সঙ্গে শান্তি ও সদ্ভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে। বৃটিশের পর ভারতের সঙ্গেও। শুধু তাই নয়, গুর্খা সৈন্য বৃটিশের সেনা বাহিনীতে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছে, ভারতের সেনা বাহিনীতেও আছে গুর্খা রেজিমেণ্ট। পেন্‌সন ভোগীরা এখনও বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে।

হাবুলদা বলল : তারপর ?

বললুম : তার পরের ঘটনা ইতিহাসে পড়ি নি। ইতিহাস লেখা হয়েছে কিনা তাও জানি না।

কী রকম ?

নেপালের প্রধান মন্ত্রীরা কী ভাবে দখল করলেন রাজার ক্ষমতা, আর রাজা কেমন করে সেই ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করলেন, সেও নেপালের এক বিচিত্র অধ্যায়।

হাবুলদা একটা হাই তুলে বলল : আজ থাক সেই গল্প। আর এক দিন শুনব তোর কাছে। বিনয় বোধ হয় আমাকে গাল দিচ্ছে।

বলে হাবুলদা গুড নাইট বলে বিদায় নিল। আমি বললুম : আমরাও এবারে শুয়ে পড়ি।

কিন্তু পরমানন্দ্ বলল : তোমার কি ঘুম পাচ্ছে গোপালদাদা ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কেন বল তো ?

একটা কথা তোমার কাছে জানবার আছে।

কী কথা ?

পরমানন্দ্ বলল : গৌতম বুদ্ধ তো রাজার ছেলে। রাজার বাড়িতে তাঁর জন্ম না হয়ে লুম্বিনী বনে কেন জন্ম হল ? রাজা কি রাণীকে ত্যাগ করেছিলেন ?

হেসে বললুম : এ কথাটা কেউই জানতে চায় না।

আমি জানতে চাইছি গোপালদাদা !

জানতে চাওয়াই তো স্বাভাবিক। কপিলাবস্তু ছিল হিমালয়ের পাদদেশে একটি ছোট্ট রাজ্য। রাজার নাম শুদ্ধোদন, আর তাঁর রাণী মায়াদেবী। মায়াদেবীর বাপ মা থাকতেন দেবদহ নামে এক জায়গায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে যে বুদ্ধেব জন্মের কিছু দিন আগে মায়াদেবীর খুব ইচ্ছে হল বাপ মাকে দেখবার, আর তিনি কপিলাবস্তু থেকে যাত্রা করলেন। বারো মাইল দূরে লুম্বিনী বনে এসে যখন পৌঁছলেন, তখন তিনি হাত বাড়িয়ে একটা শাল গাছের ডাল ধরলেন। আর সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হলেন গৌতম বুদ্ধ।

ভারি আশ্চর্যের কথা তো !

হ্যাঁ, দেবতারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা হাত বাড়িয়ে

শিশুকে কোলে নিয়ে মানুষের হাতে দিয়েছিলেন। আর সেই শিশু মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাত পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, জেটে ঠাহমমিং, সেটে ঠাহমমিং, অয়মন্তিম জাতি।

এর মানে কী?

বলে পরমানন্দ্ আমার মুখেব দিকে তাকাল।

বললুম: এর মানে হল, আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ, আর এই আমাব অন্তিম জন্ম।

অন্তিম?

তাহলে ভাই তোমাকে জাতক পড়তে হবে। গৌতম বুদ্ধের আগে আরও অনেক জন্ম হয়েছিল। শেষ জন্মে তিনি গৌতম বংশে জন্মেছিলেন বলেই তাঁকে গৌতম বুদ্ধ বলা হয়। আসলে তাঁর নাম সিদ্ধার্থ। খ্রীষ্টের জন্মেব ৫৬৬ বৎসর আগে বৈশাখী পুর্ণিমায় তাঁর জন্ম।

পরমানন্দ্ বলল: আচ্ছা গোপালদাদা, গৌতম বুদ্ধ এমন কী কাজ করেছিলেন যে তাঁর এত নাম?

বললুম: কাজ তিনি কিছুই করতে পারেন নি। একটা কাজ করবার জন্যে খুব চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারেন নি।

সে কাজটা কী?

লুম্বিনী গ্রামে জন্মের পরে তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন। পণ্ডিতরা শুনে বলেছিলেন যে এই শিশু বিশ্ব জয় করবে, নয় বুদ্ধ হবে।

বুদ্ধ মানে কী গোপালদাদা?

বললুম: বুদ্ধ নিজেই এই কথাটার মানে বলেছিলেন—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা
তম ভাবিতত্তঞ্ঞ্ ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম্
বুদ্ধম্ বেরভয়াতীতম্ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

পরমানন্দ্ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাই দেখে বললুম: যাঁর রাগ দ্বেষ ও অবিদ্যা দূর হয়েছে, তাঁকে ধর্মে

প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মভূত তথাগত বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়। আমরা তাঁকেই তথাগত ও বুদ্ধ বলি।

পরমানন্দ বলল : তারপর কী হল ?

বললুম : রাজা এই মাতৃহীন ছেলেকে খুব ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ করতে লাগলেন। বিয়ে দিলেন খুব ঘটা করে। সিদ্ধার্থের যখন উনত্রিশ বছর বয়স, তখন তাঁর একটি ছেলে হল। কিন্তু এর পর তিনি মানুষের দুঃখ দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। দুঃখ কি এক রকম-মানুষের জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে তিনি ভাবলেন যে সব প্রাণী-কেই তো এই দুঃখ ভোগ করতে হয়, ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকা কোন কাজের কথা নয়, এ দুঃখ দূর করাই হল কাজের কথা। একদিন তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, ছ বছর ঘুরে বেড়ালেন নানা গুরুর কাছে। তারপর বুদ্ধগয়াব কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ল গ্রামে একটা গাছের নিচে বসে তপস্যা করে বুদ্ধ হলেন। কী করলে মানুষের দুঃখ থাকে না, তিনি সেই কথাই প্রচার করেছিলেন মানুষের কাছে। তিনি বলেছিলেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।

তা কি সম্ভব ?

হয়তো সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই তিনি তা পারেন নি। কিন্তু দুঃখ দূর করাটা বড কথা নয়, বড় কথা তাঁর মনের সেই প্রবল ইচ্ছা, আর পরের দুঃখ দূর করার জন্যে নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে দেওয়া। তিনি নিজে বড়লোক হতে চান নি, নিজের সুখের জন্যে কিছু চান নি। নিজের সমাজের বা দেশের জন্যেও কোন কাজ বা তপস্যা করেনৈ নি। তিনি বিশ্বের সমস্ত জীবের জন্যে মানুষের জন্যে সারা জীবন সাধনা করেছিলেন। বলেছিলেন—

মাতা যথা নিষং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্ব ভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মেত্তঞ্চ সব্ব লোকস্মিং মান সম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

পরমানন্দ্ আমার মুখের দিকে ঠিক আগের মতো করেই চেয়ে রইল দেখে বললুম ঃ মা যেমন প্রাণ দিয়ে নিজের পুত্রকে রক্ষা করে, তেমনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার ভাব জন্মাবে। ওপরে নিচে চারি দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন মনে অপরিমাণ দয়ার ভাব জন্মাবে। চলতে বলতে শুতে বা দাঁড়াতে, যতক্ষণ নিদ্রিত না হবে ততক্ষণ এই মৈত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে। একেই বলে ব্রহ্মবিহার। শুধু ত্যাগ নয়, প্রেমও চাই। ত্যাগে মানুষ রিক্ত হয়, প্রেমে হয় পূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, অক্কোধেন জিনে কোধং, অক্রোধ দিয়ে ক্রোধকে জয় করবে। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে হলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে আগে। আমাদের উপনিষদেও আছে এই কথা—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।

ত্যাগ দিয়ে ভোগ করবে, লোভ করবে না কারও ধনে। আগে ত্যাগ, তার পরে ভোগ। সেই ভোগ হবে মানুষকে ভালবেসে, তার দুঃখ দূর করে। নিজের কথা ভুলে যেতে হবে সমস্ত মানুষের জন্যে।

পবমানন্দ অস্ফুট স্বরে বলল ঃ খুব বড় কথা আছে।

হাবুলদা থাকলে বলত, আছে নয়, শুধু খুব বড় কথা।

১৭

ভোরবেলায় উঠে দেখলুম পরমানন্দ্ ঘরে নেই। কোথায় গেছে তা অনুমান করতে পারি। ঘরের ভিতরে অন্ধকার তখনও আছে। তাই বাতি জ্বেলে হোটেলের ম্যানেজারের দেওয়া, টুরিস্ট লিটারেচারখানা পড়ে ফেললুম। সংক্ষেপে অনেক কথাই আছে। আবার যা নেই, তারও অনেক কথা আমার জানা নেই। আমি জানি, এখানে আমাদের গাইড কেউ নেই, কিছু জানতে চাইলে তার উত্তর পাওয়া কঠিন হবে।

বইখানা বন্ধ করবার আগেই তুলসীদাসের দোঁহা সুর করে গাইতে গাইতে পরমানন্দ্ ফিরে এল। এরই মধ্যে সে স্নান করে নিয়েছে ঠাণ্ডা জলে। প্রসন্ন মুখে বলল ঃ খুব আরাম হল গোপালদাদা।

তাহলে আমিও স্নান করে আসি কী বল ?

পরমানন্দ্ জামা গায়ে দিতে দিতে বলল ঃ আমি নিচে গিয়ে এদের ব্যবস্থা জেনে আসি।

ঘর বন্ধ করে দুজনেই বেরিয়ে গেলুম। ফিরে এসে দেখলুম, পরমানন্দ্ আগেই এসেছে। হেসে বলল ঃ তোমাদের পালং চায়ের ব্যবস্থা করে এসেছি। আর ট্যাক্সি আসবে সকাল আটটাতে। সারা দিন আমাদের নিয়ে ঘোরাবে। ভাড়ার জন্যে ভাবনা নেই, ম্যানেজারবাবু ঠিক করে দিয়েছেন।

আমি খুশী হলুম এই সংবাদ পেয়ে। কিন্তু পরমানন্দ্ বলল ঃ সময়মতো জাগিয়ে দিতে হবে সবাইকে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ কেন, আটটাতেও এরা জাগবে না ?

হাবুলদাদার জন্যে ভাবনা নেই, আর বিনয়দাদার কথা জানি নে। নীরা একটু দেরিতে ওঠে, আর জাগাতে গেলে বিরক্ত হয়।

আমি বললুম ঃ পালং চা এসে গেলেই জেগে যাবে।

ওরে ব্বাবা, বেয়ারা মার খাবে তাহলে।

তবে ?

দু-চার কাপ ঠাণ্ডা না হলে ওর ঘুম ভাঙবে না। তারপর সাজ-গোজ করতেও তো সময় লাগবে অনেক। ব্রেকফাস্ট করবে সাড়ে নটায়, কাজেই দশটার আগে বেরোতে পারা মুশকিল আছে।

তারপর পশুপতিনাথের মন্দিরে পৌঁছে দেখব, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। না পরমানন্দ ভাই, আমি এর মধ্যে নেই।

তবে কী করবে গোপালদাদা ?

বললুম ঃ হাবুলদাকে বলে আমি আগেই বেরিয়ে পড়ব।

হেঁটে ?

না, বাসে চলে যাব পশুপতিনাথের মন্দিরে। কাছেই গুহ্যেশ্বরী মায়ের মন্দির আছে। তাঁদের দর্শন সেরে আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

পরমানন্দ্ ভাবল একটুখানি, তার পরে বলল ঃ ভাল বলেছ গোপালদাদা। তুমি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। কত দূর থেকে কত যাত্রী আসে পশুপতিনাথ দর্শনে, আর তাঁর দর্শন না পেলে নেপালে আসারই কোন মানে হয় না।

পালং চা পেয়ে হাবুলদার ঘুম ভাঙল। সেই চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমাদের ঘরে এসে বলল ঃ এ নিশ্চয়ই পরমানন্দের ব্যবস্থা।

পরমানন্দ্ তৎপরভাবে বলল ঃ না হাবুলদাদা, হোটেলে আমার কথা চলবে কেন !

আর আমি বললুম ঃ তোমাকে একটা অনুমতি দিতে হবে হাবুলদা। আমাদের ট্যাক্সি তো সকাল আটটায় আসবে, আমি তার আগেই বেরোতে চাই।

আটটায় ট্যাক্সি আসবে ?

পরমানন্দ্ বলল ঃ ম্যানেজারবাবু ঠিক করে দিয়েছেন।

হাবুলদা বলল : তার আগে তুই কোথায় যাবি? সময়মতো ফিরতে পারবি তো?

বললুম : আমি আর হোটেলে ফিরব না, পশুপতিনাথের মন্দিরে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

পরমানন্দ বলল : আমাকেও গোপালদাদার সঙ্গে যেতে দিন হাবুলদাদা।

ব্যাপারটা কী বল্ তো?

বলে হাবুলদা পরমানন্দের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল : তোমাদের তো বেরোতে দেরি হবে, মানে হয়তো দশটাই বেজে যাবে।

কেন? ও, তোরা ভাবছিস আমার সে খেয়াল নেই! বিনয়কে চা ধরিয়েছি, আর দেখছি নীরাকে। দেরি করলে দরজা ভেঙে ঢুকব।

আমি কাতর কণ্ঠে বললুম : তা তোমরা আটটাতেই বেরিয়ো। পশুপতিনাথের মন্দিরের দরজায় আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।

হাবুলদা পরমানন্দ কে বলল : তাহলে তুই ওর সঙ্গে যাস। আর কিছু খেয়ে যাস হোটেলে।

পরমানন্দ বলল : সে কি হাবুলদা! কিছু খেয়ে মন্দিরে যাব কেন? পশুপতিনাথজীর দর্শনের পরেই কিছু খেয়ে নেব আমরা।

মনের আনন্দে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। পশুপতিনাথের বাস কোথায় পাওয়া যাবে তা হোটেলেই জেনে নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে বাস ধরলুম। বাসে ভিড় নেই, আর তাতে ওঠবার জন্যেও যুদ্ধ করতে হয় না কলকাতার মতো। পরিচ্ছন্ন পথে সকালের সোনালী রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। বাতাসে শীতের আমেজ। এ বাস পশুপতিনাথের মন্দিরের দরজায় আমাদের পৌঁছবে না, বাস থেকে নেমে আমাদের হাঁটতে হবে অনেকটা পথ। কিন্তু তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কয়েক দিন পা মুড়ে বসে থেকে হাঁটবার একটা আগ্রহ জেগেছে মনে।

আরাম করে বসেই পরমানন্দ বলল : তুমি তো অনেক জানো গোপালদাদা, পশুপতিনাথজীর সম্বন্ধে কিছু বল। কিসের জন্যে তাঁর এমন মাহাত্ম্য ?

তাহলে তো অনেক কথা বলতে হয়।

তা বল না। এ সব জানবার সুযোগ তো হয় না ! সুযোগ যখন হয়েছে, তখন তা ছাড়ি কেন !

বললুম : পশুপতি শিবের একটি নাম। নেপালের পশুপতিনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি।

জ্যোতির্লিঙ্গ কী গোপালদাদা ?

হেসে বললুম : খুব বিপদের কথা। জ্যোতির্লিঙ্গ কী তা কেউ জানতে চায় না। তাই অনেকেই জানে না। শিবপুরাণে জ্যোতির্লিঙ্গ উৎপত্তির কথা আছে। কে এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, এই নিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে বিবাদের সময়ে এই জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হয় বিবাদ ভঞ্জনের জন্য। এর আদি অন্ত নেই, ক্ষয় বৃদ্ধিও নেই।

পরমানন্দ আশ্চর্য হয়ে বলল : এই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ ?

বললুম : জ্যোতির্লিঙ্গ কিন্তু একটি নয়, সবসুদ্ধ বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে নানা স্থানে।

কোথায় এই সব জ্যোতির্লিঙ্গ ?

শিবপুরাণেই তার উল্লেখ আছে। সৌরাষ্ট্রের প্রভাসপত্তনে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, নর্মদায় ওঙ্কা-রেশ্বর, অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর, হিমালয়ে কেদারনাথ। এর পর মহা-রাষ্ট্রে ভীমশঙ্কর, বারানসীতে বিশ্বনাথ, নাসিকের নিকটে ত্র্যম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ দেওঘরে, কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের কাছে পার্লিতে। নাগেশ্বর নিয়েও গোলমাল আছে—কেউ বলেন হায়দ্রাবাদের কাছে আওধা গ্রামে, কেউ বলেন দ্বারকার কাছে। দক্ষিণে রামেশ্বর, আর ঘুশ্মেশ্বর ইলোরার কাছে।

এতো সব মনে রেখেছেন কী করে গোপালদাদা ?

বললুম ঃ এ সব নিয়ে আরও মতান্তর আছে, সে সব মনে নেই।

পরমানন্দ বলল ঃ কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে নেপাল দেবীর পীঠস্থান বলেই তীর্থ হয়েছে।

বললুম ঃ এ কথাটাও ঠিক। তন্ত্রচূড়ামণির মতে সতীর জানু পড়ার জন্যে নেপাল পীঠস্থান হয়েছে। দেবী মহামায়া, তাঁর ভৈরব কপালী। শিবচরিতের মতেও নেপাল মহাপীঠ। সতীর ডান জঙ্ঘা পড়েছিল নেপালে। দেবী এখানে মহামায়া বা নবদুর্গা, আর ভৈরব কপালী। কিন্তু এই পীঠস্থানটি নেপালের কোন্ জায়গায় তা জানা যায় না। তাই সাধারণের ধারণা যে পশুপতিনাথই এই পীঠস্থানের ভৈরব এবং তাঁর মন্দিরের কাছে গুহ্যেশ্বরীই পীঠস্থানের দেবী। সতীর গুহ্যমণ্ডল এখানে পড়েছিল বলেই দেবীর এই নাম হয়েছে।

তাহলে তো খুব পুরনো মন্দির এটা!

তা বলা যায় না।

কেন?

একজনের কাছে শুনেছি যে এই মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের, বোধহয় কেরালার পুরোহিত আছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে একটি ভাঙা মন্দিরে পশুপতিনাথকে আবিষ্কার করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য। কিন্তু এ কথা মেনে নিলেও সেই ভাঙা মন্দিরটি কে গড়েছিলেন তা জানা যায় না।

পরমানন্দ আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ আদি শঙ্কারাচার্য এখানেও এসেছিলেন?

লোকে তো বলে যে হিমালয়ের সমস্ত পুরনো তীর্থ তিনিই উদ্ধার করেছেন। বদ্রীনাথ কেদারনাথ যদি তিনি উদ্ধার করে থাকেন তো পশুপতিনাথও তিনি করেছেন শুনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে ইতিহাসে পড়েছি যে পশুপতিনাথ নেপালের রাজার দেবতা, তাঁর বর্তমান বহিরঙ্গ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজা জয়সিংহ রামদেব চতুর্দশ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে এই অঞ্চল বৌদ্ধ তীর্থ ছিল

বলে মনে করা হয়। তাই এই মন্দিরও নাকি বৌদ্ধদের প্যাগোডার মতো করে তৈরি করা হয়েছে। শিল্পীরা নেওয়ারী ছিল। তারা বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতিরই অনুকরণ করেছে। এও শোনা যায় যে নেওয়ার রাজা ধর্মদত্ত প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন এবং ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির সংস্কার করেন গঙ্গাদেবী নামে একজন রাণী।

শহরের পথঘাটের দিকে চোখ রেখে আমরা চলেছিলুম। সে সব চিনিয়ে দেবার মতো কেউ সঙ্গে ছিল না। বাসে কণ্ডাকটারকে আমরা গন্তব্যস্থলের কথা জানিয়ে রেখেছিলুম। এক সময় সে আমাদের সচেতন করে দিল যে সামনের স্টপেই আমাদের নামতে হবে এবং তারপর হেঁটে যেতে হবে মন্দির পর্যন্ত। নির্দিষ্ট স্থানে আমরা নেমে পড়লুম।

শহর থেকে আমরা প্রায় মাইল তিনেক এসেছি, তারপর হেঁটেই অগ্রসর হলুম। খুব বেশি হাঁটতে হল না, কষ্ট হল না একেবারেই। তার আগেই মন্দিরের সামনের রাস্তায় এসে পৌঁছে গেলুম। প্রশস্ত পথের দুধারে ঘর বাড়ি ঘন সন্নিবিষ্ট। দোকান আছে অনেক, তাতে পূজার উপচার বিক্রি হচ্ছে যাত্রীদের কাছে। সেই দিকে চেয়ে পরমানন্দ্ বলল ঃ পূজা দেবে না গোপালদাদা?

হেসে বললুম ঃ আমি মনে মনে পূজো করি।

মনে মনে!

হ্যাঁ। দেবতা তো আমাদের সামনে আসেন না, তাঁর মূর্তি দেখে মনে মনে তাঁকে দেবতা ভাবি। তাই মনে মনে তাঁর পূজো করলে দেবতার পায়ে পৌঁছবে না কেন?

কথাটা ঠিকই বলেছেন। তাতে আমারও সুবিধে হল।

কেন?

আমি তো কিছু বুঝি না! না বুঝে কার পূজা করব!

মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। বেশ

বড়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই মন্দির। সাদা ও কালো পাথরের বাঁধানো প্রাঙ্গণের এক স্থানে নন্দীর মূর্তি সোনার মতো ঝকঝক করছে। বিরাট মূর্তি। মনে হল তামা বা পিতলের উপরে সোনার পাত বা গিল্টি। পিছনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠলেই মূল মন্দির। সত্যিই এর আকার প্যাগোডার মতো, একটির উপর আর একটি চার-চালা, তার উপর আর একটি। চূড়াও সোনার মতো ঝকঝক করছে সকালের সুন্দর রৌদ্রে।

মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে আমি থমকে দাঁড়ালুম। পরমানন্দ্ বলল : কী হল গোপালদাদা ?

বললুম : একটু গোলমাল ঠেকছে।

কী রকম ?

আমি পড়েছিলুম যে বাগমতা নদীর তীরে এই মন্দির। কিন্তু কই, নদী তো কোন দিকে দেখতে পাচ্ছি না।

তাইতো !

এই মন্দিরের ছবি আমি দেখেছিলুম। বাগমতী নদীর তার থেকে অসংখ্য সিঁড়ি উঠেছে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত। তারপরে মন্দির দেখা যাচ্ছে ঠিক এই রকমের। কোথাও একটা ভুল হয়েছে ভেবে মন্দিরে না ঢুকে আমি পিছনের দিকে এগিয়ে গেলুম। পরমানন্দ্ও এল আমার সঙ্গে। তারপর দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা পেরিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে বাগমতী নদীর জল পর্যন্ত পৌঁছেছে। নির্মল জলস্রোত চকচক করছে রৌদ্র কিরণে। অপ্রশস্ত নদী, জল কম থাকলে হেঁটেই নাকি পর পারে যাওয়া যায়। কিন্তু ডান দিকে কিছুটা দূরে একটা পুল দেখতে পাচ্ছি পথের উপরে। এই পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ছবি তুললে মনে হবে যে বাগমতী নদীর তীরেই পশুপতিনাথের মন্দির। এই ছবিই দেখেছি আমি। আমার সঙ্গে ক্যামেরা নেই, তাই ছবি তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

মন্দিরের এই শান্ত নির্জন পরিবেশটি উপভোগ করে পরমানন্দ বলল : আপনার সঙ্গে এসে এই লাভ হল।

ফিরে এসে আমরা পশুপতিনাথ দর্শন করলুম। মন্দিরের গর্ভগৃহের চারি দিকে চারটি দরজা রূপো দিয়ে মোড়া। যে রেলিঙ দিয়ে চারি দিক ঘেরা তাও রূপোর। বারান্দা সাদা মর্মর ও কালো কষ্টি পাথরের, তার ওপর রূপোর টাকা বসানো আছে। মন্দিরের ভিতরে ঢোকার নিয়ম নেই। তাই যাত্রীরা বারান্দায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেবতাকে দেখছেন। শিব এখানে আমাদের পরিচিত শিবলিঙ্গের মতো নয়, মাটি থেকে দু হাতেরও বেশি উঁচু একটি পাথরের স্তম্ভ, তার চাবিদিকে খোদাই করা চারটি মুখ, পঞ্চমটি বোধহয় উপরে ফুল-পাতায় ঢাকা পড়েছে। শিবের তো পাঁচটি মুখ, পঞ্চ বক্ত্রং ত্রিনেত্রং। পশুপতিনাথের চোখ সোনার বলে মনে হল।

এই পাঁচটি মুখ নাকি পঞ্চভূতের প্রতীক—ক্ষিতি অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি শক্তির কল্পনা করা হয়েছে শিবের পঞ্চানন মূর্তিতে। অনেকেই মনে করেন যে ভারতের মানুষ এই পঞ্চানন শিবের কল্পনা করেছিল সভ্যতার আদি যুগে। সিন্ধু সভ্যতার সময়ে তিনিই একমাত্র দেবতা রূপে জনগণের হৃদয় জুড়ে ছিলেন। তাই পরবর্তী কালে যখন বৈদিক সভ্যতা এদেশে কায়েম হল তখন তিনি অনার্যের দেবতা রূপে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই জন্যই দক্ষ তাঁর যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি এবং এই যজ্ঞ পণ্ড হবার পরেই শিব আর্য দেবতা রূপেও স্বীকৃতি লাভ করেন।

এই মন্দিরের পরিচালনা নেপাল দরবারের হাতে। তাই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। পূজারারা রক্তবস্ত্র পরিহিত। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করছেন, আর যাত্রীদের পূজা নিবেদন করে প্রসাদ দিচ্ছেন। ধূপ দীপের গন্ধ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে মন যেন অন্য জগতে চলে যাচ্ছে।

এক সময়ে আমরা নিচে নেমে চারিদিক ঘুরে দেখলুম। নন্দীর মতো ভৃঙ্গীরও মূর্তি আছে, আছে গণেশ ও ভৈরবেরও মূর্তি

বীরভদ্রের একটি অশ্লীল মূর্তি দেখলুম। মন্দিরের পিছনে একটি অপরিসর জলাশয়ে অনন্ত শয়নে নারায়ণের মূর্তিও আছে। পাশের একটি অঙ্গনে একশো আটটি শিবলিঙ্গ সাজিয়ে একটি গোলকধাঁধা তৈরি করা হয়েছে। একবার ঢুকলে এই সমস্ত শিবলিঙ্গ না দেখে বেরোবার কোন উপায় নেই। একজন যাত্রী কমণ্ডলুতে জল নিয়ে ঢুকেছিলেন, তিনি সব শিবের মাথায় জল ঢালছিলেন।

শুনতে পেলুম যে সরকারী পূজার জন্য গঙ্গাজল আসে উড়ো-জাহাজে। সেই জলে পশুপতিনাথের স্নান হয়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে পরমানন্দ্ বলল : গোপালদাদা, এখনও তো হাতে অনেক সময় আছে, চলুন না আমরা দেবীর মন্দিরটাও দেখে আসি।

আমি বললুম : হাবুলদাদের সঙ্গেও তো যেতে হবে, দুবার সেখানে যাই কেন ?

কিন্তু হাবুলদাদারা কি যাবে ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : যাবে না কেন ! যাবার জন্যেই তো আসছে !

পরমানন্দ্ একটু ইতস্তত করে বলল : বিনয়দাদার কথা জানি না, নীরা এ সব পছন্দ করে না।

বললুম : তা হলে চল, ঘুরেই আসি।

বলে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের পথটা জানতে চাইলে একজন বললেন : আপনারা তো মন্দিরে ঢুকতে পারবেন না, বাইরে থেকে আপনাদের দেখতে হবে।

পরমানন্দ্ বলল : কেন, আমরা তো হিন্দু আছি।

কিন্তু স্ত্রীলোক নন তো, গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে শুধু হিন্দু স্ত্রীলোকই যেতে পারে।

আমরা দমে গিয়ে কী করব ভাবছিলুম, এই সময়ে হাবুলদারা হৈ-

হৈ করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। হাবুলদাই কথা কইল প্রথমে, বলল ঃ কি রে, তোদের দেখা হয়ে গেল ?

পরমানন্দ বলল ঃ হ্যাঁ হাবুলদাদা, খুব ভাল লাগবে তোমাদেরও।

হাবুলদার কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝুলছিল। আমাকে বলল ঃ তোর জন্যেই ছবি নিতে হবে। কোন্ দিক থেকে ভাল ভিউ পাব বল্ তো !

তাহলে অনেকটা ঘুরে বাগমতী নদীর ওপারে যেতে হবে। তা যদি না চাও তো পাশের এই পাহাড়ের ওপরে ওঠ। ওপর থেকে সমস্ত মন্দিরটার ভিউ পাবে। ক্যামেরা নিয়ে বোধহয় ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

তোরা কিছু খেয়েছিস ? না খেয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে কিছু।

পরমানন্দ বলল ঃ আমাদের জন্যে কিছু ভেবো না হাবুলদাদা, আমরা ঠিক আছি।

নীরা নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল বিনয়ের পাশে। এইবারে হাবুলদার সঙ্গে মন্দিরে ঢুকে গেল। আমরা একটা খাবারের দোকান খুঁজে বার করে যা পেলুম, তাই দিয়েই জলযোগ করলুম তাড়াতাড়ি। ওরা বেরোলেই গুহ্যেশ্বরী মন্দির দেখতে যাব।

গুহ্যেশ্বরী মন্দির দেখা হবে কিনা, এই নিয়ে কথা উঠল হাবুলদারা বেরিয়ে আসবার পর। নীরা একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল ঃ অমন বিশ্রী নামের মন্দির আমরা দেখব না।

হাবুলদা রেগে বলল ঃ তোমার বা বিনয়ের নামটা ভাল হতে পারে, কিন্তু গোপাল বা আমার নামটা মোটেই ভাল নয়। তাই বলে কি আমাদের কোন দাবী থাকতে পারে না ! চলে আয় গোপাল, ওরা যেতে না চায়, দাঁড়িয়ে থাক এখানে। আমরা গিয়ে দেখে আসি।

তারা আগেই জেনে নিয়েছিল যে এই পথেই কিছুটা এগিয়ে গেলে দেবীর মন্দির পথের ধারেই। তারপর এই পথেই ফিরতে হবে, অন্য

পথ নেই। তাই কতকটা বিরক্ত ভাবেই নীরা সকলের আগে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আমি আর পরমানন্দ্ বসলুম সামনে।

পথ খুবই অল্প। একটা সরু নালার মতো নদীব ধার দিয়ে গ্রাম্য পথে এগিয়ে আমরা মন্দিরের দরজায় এসে নামলুম। দরজা ঠিক পথের উপরে নয়, পথের ধার থেকেই সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে। প্রায় দোতলার সমান উঠে মন্দিরের দরজা। দরজা পেরিয়ে প্রাঙ্গণ, কিন্তু এ প্রাঙ্গণ বাঁধানো নয়। চারি দিকে বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। খানিকটা এগিয়েই ছোট মন্দির। পুরুষের প্রবেশ নিষেধ বলে হাবুলদা নীরাকে এগিয়ে দিয়ে বলল: দেখে এসে ব্যাপারটা আমাদের বল।

নীরা কয়েক পা এগিয়েই আর্তনাদ করে উঠল। কী বলল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু দেখলুম যে একটা ধাড়ি বাঁদর গাছের একটা নিচু ডাল থেকে তার কাঁধের উপরে লাফিয়ে পড়েছে নিঃশব্দে। নীরা বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হাবুলদা ও বিনয় ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। একজন মহিলা তাঁর হাতে কিছু ফলমূল নিয়ে বের হচ্ছিলেন মন্দির থেকে, তিনি বললেন: এই নিন, এই ঠোঙাটা খেতে দিন ওকে।

বলে মহিলা নিজেই ঠোঙাটি বাঁদরের হাতে দিতে সে আবার লাফিয়ে গাছের ডালে উঠল। মহিলা বললেন: এখানে ওরা মায়ের প্রসাদ খেতে চায়। আপনি খালি হাতে ঢুকছেন বলেই রেগে গিয়েছিল।

না, আমি মন্দিরে ঢুকব না।

বলে নীরা পিছিয়ে এল হাবুলদার সঙ্গে।

আমি সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম: মন্দিরে কী দেখলেন?

তিনি বললেন: মায়ের মূর্তি নেই তো, শুধু একটা কুণ্ড আছে, আর তাতে জল। সেই জল আমরা মাথায় ছেটাই।

কামাখ্যার মন্দিরেও শুনেছি এই রকম। সতীর যোনি মণ্ডল

পড়েছিল সেখানে। তাই মূর্তি নেই, আছে একটি পাথরের কুণ্ড, তাতে শুধু জল। তবে সেখানে পুরুষদেরও প্রবেশের অধিকার আছে।

ট্যাক্সিতে বসে আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হল। সত্যিই কি মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই, না আমরা একটা ভুল কথা মেনে নিয়ে এলুম! এ দেশের কোন মন্দিরেই তো এ রকমের বিধিনিষেধ নেই। নেপালেই বা থাকবে কেন। ছেলে মায়ের কাছে যাবে না, এ রকম নিয়ম কি হতে পারে।

আমরা ফেরার পথ ধরেছিলুম। ট্যাক্সির ড্রাইভার কিছু বিমর্ষ ভাবে বলল: এত কম সময়ের জন্যে আপনারা আসেন যে কিছুই আপনাদেব ভাল করে দেখা হয় না, আর দেখা হলেও জানা হয় না অনেক কিছু।

আমি কৌতূহল দেখিয়ে বললুম: কী রকম?

ড্রাইভার উৎসাহ পেয়ে বলল: এই যে গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির আপনারা দেখলেন, এই দেবী কেমন করে এলেন তা কি জানতে পেরেছেন?

বললুম: না।

নেপালের রাজা প্রতাপ মল্লের সময়ে ত্রিহুত থেকে কান্তিপুরে, মানে এ দেশে এসেছিলেন এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ। রাজা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণই রাজাকে বলেছিলেন যে এই পশুপতি বনে গুপ্ত আছেন গুহ্যেশ্বরী কালী মহামায়া। মাটি খুঁড়ে রাজা প্রতাপ মল্লই দেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। আর রাজা প্রতাপ মল্ল যে এই মন্দির তৈরি করেছেন তা মন্দিরের একটা শিলালিপিতেই লেখা আছে।

এক পণ্ডিতের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি লিখেছিলেন যে একটি তান্ত্রিক যন্ত্রের আকারে নির্মিত হয়েছিল এই মন্দির। তাই একে পীঠস্থান বলা হয়েছে। গোপনীয় বলেই গুহ্যপীঠ, দেবী গুহ্যেশ্বরী। গুহেশ্বরী বা গুজেশ্বরী নয়। ইংরেজীতে অনেক সময়েই ভুল লেখা

হয়। কিন্তু এ সব কথা না বলে আমি বললুম ঃ আমাদের আর কী দেখা হল না ?

ড্রাইভার বলল ঃ পশুপতিনাথের দক্ষিণ দিকের মুখটা দেখেছেন ? সেইটে তাঁর রুদ্র মূর্তি।

পরমানন্দ আস্তে আস্তে বলল ঃ কোন্ দিকটা গোপালদাদা ?

বললুম ঃ আমরা পশ্চিম দিক থেকে ঢুকেছি, পূব দিকে বাগমতী নদী। তাহলে হিসেব করে নাও। যে দিকে বীরভদ্র আছেন, সেই দিকটাই দক্ষিণ। তারপর ?

বলে আমি ড্রাইভারের দিকে তাকালুম।

ড্রাইভার বলল ঃ মুকুন্দ সেন নামে একজন পাহাড়ী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নেপাল আক্রমণ করেছিল। পশুপতিনাথের সেই রুদ্র মূর্তি দেখে সে এমন ভয় পেয়ে গেল যে পালাবার সময় মারা পড়ল ভয়েই।

সত্যি নাকি!

তা হবে না! নেপালের রাজারা যে শিবের ভক্ত। শৈব তাঁরা। শিব তাঁদের দেখবেন না তো দেখবে কে ?

আমাদের কথায় কান ছিল না পিছনের যাত্রীদের। নীরা বিনয়ের সঙ্গে গল্প জুড়েছিল। তার বিষয় অন্য। আমরা তাদের কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলুম না।

পরমানন্দ বলল ঃ আমাদের আর কী দেখা হল না ?

ড্রাইভার বলল ঃ মন্দিরের পেছনে যে বাগমতী নদী দেখলেন তাও খুব পবিত্র। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এই নদী বয়ে এসেছে। এক দিকের পাহাড় অরণ্যময়, তার নাম মৃগস্থলী। শিব হরিণের রূপ নিয়ে এই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। অন্য দিকের তৃণাচ্ছন্ন পাহাড়ের নাম কৈলাস। আর এই দুই পাহাড়ের নিচে থেকে নদীর ঘাট আরম্ভ হয়েছে। মৃতদেহ পোড়ানো হয় এই সব ঘাটে। কাশীতে যেমন গঙ্গা, নেপালে তেমনি বাগমতী। মরবার

আগেই মুমূর্ষু মানুষকে নদীর তীরে আনা হয়। এই নদীর তীরে মৃত্যু হলে তার নিশ্চিত স্বর্গবাস। অনেক ধর্মশালা আছে এখানে। কারা থাকে জানেন ?

না।

শুধু তীর্থযাত্রী নয়, রোগী ও মরণাপন্ন যাদের আনা হয়েছে নদীর তীরে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তাদের আত্মীয়রাও থাকে এই সব ধর্মশালায়। ঘন বসতি এখানে, মন্দিরও আছে অনেকগুলি।

কী মন্দির ?

বচ্ছলা মানে বৎসলা দেবীর মন্দিরে নরবলি হত রাজা শিবদেবের সময় পর্যন্ত। নারায়ণের মন্দিরও আছে। আর আছে অনেক সমাধি। তার মধ্যে মহারাজা চন্দ্র সমশের জং বাহাদুর রাণার সমাধিই সব চেয়ে উঁচু। বাগমতার সব চেয়ে উঁচু ঘাটের নাম আর্য ঘাট, সেই ঘাটে দাহ করা হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রকে। ১৯৫৫ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে মারা গিয়েছিলেন তো, তাঁর মৃতদেহ আনা হয়েছিল এইখানে। এর নিচের ঘাটে মহারাজাদের দাহ করা হয়, তারও নিচের ঘাট জনসাধারণের জন্য।

বললুম: তাই তো হবে। রাজা মহারাজাদের সঙ্গে কি জন-সাধারণকে পোড়ানো যায়! তফাৎ তো রাখতে হবে!

কিন্তু পরমানন্দ্ বলল: তারপরেও কি কোন তফাৎ থাকে গোপালদাদা ?

হেসে বললুম: সে কথা কি কেউ জানে ভাই!

১৮

খানিকটা এগিয়েই ড্রাইভার একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরে হাবুলদাকে বলল : আপনারা বোধনাথ দর্শনে যাবেন না তো, এইখান থেকেই দেখে নিন।

নীরা চেঁচিয়ে উঠল : না না, গাড়ি থেকে আমি নামব না।

আর সে কথা শুনেই আমি নেমে পড়লুম এবং ঘুরে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কোন্ দিকে ?

ড্রাইভারও নেমে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল : ঐ তো দেখা যাচ্ছে দূরে।

খোলা মাঠ পেরিয়ে অনেকটা দূরে দেখতে পেলুম একটা বৌদ্ধ স্তূপ। গোলাকার, যেন একটা বিরাট বাটি উপুড় করা আছে। তার উপরে একটি শিখর, চূড়ায় আরও কিছু আছে। মনে হল এক জোড়া চোখ আঁকা আছে শিখরের গায়ে। কিংবা এই রকম ছবি দেখেছি বলেই এই কথা মনে হচ্ছে। এ সাঁচীর স্তূপের মতো নয়, নয় চীনের প্যাগোডার মতোও। এ নাকি নেপালের নিজস্ব স্থাপত্য রীতিতে তৈরি বৌদ্ধ চৈত্য। খোলা মাঠের মধ্যে এটি অবস্থিত বলে মনে হল।

হাবুলদা আমাকে তাড়া দিয়ে বলল : দেরি করিস না গোপাল, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, দেখতেও হবে অনেক কিছু।

আমি ছাড়া আর কেউ গাড়ি থেকে নামে নি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলুম। ড্রাইভারও উঠে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করে আমাকে বলল : বোধনাথের সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে।

কী কাহিনী ?

৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানদেব এই স্তূপটি তৈরি করেন। কেন করেন তাই নিয়েই কিংবদন্তী।

শুনি সেই কিংবদন্তী।

ড্রাইভার খুশী হয়ে বলল: মানদেবের বাপের নাম বিক্রমজিৎ। তিনি ছিলেন বুড়ানীলকণ্ঠের ভক্ত, রোজ তাঁর পূজা করতেন। বুড়া-নীলকণ্ঠ তো আপনারা দেখবেন না! খুব সুন্দর জায়গা, দেখবার মতো দেবতা। শহর থেকে সাত মাইল দূরে, যেতে হয় রাজবাড়ির পাশ দিয়ে।

পরমানন্দ বলল: আমরা যাচ্ছি না কেন?

ম্যানেজারবাবু বলেছেন, আপনাদের সময় নেই। এ বেলাতেই ভাদগাঁও দেখে ফিরতে হবে। ভাদগাঁও দেখতে অনেক সময় লাগবে।

আমি বললুম: তবে বুড়ানীলকণ্ঠের কথা শুনে নেওয়া যাক।

ড্রাইভার বলল: শিবপুরী পাহাড়ের নিচে নীলকণ্ঠ নারায়ণের মন্দির আর কুণ্ড। ধর্মদত্ত যখন বিশাল নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন একজন ভক্ত এই পাহাড়ের নিচে জলশয়ন নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাহাড়ের নাম তখন ছিল শতরুদ্র পাহাড়, আর জলশয়ন নারায়ণই বুড়ানীলকণ্ঠ। রাজা বিক্রমজিৎ এই মন্দিরেই রোজ আসতেন এবং দেখলেন, যে জলের ওপরে বুড়ানীলকণ্ঠ শুয়ে আছেন তা শুকিয়ে গেছে। জ্যোতিষীরা শুনে বললেন যে বত্রিশ গুণের অধিকারী কোন মানুষকে বলি দিলে আবার জলের ধারা বইবে। কিন্তু এত গুণ আছে শুধু রাজার ও রাজপুত্রের। তাই রাজা বুদ্ধি করে রাজপুত্রকে বললেন, ঝর্ণার ধারে কোন লোক যদি ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে থাকে তবে তাকেই বলি দেবে। পর দিন বিক্রমজিৎ সত্যিই একজনকে দেখে তাকেই বলি দিলেন। তারপর দেখলেন যে তিনিই রাজা বিক্রমজিৎ।

পরমানন্দ সবিস্ময়ে বলল: সত্যি নাকি!

আমরা তো সত্যি বলেই জানি।

আমি বললুম: তারপর কী হল?

তারপর ? অনুশোচনায় মানদেবের মন গেল ভরে। তিনি ছুটে গেলেন মণি যোগিনীর মন্দিরে এবং সেখানে তিনি আদেশ পেলেন একটি বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ করার। তাতেই তাঁর পাপ ক্ষয় হবে। এর পরেই রাজা মানদেব বুদ্ধনাথের এই স্তূপ নির্মাণ করেন। বুদ্ধনাথই এখন বোধনাথ।

পবমানন্দ্ বলল : ভারি আশ্চর্যের কথা, তাই না ?

বলে আমার দিকে চাইল। কিন্তু তার আগেই ড্রাইভার প্রশ্ন করল : বুড়ানীলকণ্ঠের নাকটা কাটল কেমন করে জানেন ?

বললুম : না।

রাজা বিক্রমজিৎ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর মূল বিগ্রহটি পাথর ও মাটির নিচে চাপা আছে, রুদ্রমতী নদীতে সেই বিগ্রহ ভেসে এসেছিল। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়েই নাকে আঘাত লাগে। এখনও এই কাটার দাগ আছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে ড্রাইভার বাঁ দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল : এই রাস্তাটা গেছে গৌচর এআরপোর্টে।

গোচারণ ক্ষেত্র থেকে যে গৌচর বা গোচর হয়েছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব কথা আমি বললুম না। শুনলুম যে নীরা বিনয়কে বলছে : দুপুরে খেয়েদেয়ে আমি টেনে একটা ঘুম দেব, তারপর সন্ধ্যা বেলায় দেখব একটা ছবি।

হাবুলদা আশ্চর্য হয়ে বলল : কাঠমাণ্ডুর আর কিছু দেখবি না ? বিকেলে তো আমাদের বড় প্রোগ্রাম !

নীরা বলল : সকালে ঘুমোতে দাওনি, দুপুরে আমাকে ঘুমোতেই হবে।

হাবুলদা গম্ভীর হয়ে বলল : হুঁ।

ড্রাইভার বলল : এই যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি, এর নাম থিমি। বালকুমারীর মন্দির, মাটির বাসন আর মুখোস তৈরির জন্যে এই গ্রামটি বিখ্যাত। কাঠমাণ্ডু শহরের বাজারে

সব্জি যায় এখান থেকে, তাই একে নেপালের সব্জিবাগানও বলে।

এর পরেই একটি পুকুর, তার নাম শুনলুম সিদ্ধ পোখরি। কেউ বলেন এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা অরিদেব মল্লের আমলের পুকুর, কেউ বলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা যক্ষ মল্লের আমলের। এই পুকুরকে সিদ্ধ পোখরি বলে কেন তা নিয়ে একটি কিংবদন্তী আছে। এক তান্ত্রিক নানা রূপ ধারণ করতে পারত। তার স্ত্রী এই ক্ষমতা দেখতে চাইলে সেই তান্ত্রিক তার স্ত্রীর হাতে মন্ত্র পড়া চাল দিয়ে বলেছিল যে তার অন্য রূপ নেবার পর সেই চাল তার গায়ে ছিটিয়ে দিলেই সে তার পূর্ব রূপ ফিরে পাবে। এই বলে তান্ত্রিক একটা ভয়ঙ্কর সাপের মূর্তি ধারণ করল, আর স্ত্রী ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। বিপদে পড়ে তান্ত্রিক এই পুকুরে আশ্রয় নিল নাগরাজ হয়ে। তাই পুকুরের নাম হল সিদ্ধ পোখরি।

এর পরেই প্রাচীন ভক্তপুরের গেট। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল। ড্রাইভার বলল: এখান থেকে পরিষ্কার দিনে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ দেখা যায়।

বলে দরবার স্কোয়ারে এসে থামল। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন পথ, তারই দুধারে ভক্তপুরের মল্ল রাজাদের শিল্প-স্থাপত্য প্রীতির অপরূপ নিদর্শন। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা গেট। রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের কাল ১৬৯৬ থেকে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই গেটের নিকটে আছে দুটি কষ্টি পাথরের মূর্তি—একটি উগ্রচণ্ডী দেবীর, আর একটি ভৈরবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। এক সময়ে এইটি ছিল রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের বসন্তপুর দরবার। তাঁর রাজপ্রাসাদে ছিল নিরানব্বইটি উঠোন। এখন সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে শ্রীপদ্মা হাইস্কুল ও মহেন্দ্র পার্ক। নিকটে আরও দুটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাজা—হনুমন্ত ভৈরব ও নরসিংহ নারায়ণের মূর্তি। এই মূর্তি সিংহ দ্বারের দু পাশে। এখন এই দরজা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে

ঢুকতে হয়। লাল বৈঠক নামে একটি প্রশস্ত ঘরে এখন চিত্রশালা স্থাপিত হয়েছে। হরি শঙ্করের মূর্তিটি দেখবার মতো সুন্দর।

সিংহদ্বার পেরিয়ে তলেজুর বিখ্যাত গোল্ডেন গেট। পার্সি ব্রাউন তাঁর পিক্‌চারাস্ক্‌ নেপাল গ্রন্থে এই গেটের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে। তাঁর মতে এটি নেপালের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম। উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি এর কারুকার্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

নেওয়ারী শিল্প স্থাপত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে হলে তলেজুর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। এটি একটি কাঠ পাথর ও ধাতুর ছোটখাট জাদুঘর। সদাশিব চকে দেখা যাবে কাঠের মূর্তি—গণেশ দুর্গা আর ভৈরবের। কুড়িটি মূর্তির মধ্যে আঠারোটিই নানা ভঙ্গিতে ভৈরবের মূর্তি। জাহাঙ্গীর বাদশাহর সমসাময়িক রাজা নরেশ মল্ল এই মূর্তিগুলির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সদাশিব ছিলেন কান্তিপুরের চরিত্রহীন রাজা, তাঁকে এই ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো পেন্টিংও আছে। রাজার তন্ত্রমন্ত্রের শক্তিও ছিল অসাধারণ। তিনি পাতাল গঙ্গার জলও তুলতে পারতেন মন্ত্রের জোরে। এখন একটি পাথর দিয়ে ঢাকা আছে সেই গর্তের মুখ। আর একটি দর্শনীয় মূর্তি হল দেবী বারাহীর পাথরের মূর্তি।

মুল চক তৈরি করেছিলেন ভক্তপুরের প্রথম মল্ল রাজা হরি সিং দেব। তাঁরই রাজত্বকালে তলেজু মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দু পাশে শ্রী ও লক্ষ্মীর সোনার মূর্তি, দরজার তালাও সোনার। তার বয়স হয়েছে পৌনে তিনশো বছর। সোনার মতো ছাদে সূর্যের আলো ঝলমল করে। রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লের নিজের হাতে তৈরি একটি চন্দন কাঠের জানালা দেখবার মতো সুন্দর।

এর পশ্চিমে কুমারী চকে আর একজন কীর্তিমান রাজা সুমতি জয়জিৎমিত্র মল্লের শিল্প ও স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় বহন করছে। এই গৃহের দরজা জানালায় কাঠের কারুকার্য এবং নানা ভঙ্গিমায় চণ্ডীর মূর্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্নানের ঘরে সাপের জড়াজড়ি

দেখে শিউরে উঠতে হয়। মিনিয়েচার চিত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখবার মতো—তাতে স্ত্রী পুরুষের শৃঙ্গার দর্পণ, হাস্য রৌদ্র করুণা প্রভৃতি নবরস এবং বিচিত্র নায়িকা বেদ। এই কুমারী চকেরই উত্তরের ঘরে আছে তিন সারি দেব দেবীর মূর্তি। মাঝের সারিতে নানা ভঙ্গিতে দেবী চণ্ডীর মহিষাসুর বধের মূর্তি। এগুলি নির্মিত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

এর পর ফিরে আসতে হবে গোল্ডেন গেটে, এই রাজ্যের শেষ রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লকে দেখবার জন্যে। একটি পাথরের স্তম্ভের উপরে পদ্মফুলের মধ্যে বসে আছেন তিনি। সোনার মূর্তি। তিনি চেয়ে আছেন তাঁর দরবার হলের দিকে। এই রকমের মূর্তি কাঠমাণ্ডুতেও আছে, কিন্তু এখানকার মতো সুন্দর বোধ হয় নয়। এই দরবার হলকে লোকে পঞ্চান্ন জানালাব হল বলে। তার কারণ এর সামনে যে ঝুলন্ত বারান্দা আছে তাতে এক সারিতেই পঞ্চান্নটি জানালা। রাজা যক্ষ মল্ল এটি নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আর সপ্তদশ শতাব্দাতে একে নূতন রূপ দেন রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল। কাঠের উপরে কারুকার্য সর্বত্র এবং ভিতরে অজস্র ফ্রেস্কো চিত্র।

এরই নিকটে রাজা রণজিৎ মল্লের প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট ঘণ্টা। এই ঘণ্টা প্রতিদিন বাজানো হয় তলেজু দেবীর পূজার সময়। পাশেই বৎসলা দেবীর মন্দির। অদূরে পশুপতিনাথেরও একটি মন্দির আছে। সে মন্দিরটি দেখতে দেবপাটনের পশুপতিনাথের মন্দিরের মতোই।

কাছাকাছি আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না দেখে নীরা দাঁড়িয়ে গেল, হাবুলদাকে বলল : আমি আর হাঁটতে পারছি না হাবুলদা।

হাবুলদা আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তাকালুম ট্যাক্সির ড্রাইভারের মুখের দিকে। সে আমাদের সঙ্গে সব কিছু দেখাতে দেখাতে আসছিল। আশ্চর্য হয়ে বলল : সে কি, সব চেয়ে ভাল মন্দিরটিই তো এখনও দেখা হয় নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, পাঁচতলা নয়তপোলা মন্দির।

নীরা বলল : আর কত দূর চলতে হবে ?

বেশি দূর নয়, একটুখানি এগোলেই দেখতে পাবেন।

তাবপর আরও কিছু বলবে তো ?

ট্যাক্সির ড্রাইভার আমার দিকে চেয়ে বলল : তার পাশেই ভৈরব মন্দির, নারায়ণ চক, চণ্ডী ভগবতী।

আমি বললুম : তারপর ?

ড্রাইভার উৎসাহ পেয়ে বলল : তারপর দক্ষিণ থেকে ফিরে ভৈরব মন্দিবে এসে নগরকোটের পথ ধরতে হবে। সেই দিকে দত্তাত্রেয় মন্দির আব ওয়াক্‌পতি নারায়ণ।

. হাবুলদা এবারে আমার অনুকরণ করে বলল : তারপর ?

চাঙ্গু নারায়ণের মন্দির কিছু দূরে। মানে ভি. এন. হাইস্কুলের সামনে দিয়ে মিউনিসিপালিটির কাছে এসে সোজা উত্তরের পথ ধরতে হবে।

নীরা বলল : তাহলে তোমরাই এ সব দেখতে যাও, আমি ফিরে যাচ্ছি।

বিনয় বলল : যে গোলকধাঁধা পথে এলাম, একা ফিরে যেতে পারবি তো!

তুমিও চল না আমার সঙ্গে!

বলে নীরা বিনয়ের শরণ নিল। কিন্তু হাবুলদা বলল : ঐ তো একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। ওটা দেখে না হয় ফিরে যাস তোরা। কী বুলিস গোপাল ?

আমি বললুম : তোমাদের যা মর্জি তাই হবে।

হাবুলদা বলল : আমি যে তোর ফটোগ্রাফারের কাজ করছি। সব চেয়ে ভাল মন্দিরের একখানা ছবি না তুলে তো ফিরতে পারছি না।

তাহলে ওখান থেকেই আমরা ফিরব।

পরমানন্দ বলল : বেলাও তো অনেক হয়েছে, আবার বেরোতে হবে দুপুরেই।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস।

তাই আমরা পূর্ব মুখে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে নয়তপোলা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। মন্দিরেব নামটা শুনেই নীরা তার মুখ বিকৃত করে এলে উঠল : এ আবার কী রকম নাম!

ড্রাইভাব বলল : নেপালী ভাষায় এই মন্দিরের নাম পাঁচতলা, ন্যতপোলা নাম নেওয়াবী ভাষায়।

বিনয় বলল : আমি ভেবেছিলাম নয়তপোলা কোন দেবতার নাম।

ড্রাইভার বলল : মন্দিরের দেবী তো সিদ্ধি লক্ষ্মী।

সিদ্ধি লক্ষ্মী!

বলে পরমানন্দ আমার মুখের দিকে তাকাতেই ড্রাইভার বলল : তান্ত্রিক দেবতা। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

পরমানন্দ তৎপর ভাবে বলল : শুনি।

রাজা ভূপতিন্দ্র মল্ল একটি তিন তলা মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে ভৈরবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্যে। ভৈরব জানেন তো? তিনি শিব নন, কিন্তু তাঁর অসীম ক্ষমতা। আর ভৈরবীও তো কালী নন, তাঁরও ক্ষমতা অসীম। তাঁরা দেবতার মতো ক্ষমতা ধরেন, খুশী থাকলে মানুষকে রক্ষা করেন সমস্ত বিপদ আপদ থেকে। তাই ভৈরবকে খুশী রাখবার জন্যেই রাজা তাঁর মন্দির তৈরি করেছিলেন।

বুঝতে পারলুম যে ভৈরব ভৈরবী সম্বন্ধে এদের ধারণা এই রকম। এ নিয়ে তর্ক করবার কিছু নেই। তাই নীরবে তার গল্প শুনতে লাগলুম।

ড্রাইভার বলে চলল : কিন্তু ভৈরব শান্ত হচ্ছেন না দেখে রাজা

চিন্তায় পড়লেন। পণ্ডিতেরা বলল যে তান্ত্রিক দেবতার প্রতিষ্ঠা করলে এই সব উপদ্রব দূর হবে। রাজা বললেন, তাই হোক। বলে তিনি মন্দির তৈরি করবার জন্যে নিজেই তিনখানা ইঁট কাঁধে করে আনলেন এইখানে। তাই দেখে প্রজারা পাঁচ দিনের মধ্যে সব কিছু সংগ্রহ করে আনল। খুব উঁচু মন্দির হবে তো, তিন তলার ওপর আরও দু তলা। তাই মজবুত করে ভিত গড়া হল। এই ভিতের ওপর অত বড় মন্দির গড়া চলবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

কেমন করে?

একজন জয়াপু মানে কৃষক তার জমিতে ধান বুনল, তারপর চারা গজালে টেনে তা তোলা গেল না, তুলতে হল কোদাল দিয়ে। সবাই বলল, ঠিক হয়েছে ভিৎ। সেই জন্যেই তো ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে এর বিশেষ কোন ক্ষতিই হয় নি!

নীরা হেসে উঠল খিল খিল করে, আর ড্রাইভার লজ্জা পেল অপরিসীম। আমি মন্দিরের স্থাপত্য দেখছিলুম মন দিয়ে, আর হাবুলদা পিছিয়ে যাচ্ছিল মন্দিরের একটা ছবি নেবার জন্যে। ভারি অদ্ভুত এই মন্দিরের গড়নটি। পথের ধার থেকে উঁচু উঁচু ভিৎ উঠেছে একের পর আর একটা। এক একটা মঞ্চের মতো ভিৎ। পাঁচটির পর একটি চতুষ্কোণ ঘর। তারই উপরে পাঁচটি তলা। প্রতি তলায় চার চালা ছাদ, ছাদে খড়ের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। সবার উপরে চূড়ামনি। সেটি কী রকমের তা উচ্চতার জন্যে বোঝা যাচ্ছে না। নিচে থেকে যে সিঁড়ি উঠেছে উপর পর্যন্ত, তার দুধারে দুটি করে মূর্তি। প্রথমে দুটি পুরুষের মূর্তি, তার উপরের মঞ্চে দুটি হাতি। তারপর দুটি শার্দুল এবং সবার উপরে এক দিকে সিংহী, বাঘিনী অন্য দিকে।

ড্রাইভার আমাকে এই সব মূর্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিল, বলল: নিচের দুই পুরুষ হল ভক্তপুরের দুই মল্লযোদ্ধা জয়মল ও পত্ত।

চিতোর গড়ের দুই বীরের কথা আমার মনে পড়ে গেল। জয়মল্ল

ও পুত্ত। সেখানে তাদেরমূর্তি আছে। মনে হল যে এখানকার দুই বীর এই নাম নিয়েছিল, অথবা বাপ মায়ে এই নাম রেখেছিল। কাজেই হিসেব করলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল জানা সহজ হবে। অর্থাৎ চিতোরের জয়মল্ল ও পুত্তের মৃত্যুর পরে যখন তাদের বীরত্বের কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এই পর্যন্ত এসেছিল, তারও অনেক পরে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। জয়মল্ল ও পুত্ত ভক্তপুরের বীর না হয়ে চিতোরের বীরও হতে পারে। কিন্তু ড্রাইভার তার বক্তব্য বলে যাচ্ছিল : এদের দশ গুণ শক্তি হাতির, তার দশ গুণ শার্দুলের এবং সিংহী ও বাঘিনীর শক্তি তারও দশ গুণ। কাজেই মন্দিরের মধ্যে যে সিদ্ধি লক্ষ্মী আছেন, তাঁর শক্তি এরও দশ গুণ বেশি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মন্দিরের দেবতা দেখতে কী রকম?

ড্রাইভার যেন আঁৎকে উঠল, বলল : ওরে বাবা, মন্দিরের মধ্যে ঢুকবে কে? ভৈরবকে শান্ত করতে পারে যে দেবী, না জানি তার রূপ কী রকম!

হাবুলদা ছবি তুলে ফিরে আসছে দেখে নীরা ফেরার পথ ধরেছিল। কিন্তু ড্রাইভার বলে উঠল : ভৈরবের মন্দির দেখবেন না?

নীরা বলল : না।

কিন্তু হাবুলদা বলল : সে কত দূরে?

এই তো ভৈরবের মন্দির।

বলে মন্দিরটি আমাদের দেখিয়ে দিতেই হাবুলদা চেঁচিয়ে বলল : একটু দাঁড়া নীরা, ভৈরবের মন্দিরটা দেখে আসছি।

আমরা এই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা জগৎজ্যোতি মল্ল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রথমে এক তলা ছিল। ১৭০৮ সালে নয়তপোলা মন্দির তৈরি হবার দশ বছর পরে আরও দুটো তলা যোগ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর এই মন্দির নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

নীরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিনয় বলল : চল, এবারে ফেরা যাক।

হাবুলদা বলল : এ লাইনে বাকি থাকল কী?

ড্রাইভার বলল : নারায়ণ চক, চণ্ডী ভগবতী, রাম মন্দির। আরও খানিকটা এগিয়ে বনের ধারে সূর্য বিনায়ক। কিন্তু বনের দিকে বলে অনেকেই সেখানে যায় না, আর যায় না বলে একটা দেখবার মতো ব্যাপার জানতে পারে না। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই ভক্তপুর শহরটার আকার একটা শঙ্খের মতো, আর হিমালয়ের বরফও দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে।

কিন্তু হাবুলদা পিছন ফিরে বলল : অনেক দেখা হয়েছে।

ড্রাইভার আমার দিকে চেয়ে বলল : অনেকেই পিকনিক করতে যায় সেখানে। ভক্তপুরের নেওয়ারীদের মধ্যে নিয়ম আছে, তারা নতুন বর কনে নিয়ে বিয়ের চার দিন পর সেখানে যাবে সবাই মিলে ফূর্তি করতে। বনের অন্য দিকে ইউনাইটেড মিশন একটা মেটার্নিটি হস্‌পিটাল তৈরি করেছে।

ফেরার পথেই এই সব কথা হচ্ছিল। ড্রাইভার বোধহয় আমাকে একজন সমঝদার ভেবেছিল। তাই আমার পাশে পাশে চলতে চলতে অনেক কিছু বলছিল : এইখান থেকেই দত্তাত্রেয়র মন্দিরে যেতে হয়। বেশি দূর নয়, দরবার স্কোয়ার থেকে আধ মাইলের মতো পথ, আর এখান থেকে খুব কাছে। একটা গাছের গুঁড়ি থেকে এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন রাজা যক্ষ মল্ল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। আর তার সংস্কার করিয়েছিলেন বিশ্ব মল্ল। শিবরাত্রির সময়ে এখানে হাজার হাজার যাত্রী আসে।

একটু থেমে বলল : এখানে আর একটি দেখবার জিনিস আছে। মন্দিরের পিছনেই পুজাহারি মঠ, সেখানে থাকেন মন্দিরের মহান্ত। সেই মঠের শিল্পকাজ দেখার মতো। বলতে কি, সেখানে এমন জানালা আছে যে সে রকম কারুকার্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা

কে জানে। মাঝখানে একটা পেখম-ধরা ময়ূর আছে বলে সাহেবরা বলে পিকক্ উইণ্ডো।'

আমি বিনয়ের মুখের দিকে চাইলুম দেখে নীরা বলল: এদের পৃথিবীটা খুব ছোট।

কিন্তু ড্রাইভার থামল না, বলল: আর একটু এগিয়ে গেলেই ওয়াকুপতি নারায়ণের মন্দির। তাতে ধাতুর কাজ।

আমার মনে হল বাকপতিকে এরা ওয়াকুপতি বলছে। কিন্তু প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না বলে আমি নীরবে রইলুম।

ড্রাইভার বলল: ছাঙ্গু নারায়ণের মন্দির ভক্তপুরের একেবারে উত্তরে দোলাগিরি পাহাড়ের ওপরে। যেতে আসতে অনেকটা সময় লাগে বলে এক বেলায় দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই মন্দিরটি খুব প্রাচীন। ৩২৫ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণু গুপ্ত, আর তার সংস্কার করেছিলেন হরিদত্ত বর্মা। লোকে বলে যে তখন নাকি এখানে লিচ্ছবি রাজাদের রাজ্য ছিল। তবে মন্দিরটি এখানকার মতোই দোতলা প্যাগোডা স্টাইলের। দেবতা হলেন বিষ্ণু ভগবান, আর গরুড়। হরিদত্ত বর্মা ছিন্নমস্তার মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিনয় তাড়া দিয়ে বলল: একটু পা চালিয়ে চল, ক্ষিধেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে।

কিন্তু ড্রাইভার আমার সঙ্গেই পা ফেলে চলল। গলার স্বর আরও নামিয়ে বলল: ভক্তপুরে একবার আসতে হয় চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ভৈরব নাথ ও ভদ্রকালীর রথযাত্রার সময়ে। ভক্তপুরের এই যাত্রা খুবই জনপ্রিয়। আট দিন ধরে এই উৎসব। তিন তলা এক রথে চড়ে বেরোবেন ভৈরব নাথ। রথের চূড়া সোনায় মোড়া। চার দিনের দিন রথ যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই পোঁতা হয় বিশ্বধ্বজা।

বিনয়ের বিরাগ দেখে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেলুম না। ড্রাইভারও আর কিছু বলবার অবকাশ পেল না। আমরা ট্যাক্সির

কাছে পৌঁছে গিয়েছিলুম এবং সবাই যে যার মতো উঠে বসলুম।

এবারে ফেরার পালা। কিন্তু তার আগে ড্রাইভার আমার দিকে চেয়ে বলল: দরবার স্কোয়ারের পূব দিকে চতুর্বর্ণ বিহার দেখাতে পারলাম না। সেখানে আছেন পদ্মপাণি লোকেশ্বর, বৌদ্ধদের কাছে তিনি দ্বিতীয় দীপঙ্কর। এই বিহারটি রাজা রায় মল্লের আমলে নির্মিত।

এইখানে চারধাম মন্দির আছে শুনেছিলুম। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করার সময় পেলুম না।

ফেরার পথে থিমি শহরটা চোখে পড়তেই ড্রাইভার বলল: ভাববেন না যে এখানে কিছু দেখবার নেই। এই জায়গার ভাল নাম হল মধ্যপুর। নববর্ষের পরের দিন বাল কুমারীর মন্দিরে একটা উৎসব হয়। তাতে বত্রিশটা রথ বেরোয়। আর চারিদিক থেকে রঙ বেরঙের পোশাক পরে লোকেরা আসে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। ভারি মজার কাণ্ড হয় একটা। তামাং নামের একটা জাত আছে এই উপত্যকায়, তাদের বিয়ে হয়। এক দিকে বরের দল, অন্য দিকে কনের দল। গান গেয়ে গেয়ে প্রশ্ন আর উত্তর দিতে হয়। কনের দল জিতলে জরিমানা দিতে হয় বরের দলকে, আর বরের দল জিতলে কনেকে পায়।

তারপর?

তারপর আর একটা মজার কথা। থিমির কাছে বোদে নামে একটা জায়গা আছে। নববর্ষের দিন সেখানে একটা উৎসব হয়। সেই উৎসবে অনেকে ছুঁচ দিয়ে দিয়ে নিজের জিভ বেঁধায়, তারপর মহালক্ষ্মীর মন্দিরে এসে ছুঁচগুলো তুলে ফেলে, আর জিভে মাখায় মন্দিরের মাটি। তাতেই সেরে যায় জিভের ক্ষত।

যারা পিছনে বসেছিল, তাদের মন ছিল না এই গল্পে। শুনছিলুম আমি আর পরমানন্দ। সে বেচারা পরম বিস্ময়ে বলল: এ আবার কেমন উৎসব।

বললুম : সময়টা আমাদের চড়ক পুজোর সময় তো! আমাদের দেশেও নানা রকম বীভৎস কাজ করে লোকে।

তাই নাকি! বলে পরমানন্দ্ নীরব হল।

ড্রাইভার বলল : একবার এক সাহেবকে এখানে এনেছিলাম দেবী ডান্স্ দেখাতে। সাহেব ছবি তুলেছিল।

কী রকম নাচ?

দেবী নাচে থাকে কালী, কুমারী, মহালক্ষ্মী, চারজন বেতাল, দুজন ভুচা আর খ্যাবও দুজন। কুমারী আর মহালক্ষ্মী উঠবে দুটো সাজানো গোজানো সিংহের ওপরে। পচ্ছিমা আর মহালিন বাজবে। তারই সঙ্গে নাচ।

কয়েকটা শব্দ আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তা জানতে চাইবার আগেই ড্রাইভার ভৈরব নাচের কথা আরম্ভ করল। তাতেই আছে ভৈরবের সঙ্গে মহাকালী ও বাবাহী, আর যারা আছে তাদের নাম শুনে চরিত্র বুঝতে পারলুম না। বাদ্য যন্ত্রের নামও ভিন্ন। এ দুটি ছাড়াও আবও অনেক রকমের নাচ আছে—নাট্টুয়া নাচ, নগচা মানে হর পার্বতীর দ্বৈত নাচ, দৈত্যের নাচ, ভালুক নাচ, বাঁদর নাচ প্রভৃতি। এই সব নাচ হয় বর্ষা কালে গায়ি যাত্রার সময়ে।

ড্রাইভারের গল্প শুনতে শুনতেই আমরা কাঠমাণ্ডু শহরে ফিরে এলুম। ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল হোটেলের দরজায়। নীরাই লাফিয়ে নামল সবার আগে, বলল : বাঁচা গেল।

হাবুলদা এই মন্তব্য শুনে রেগে বলল : তবে মরতে এখানে এসেছিলি কেন?

কিন্তু নীরা এ কথার উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করল না।

বিনয় বলল : আর ওপরে যাওয়া নয়, নিচেই মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসা যাক।

আমরা হোটেলের খাবার ঘরে চলে এলুম। তার আগে ড্রাইভার আমাকে বলল : আমিও খেয়ে আসছি।

১৭

খেতে বসে নীবা বলল : সকাল বেলায তোমবা আমাকে তাড়িযে তুললে, এ বেলায় একটু গড়িয়ে না নিলে আমি কিছুতেই বেবোতে পাবব না।

হাবুলদা বলল : কতক্ষণ গড়াতে চাস ?

না হাবুলদা, আমাকে তোমবা বাদ দাও।

এবাবে বিনয়ের দিকে চেয়ে হাবুলদা বলল : তুই ?

বিনয় বলল : এ বেলায় কী দেখতে হবে ?

হাবুলদা আমাব দিকে তাকাতে আমি বললুম : প্রথমে মিউজিয়াম—

বিনয় বলল : অনেক দেখেছি।

তারপব স্বয়ম্ভুনাথ।

নীবা বলল : দুব থেকে আমরা যা দেখছি বিনয়দা, সেই উল্টোনো বাটিব ওপরে—

বিনয় বলল : তারপব ?

বালাজু পার্ক।

পার্কও আমবা অনেক দেখেছি।

হাবুলদা তাড়াতাড়ি বলল : ফেরার আগে আমরা পাটনও দেখব।

সে আবার কী ?

ভক্তপুবেব মতো একটা পুরনো রাজধানী।

বিনয় গম্ভীব ভাবে বলল : নট্ ইন্টারেস্টেড। তাব চেয়ে ঘুমোলে অনেক আরাম পাওয়া যাবে॥

নীরা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল : বিকেলে আমরা সিনেমা দেখতে যাব।

বিনয় বলল : ও. কে.।

হাবুলদা এবারে পরমানন্দ্‌কে জিজ্ঞাসা করল : তুই কী করবি?

পরমানন্দ্‌ আম্‌তা আম্‌তা করে বলল : এতো পয়সা খরচ করে আসা হল, আর ট্যাক্সি নিয়ে যখন ঘোরাই হবে—

তখন এই দেখার সুযোগটা ছাড়া উচিত নয়। ঠিক বলেছিস। তাহলে গোপাল, তোর ফটোগ্রাফারের সঙ্গে পরমানন্দ্‌ও আছে। ও. কে., তোমরা দুজনে ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোতে পারো।

নীরা বলল : কিন্তু আনন্দ., সিনেমার আগে ফিরে এলে তুমি ভালো করতে।

পরমানন্দ্‌ বলল : সময় মতো ফিরতে পারলে ওটাও বাদ দেব না।

কাজেই ঠিক হল যে সবাই যাতে সিনেমায় যেতে পারে তার জন্যে সময় মতো ফিরে আসার চেষ্টা করা হবে। হাবুলদা বলল : গোপাল, কণ্ডাক্টেড্‌ টুরের মতো এক এক জায়গায় তোমাকে পাঁচ মিনিট করে সময় দেওয়া হল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : পাটনেও যদি পাঁচ মিনিট হয় তো ওখানে সাড়ে চার মিনিট আমি ছেড়ে দিলুম।

পরমানন্দ্‌ আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম : দরজা খুলে নেমে পড়তে যতটা সময় লাগে তা পেলেই আমার চলবে। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোমরা ফিরে এসো।

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : সে দেখা যাবে।

সুতরাং দুপুরের আহারের পর নীরা ও বিনয় ঘুমোবার জন্যে নিজেদের ঘরে গেল, আর আমরা তিনজন দেরি না করে বেরিয়ে পড়লুম। ড্রাইভার বলল : মিউজিয়ম স্বয়ম্ভুনাথ আর বালাজু এক

দিকেই। তাড়াতাড়ি দেখে নিলে বেশি সময় লাগবে না। তারপর অন্য দিকে পাটনে সময় বেশি লাগলেও তিন মাইল পথ ফিরে আসতে কয়েক মিনিট লাগবে।

হাবুলদা বলল: তাহলে হোটেলে এক কাপ করে চা খাইয়ে সিনেমার দরজায় নামিয়ে দিলেই তোমার ছুটি।

পরমানন্দ্ বলল: চা তো তোমরা সিনেমা হলে বসেও খেতে পারবে হাবুলদাদা, এই সময়টা গোপালদাদাকেই দেওয়া যাবে।

ঠিক বলেছিস।

এবাবে আমরা তিনজনেই পিছনে বসেছিলুম পাশাপাশি। ড্রাইভার বলেছিল, একজন সামনে বসলে বেশি আরাম হবে। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে রাজী হই নি। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন, তিনজনের একই গতি হোক।

পরমানন্দ্ বলল: একটা কথা জিজ্ঞেস কবব গোপালদাদা!

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগে হাবুলদা বলে উঠল: তুই ওকে দাদা বলছিস কেন রে? বয়সে তুই-ই হয়তো বড হবি।

পরমানন্দ্ বলল: বয়সটা বড় নয় হাবুলদাদা, গোপালদাদা জানে অনেক, বিদ্যেয় আমার চেয়ে অনেক বড়।

হাবুলদা এ কথার উত্তর দিতে না পেরে বলল: কী জানতে চাইছিলি বল্ এবারে।

পরমানন্দ্ বলল: কাঠমাণ্ডু তো একটা রাজধানী, এর কাছাকাছি কতগুলো বাজধানী হয়েছিল বলেছিলে?

বললুম: চারটে। কাঠমাণ্ডুতে আমরা আছি। সকালে ভক্তপুর দেখলুম, এ বেলায় পাটন বা ললিতপুর দেখব। এ ছাড়া কীর্তিপুর বলব না বানেপা তা জানি নে।

ড্রাইভার বলল: কীর্তিপুরও আছে, বানেপাও আছে। কাল সকালে দক্ষিণকালী যাবার পথে কীর্তিপুর দেখিয়ে দেব, আর বানেপা কাঠমাণ্ডু থেকে আঠারো মাইল পূবে।

আমি বললুম : এ সব জায়গাতেও বুঝি অনেক কিছু দেখবার আছে ?

ড্রাইভার বলল : নেপালে দেখবার জায়গার কোন অভাব নেই।

বলে একটি গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল : নেপাল মিউজিয়মটা আগে দেখে আসুন।

লোকটা ঠিকই বলেছিল। বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরিয়ে বেশি দূর আমাদের আসতে হয় নি। দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় স্বয়ম্ভু-নাথের মন্দিরও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জাতুঘরের ভিতরে আমরা বেশি সময় কাটালুম না। অতীত ও বর্তমানের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন খুব তাড়াতাড়ি দেখেই আমরা ফিরে এসে ট্যাক্সিতে উঠলুম। এগোলুম স্বয়ম্ভুনাথের দিকে।

ড্রাইভার বলল : কাঠমাণ্ডু নামটা হয়েছে কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে। এটা শহরেই আছে, দেখে নেবেন এক সময়ে।

হাবুলদা বলল : জিনিসটা কী ?

বড় রাস্তার ওপরেই এই কাঠের মন্দিরটি দেখতে পাবেন। লোকে গোরখনাথের মন্দির বলে। একটা গাছ কেটে এই মন্দিরটা তৈরি হয়েছিল। তার একটা গল্প আছে।

হাবুলদা বলল : একটা আজগুবি গল্প তো ! সে এখন থাক।

ড্রাইভার বলল : কাঠমাণ্ডুর পুরনো নাম হল কান্তিপুর, আর পাটনের পুরনো নাম ললিতপত্তন বা ললিতপুর। এখন যেমন সবাই ভক্তপুরকে বলে ভাদগাঁও, তেমনি কান্তিপুরকে কাঠমাণ্ডু আর ললিতপুরকে পাটন বলে। এক সময়ে পুরনো নামগুলো ভুলেই যাবে।

আমরা একটা পাহাড়ের ছায়াশীতল পাদদেশে এসে পৌঁছে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যে এর পর বোধহয় পায়ে হেঁটে আমাদের চূড়োয় উঠতে হবে স্বয়ম্ভুনাথ দেখতে। কিন্তু ড্রাইভার যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

অনেকটা উপরে উঠে এক জায়গায় সে থামল, তারপর গাড়ি থেকে নেমে বলল : এইটুকু পথ হেঁটে উঠে দেখে আসুন।

মনে হল যে প্রায় শিখরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তাই আমরা নেমে বাকি পথটা হেঁটে উঠলুম। উপরটা সমতল, তার উপরে স্বয়ম্ভুনাথের বিরাট স্তূপ ঘিরে আরও অনেক মন্দির ও ছোট ছোট স্তূপ। স্তূপটি সাদা ধবধবে, তার উপরে চতুষ্কোণ শিখর, চারি দিকে চার জোড়া চোখ ও মাঝে নাক আঁকা আছে। চারি দিকে নজর রেখেছেন দেবতা। শিখরের এই অংশকে তোরণ বলে, তার উপর চক্রাকারে চূড়ামনি। একটার পর আরেকটা চক্র বড় থেকে ছোট হয়ে অনেকটা উঠে গেছে। মনে হয় দশটি চক্রের কম হবে না। সবার উপরে যেন একটি উল্টোনো ছাতা। দূর থেকে বোধনাথের মন্দির দেখে এই রকমই মনে হয়েছিল। স্বয়ম্ভুনাথও অনেক দূর থেকে দেখা যায়। পরে জেনেছিলুম যে শহর থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব দু মাইল, আর উচ্চতা আড়াইশো ফুট। নিচে থেকে পায়ে হেঁটে উঠবার জন্যে সিঁড়ি আছে, তার দু ধারে কিছু দূরে দূরে এক এক জোড়া করে বুদ্ধমূর্তি।

এইখানে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুও ছায়ায় অধ্যয়নরত। কিন্তু মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে আমাদের মতো দর্শনার্থী নেই। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা নেমে এসে গাড়িতে উঠলুম। ড্রাইভার তার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল। এই বারে পাহাড় থেকে গড় গড় করে নামতে লাগল।

এক সময়ে বলল : সরস্বতী দেখেছেন ?

বললুম : না।

ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে বলল : আমরা তো স্বয়ম্ভুনাথকে সরস্বতী মন্দির বলি। দেখতে আসি দশমহাবিদ্যা, ইন্দ্রের বজ্র—এই সব। রাজা প্রতাপ মল্ল এই বজ্র দিয়েছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধরা বলেন, এই বজ্র ইন্দ্রের নয়, আদি বুদ্ধ তা কেড়ে নিয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছ থেকে,

আর সরস্বতীকে তারা মঞ্জুশ্রীর স্ত্রী মঞ্জুশ্বরী বলে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়।

কেন?

মঞ্জুশ্রীর দুই স্ত্রীর নাম ফুলান ও চম্পাদেবী। তিনি যখন ছোভারে পাহাড় কেটে এই কাঠমাণ্ডু উপত্যকার জল বার করে দেন, তখন তাঁর দুই স্ত্রীকে দুই পাহাড়ের ওপরে রেখে তরোয়াল দিয়ে পাহাড় কেটেছিলেন। আগে তো কাঠমাণ্ডু একটা জলাশয় ছিল, তাতে কর্কোটক নাগের বাস ছিল বলে বলত নাগহ্রদ। ছোভাবের গর্জ্ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার পরেই কাঠমাণ্ডুতে মানুষের বসতি হয়েছে।

আমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে বালাজুর পথ ধরেছিলুম।

ড্রাইভার বলল: স্তূপের গায়ে মণিচক্র দেখেছেন তো। সাহেবরা বলে প্রেয়ার হুইল্। স্তূপ প্রদক্ষিণের সময় এই মণিচক্রগুলো ঘুরিয়ে দিতে হয়।

পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করল: কেন?

ওর ভেতরে বৌদ্ধ মন্ত্র লেখা আছে—ওঁ মণিপদ্মে হুম্। কাগজের ওপর হাজার হাজার বার। একটা মণিচক্র একবার ঘোরালেই অতবার মন্ত্র জপের ফল পাওয়া যায়। সবগুলো ঘোরালে কত লক্ষ জপের ফল হয় ভাবুন!

হাবুলদা বলল: হ্যাঁ, খুব অল্প পরিশ্রমেই অনেক পুণ্য।

স্বয়ম্ভুনাথ পাহাড় থেকে নেমে ভিন্ন পথে আমরা উত্তরে ছুটলুম। দূরত্ব বোধহয় মাইল খানেক। টুরিস্ট অফিস থেকে তিন মাইল দূরে বালাজু ওয়াটার গার্ডেন। তারই নিকটে ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এরিয়া। রাজপ্রাসাদের সামনে থেকে বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরিয়েও এখানে আসা যায়। সোজা রাস্তায় খুব অল্প সময়েই আমরা বালাজুর গেটের সামনে পৌঁছে গেলুম। গাড়ি থেকে নামবার আগে ড্রাইভার বলল: বুড়ানীলকণ্ঠ তো আপনারা গেলেন না, এখানকার বুড়ানীলকণ্ঠ ভাল করে দেখবেন। একই জিনিস, তবে আকারে ছোট।

বাগানটিও দেখবেন, বাইশটি ড্র্যাগনের মুখে ঝর্ণার জল পড়ে। পাহাড়ের ঝর্ণা, পাহাড়ের নাম নাগার্জুন পাহাড়।

আমরা বাগানের ভিতরে ঢুকে গেলুম। প্রথমেই দেখলুম বুড়া-নীলকণ্ঠ। একটি চৌবাচ্চার মতো বিরাট জলাশয়, তার উপরে অনন্ত-শয়নে বিষ্ণুর মূর্তি, অনন্ত নাগের উপরে বিষ্ণু ঘুমিয়ে আছেন। এই রকমের শায়িত মূর্তি আগে কখনও দেখি নি। কেবালার ত্রিবান্দ্রমে অনন্তশযন বিষ্ণু আছেন, কিন্তু তিনি এখানকার মতো জলেব উপরে শয়ন করে নেই। নার অর্থাৎ জলের উপরে শয়ন করে আছেন বলেই বিষ্ণুর এই মূর্তির নাম নারায়ণ। কিন্তু এখানে তিনি বুড়ানীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ মহাদেবের নাম। অমৃত মন্থনের সময়ে সমুদ্রতল থেকে যে হলাহল উঠেছিল, জগতেব মঙ্গলের জন্য তাই পান করে শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এই মূর্তিকে বুড়ানীলকণ্ঠ কেন বলা হয় তা জানি নে। প্রাচীন বলেই কি বুড়া বা বৃদ্ধ? তবে প্রাচীন মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল নীলকণ্ঠ নামে একটি গ্রামে। সেই গ্রামের নামেই দেবতার নাম হয়েছে নীলকণ্ঠ এবং প্রাচীন বা বৃদ্ধ বলেই বুড়া শব্দটি এই দেবতার বিশেষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাগানটিও আমরা ঘুবে দেখে নিলুম। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তাব কবে আছে বলে বেশ শীতল পবিবেশ। ড্র্যাগনের মুখে ঝর্ণার জলও পড়ছে দেখলুম। নানা জাতের ফুল লাগিয়ে বাগানটি মনোরম করার চেষ্টা হয়েছে। এর বেশি কিছু দেখবার নেই বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আমরা আবার গাড়িতে বসলুম। এবারে আমরা সোজা পাটনে যাব দক্ষিণ দিকে। কিন্তু এবারে ড্রাইভার পুরনো পথ না ধরে বিষ্ণুমতীর পুল পেরিয়ে ওপারে এসে দক্ষিণে চলল।

পরমানন্দ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবারে বলল: আমরা তো কীর্তিপুরে যাচ্ছি না, সেখানে কী দেখবার আছে?

ড্রাইভার বলল: সেখানে যাবার সময় আপনাদের কোথায়!

গাড়ি তো পাহাড়ের ওপরে উঠবে না, আপনাদের পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে উঠতে হবে।

পরমানন্দ্ বলল : আমাদের অত সময় নেই, শখও নেই। কী দেখবার আছে তা জানতে পাবেলই আমরা সন্তুষ্ট।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস।

ড্রাইভার সহাস্যে বলল : আপনারা কীর্তিপুর বলেন, আমবা বলি নাসকাটিপুর।

সে আবার কী?

যেখানকার লোকদের সব নাক কাটা, তাকেই বলে নাসকাটিপুর।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম, এ রকম একটা বিদঘুটে নাম কেন হল!

ড্রাইভার বলল : ইতিহাসে এই গল্প আছে।

তারপরে সেই গল্প শোনাল আমাদের।

এই কীর্তিপুর জয় করতে গোর্খা রাজা পৃথ্বি নারায়ণ শাহকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমবারে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। তারপর ১৭৬৭ সালে যখন আবার আক্রমণ করলেন, তখন রাজা দনুবন্ত কাঠমাণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্লের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তিনি এলেন কীর্তিপুরের রাজাকে অপদস্থ করতে। তিনি এসেই দনুবন্তকে মেয়ে সাজিয়ে কীর্তিপুরের পথে হাঁটালেন। পৃথ্বি নারায়ণ আবার এলেন যুদ্ধ করতে। সেই যুদ্ধে তাঁব ভাইএর একটা চোখ নষ্ট হয়। তাই কীর্তিপুরের রাজা যখন সন্ধি করতে চাইলেন, তখন পৃথ্বি নারায়ণ বললেন, সন্ধি হতে পারে একটা শর্তে, সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়া আর সব পুরুষদের নাক আর জিব কাটতে হবে তাঁর ভাইএর চোখ নষ্ট করার জন্যে। উপায় নেই বলে এই শর্তেই সন্ধি করতে হল। পুরুষদের নাক আর জিব কাটা হল। তার ওজন হল এক মণ। সেই থেকেই কীর্তিপুরের নাম হল নাসকাটিপুর।

পরমানন্দ্ বলল : এই ঘটনা সত্যি নাকি গোপালদাদা?

বললুম: এ ঘটনা তো আমাদের ইতিহাসে নেই, বোধহয় নেপালের ইতিহাসে আছে। কিন্তু শহরে এখন দেখবার কিছু আছে কি?

ড্রাইভার বলল: একটা পুরনো শহর। লোকগুলো এখনও একেবারে সেকেলে পোশাক পরে। কাঠমাণ্ডুর এতো কাছে থেকেও আধুনিক হতে পারল না। সে বোধহয় যাতায়াতের অসুবিধের জন্যেই। পুরনো দরবার আছে, দুটো পাথরের হাতি। একটা হাতির ওপরে একজন যোদ্ধা, তার মাথা নেই, আর পায়ের নিচে একটা মানুষ।

কোন মন্দির মসজিদ বা বৌদ্ধ বিহার?

আছে। বাঘ ভৈরবের মন্দির আর একটা বৌদ্ধ স্তূপ। লোকে বলে সম্রাট অশোকের আমলের।

পরমানন্দ্ বলল: বাঘ ভৈরব আবার কী?

ড্রাইভার বলল: বাঘের দেবতা। কীর্তিপুরের ছেলেরা একটা মাটির বাঘ তৈরি করে বনে গিয়েছিল একটা পাতা আনতে, জিব তৈরি করবে বাঘের। কিন্তু বড়রা দেখল যে বাঘের দেবতা এসে ভর করেছে সেই মূর্তিতে। তারা তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে গিয়ে ভৈরবের মন্দিরে স্থাপন করল। সেই থেকেই বাঘ ভৈরবের মন্দির।

পরমানন্দ্‌কে হাসতে দেখে হাবুলদা বলল: তুই হাসছিস! বাঙলার সুন্দরবনে বাঘের দেবতা হল দক্ষিণ রায়। তিনি হিন্দুদের দেবতা, মুসলমানদের দেবতা হলেন হাজী সাহেব।

বাঘদের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান আছে নাকি!

পরমানন্দ্ আমার দিকে তাকাতে আমি বললুম: বাঘেরা এই দুই দেবতার প্রজা, কেউ দক্ষিণ রায়ের, কেউ হাজী সাহেবের।

ড্রাইভার বলল: কীর্তিপুরে এলে মাঘী পূর্ণিমায় আসতে হয়। ছেলে মেয়েরা তখন গোপী কৃষ্ণ সেজে মেতে ওঠে নাচ গানে।

আমি বললুম: পাটনে পৌঁছবার আগে আর একটা কথা আমাদের জানা দরকার।

কী কথা ?

বানেপার কথা। শুনেছি, সে জায়গাও এক সময়ে নাকি কোন রাজার রাজধানী ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোথাও কিছু পড়ি নি। সেখানেও নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখবার আছে।

ড্রাইভার সবিস্তারে কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল : মন্দির আছে হিন্দু ও বৌদ্ধদের। সেখানে দেখবার মতো জিনিস হল একটি সূর্যের মূর্তি, আর মাথায় মুকুট পরা একটি বুদ্ধ মূর্তি।

এবারে আমরা রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে রানী পোখরির পাশ দিয়ে বাগমতী নদীর পুল পেরিয়ে দক্ষিণে ছুটে এগোচ্ছিলুম। এক সময়ে মনে হল যে আমরা পাটনের কাছাকাছি এসে গেছি। হাবুলদা তা বুঝতে পেরে বলল : তাড়াতাড়ি এই শহরটা দেখতে পারলে ওদের কথাটাও রাখা যাবে। কী বলিস ?

হাবুলদা যে বিনয় আর নীরার কথা বলছিল তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তাই বললুম : ওদের ফেলে আসাটা বোধহয় ঠিক হয় নি।

তাহলে কি আমরাও কিছু না দেখে ঘরে বসে তাস পিটতুম ! তার চেয়ে মজঃফরপুরে বসেই তো এ কাজ করা যেত অনেক আরামে !

পরমানন্দ্ বলল : সবাইকে মানিয়ে চলা বড় মুশকিল কাজ হাবুলদাদা। বিজনেসে আমরা এই রকমই দেখতে পাই।

ড্রাইভার এসে একটি প্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল : এখানকার সরু পথঘাটে তো গাড়ি চলবে না, আপনারা পায়ে হেঁটে দেখে নিন।

ড্রাইভার বোধহয় দুপুরের রোদ দেখে গাড়ি থেকে নামতে চাইল না, কিংবা এক বেলাতেই সে তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু হাবুলদা একটুখানি এগিয়েই বলল : নীরা সঙ্গে থাকলে হতভাগা নিশ্চয়ই আসত।

পরমানন্দ্ বলল : সুন্দর মুখের জয় সব জায়গাতেই।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস।

২০

হাবুলদা ঘড়িব দিকে চেয়ে বলল : সময় আব বেশি নেই বে, যা কিছু দেখবার আছে তাড়াতাড়ি দেখতে হবে।

বললুম : একজন গাইড ধবতে না পাবলে সব কিছু তাড়াতাড়ি দেখা সম্ভব নয়। ববং এক কাজ কবা যাক। সামনেই যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই দেখে তোমবা ফিবে যাও।

আব তুই কী কববি?

আমি পরে ফিবব।

কেন, সিনেমা দেখবি না?

সত্যি বলতে কি, সিনেমা দেখতে আমাব ভাল লাগে না। বন্ধ ঘবে কিছুক্ষণ বসে থাকলেই মাথা ধবে যায়।

ঠিক এই সময়েই দেখলুম, আমাদেব ট্যাক্সিব ড্রাইভাব হন হন কবে এই দিকে আসছে, মুখে পান। হাসি হাসি মুখে বলল : আপনাবা এখানেই দাঁড়িযে আছেন! আসুন এই দিকে।

তারপবেই বলল : এই যে বাজাব দেখছেন, এর নাম মঙ্গল বাজাব। এব চাবিদিক ঘিবে আছে মন্দিব, প্যাগোডা ব্রোঞ্জেব আব পাথবেব মূর্তি, পুরনো ঘব বাড়ি। এই শহবটা মল্ল বাজাদেব আমলেব বলে ভাববেন না।

তবে?

সম্রাট অশোকের সময়ে এটা লিচ্ছবিদের শহর ছিল। ২৯৯ সালে এই শহব পত্তন কবেছিলেন রাজা বীব দেব। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক শান্তিব আশায় নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এইখানে এসে তিনি এই শহরের চার দিকে চারটি স্তূপ স্থাপন করেছিলেন,

সে সবের এখন ভগ্ন দশা। মাঝখানে যে স্তূপটি স্থাপন, করেন তার উপরে তোরণ ও চূড়ামনি ছিল।

তারপরেই বলল : আসুন, দরবার স্কোয়ারটা আগে দেখে নিন।

বলে দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখাতে লাগল। আমরা রাজা যোগনরেন্দ্র মল্লের স্ট্যাচু দেখলুম, সোনার জানালা আর তুশাহিতি নামে রাজাদের স্নানের জায়গা। তার চাবি দিকের দেওয়ালে সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম বিস্ময়কর। জল আসবার জায়গাটি আবও অপরূপ। হাবুলদা বলল : স্নানেব জলের চৌবাচ্চা যে এরকম সুন্দর হতে পারে তা ভাবা যায় না।

ড্রাইভার খুশী হয়ে বলল : কাঠমাণ্ডুব রাজবাড়িতেও নারায়ণহিতি নামে এমনি সুন্দর একটি স্নানের জায়গা আছে। অনুমতি নিয়ে তা দেখতে হয়। চলুন এবাবে মূল চক আব আর্কেয়লজিকাল গার্ডেন দেখতে।

হাবুলদা বলল : একটু তাড়াতাড়ি আমাদের ফিরতে হবে। তাই যা না দেখলে নয়, তাই দেখাও।

তবে আসুন কৃষ্ণ মন্দির দেখুন বাইরে।

বলে পথের ধারে এই সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখাল। এই মন্দিরের স্থাপত্য নেপালের অন্য মন্দিরের মতো নয়। খুব উঁচু ভিতের উপরে তিনতলা মন্দির, তাব উপরে শিখর। ছোট ছোট খিলান আছে অনেক গুলি, আর গম্বুজের মতো গোল শিখর, তার উপরে চূড়ামনি। এক নজরে রথের মতো মনে হয়।

ড্রাইভার বলল : ১৬৩০ সালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল। এর গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কাহিনী খোদাই করা আছে।

কিন্তু সে সব খুঁটিয়ে দেখার সময় আমাদের ছিল না। আমরা সরু গলি পথ ধরে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি মন্দির দেখে ফিরে এলুম। কোন্‌টা আগে আর পরে কোন্‌টা তা মনে রইল না। তবে মন্দির-

গুলো সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে গেল। হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার একটি সোনার মন্দির, এই মন্দির লোকেশ্বর বুদ্ধের। এটি নির্মিত হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে। মহাবৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে। এটি নির্মাণ করেছেন অভয়রাজ নামে এক পুরোহিত। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা মানে পোড়া মাটির কাজ দেখবার মতো। রুদ্রবর্ণ মহাবিহারও একটি বৌদ্ধবিহার, এর মধ্যেও একটি বুদ্ধ মূর্তি আছে, আর নানারকম কারুকার্য।

কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দির দেখলুম পাঁচতলা প্যাগোডা স্টাইলের। দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে তৈরি জগৎনারায়ণের মন্দির। সামনে গরুড়ের মূর্তি ও আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। এই মন্দিরটি লাল ইঁটের তৈরি।

মচ্ছেন্দ্রনাথেরও মন্দির আছে। অবলোকিতেশ্বর হলেন লাল মচ্ছেন্দ্রনাথ। তিনি নাকি এখানে ছ মাস থাকেন। একটি বড় চার-কোনা উঠোনের মাঝে এই প্যাগোডা স্টাইলের মন্দির। মূর্তির মুখের রঙ লাল, পরিধানে উজ্জ্বল রঙের বস্ত্র। মচ্ছেন্দ্রনাথের আরও একটি মন্দির আছে এখানে, কিন্তু সেটি আমরা দেখলুম না। দেখলুম মীননাথের মন্দিরও।

ড্রাইভার বলেছিল : পুরীর জগন্নাথের মতো মচ্ছেন্দ্রনাথেরও রথ-যাত্রা হয় বৈশাখ মাসে। খুব বড় উৎসব।

আমরা তখন ফিরে আসছিলুম দ্রুত পদক্ষেপে। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে হাবুলদা বিনয় ও নীরাকে সিনেমা দেখাতে পারবে বলে বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

পরমানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করল : মচ্ছেন্দ্রনাথ কোন্ দেবতা গোপালদাদা ?

কিন্তু হাবুলদাদা একটা ধমক দিয়ে বলল : এখন আর দেরি করিয়ে দিস নে পরমানন্দ্। চটপট গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়্, তারপর কথা হবে।

কিন্তু আমাদের ড্রাইভার তাতে নিরস্ত হল না। বলল : মচ্ছেন্দ্র হলেন বৌদ্ধ দেবতা। তাঁকে অবলোকিতেশ্বর বলে। গোর্খাদের দেবতা গোরক্ষনাথের নাম শুনেছেন তো?

বললুম : শুনেছি।

তিনি নেপালে এসেছিলেন মচ্ছেন্দ্রনাথের সাক্ষাতের জন্যে। যে নটা নাগ বৃষ্টিপাত করাত, গোরখনাথ সেই নাগদের ধরে ফেললেন। তাতে ভয়ঙ্কর জলকষ্ট দেখা দিল, চারি দিক শুকিয়ে গেল বৃষ্টির অভাবে। তার জন্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ রথে চেপে শোভাযাত্রা করে নেপালে এলেন। তিনি যখন পাটন থেকে চার মাইল দূরে বাগমতী নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন, তখন একটি ভৈরব কুকুরের রূপ ধরে ডেকে উঠল ভূ ভূ করে। ভূ মানে নাকি আবার জন্মাও। আর এর জন্যেই মচ্ছেন্দ্রনাথ সেখানে আটকা পড়লেন।

গাড়ির কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। উঠে বসতেই ড্রাইভার তৎপর ভাবে গাড়ি চালিয়ে দিল।

হাবুলদা ঘড়ি দেখল একবার, তারপর বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলল : অনেক দেবতার নাম শুনেছি, কিন্তু এই মচ্ছেন্দ্রনাথ কোন্ দেবতা তা জানি নে।

ড্রাইভার বলল : মাছের দেবতা মচ্ছেন্দ্র। পাটনে লাল মচ্ছেন্দ্র, আর সাদা মচ্ছেন্দ্র কাঠমাণ্ডুতে। সে মন্দিরটাও দেখে নেবেন।

পরমানন্দ বলল : এরা মাছের দেবতার ভক্ত কেন হল, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। মাছ পাওয়া যায় না বলে, না অন্য কোন কারণে—

বাধা দিয়ে হাবুলদা বলল : গোপাল কিছু বল্ না।

আমি বললুম : এখানকার সরকারী বইএও এঁর কোন পরিচয় নেই। যেমন তলেজু দেবী, তেমনি মচ্ছেন্দ্রনাথ। তলেজু ভবানীর নাম ; কিন্তু এই নামটি কেন হল, কোথা থেকে এল, বা এই শব্দটির মানে এখানে কী, এ সব কথা কোথাও নেই। কিন্তু মচ্ছেন্দ্রনাথ কে

আমি চিনতে পেরেছি মনে হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

মানুষ!

হ্যাঁ মানুষ, কিন্তু এখানে তাঁকে দেবতাব মতো ভক্তিতে পুজো করা হচ্ছে মনে হয়।

তিনি কে গোপালদাদা?

পরমানন্দের এই প্রশ্ন শুনে আমি বললুম? তুমি তো গোরখপুরের লোক, তোমার তো জানা উচিত। তিনি ছিলেন গোরখনাথের গুরু, নাথ ধর্মের আদিগুরু।

হাবুলদা বলল: ঠিক বলছিস তো?

আমি বললুম: নাথ ধর্মের কথা শোন নি? বাঙলার নাথ সাহিত্যেব কথা?

হাবুলদা বলল: প্রশ্ন করে সময় নষ্ট না করে চটপট বলে ফেল্ তো! হোটেলে পৌঁছে গেলে আর শোনা হবে না।

বললুম: মৎস্যেন্দ্রনাথ আর মীননাথ একই ব্যক্তি। বাঙলার মানুষ বলেই তিনি পরিচিত। অবশ্য অনেকে বলেন যে তিনি বাঙালী হলেও তাঁর জন্ম উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনও জায়গায়। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকলেও তিনি যে বাঙলায় বাস করতেন এবং সেখানেই অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়েছেন, তা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বাঙলায় কোন পদ বা পুঁথি রচনা করেন নি, যা পাওয়া যায় তা এক রকম মিশ্রিত হিন্দী ভাষায় লেখা এবং গোরখনাথের কর্মস্থলের সঙ্গে জড়িত। এই সব থেকে মৎস্যেন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

হাবুলদা বলল: যা জানা যায় তাই বল্।

বললুম: ইনি যাদের আদি পুরুষ সেই নাথ যোগীরা বলেন যে শিব যখন দুর্গাকে গুহ্য তত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন এই মৎস্যেন্দ্রনাথ গোপনে সব শুনেছিলেন। আর তিনি সেই ধর্মই প্রচাব

করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গোরখনাথ বা গোরক্ষনাথ। বাঙলার রাণী ময়নামতা ও তাঁর ছেলে গোপীচন্দ্র এঁরা গোরখ-নাথের শিষ্য।

হাবুলদা বলল: একজনকেই সামলাতে পারছি না, তুই আবার আরও পাঁচজনকে টেনে আনলি !

বললুম: মৎস্যেন্দ্রনাথকে জানতে হলে গোরখনাথকে আগে চিনতে হবে। তিনিই মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং তাঁকে দেবতায় পরিণত করে গেছেন।

তাহলে গোরখনাথের কথাও বল্।

বললুম: গোরখনাথ কোথাকার মানুষ তা জানা যায় না। তাঁর জন্ম বিবরণ রহস্যে আবৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই, তাঁর জন্ম নিয়ে নানা রকমের উপাখ্যান প্রচলিত হয়েছে। এই সব দেখেই পণ্ডিতরা মনে করেন যে তিনি কবারের মতো কোন অখ্যাত বংশে জাত। সেই জন্যই কোন বইএ তাঁকে ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়েছে, কোন বইএ বলা হয়েছে যে মহাদেবের জটা থেকে তাঁর জন্ম। তাঁর নামের সম্বন্ধেও একটা কাহিনী আছে। সেটা হল, কোন স্ত্রীলোক পুত্রলাভের জন্য শিবের ভস্ম ফেলেছিল গোবরের ঢিবিতে। বারো বছর পর সেই ঢিবিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই তাঁর নাম হয়েছে গোরক্ষনাথ।

সত্যি নাকি ?

হেসে বললুম: এ সব কথা কত দূর সত্য, তা কে বলতে পারে! তবে তাঁর জীবনের সম্বন্ধে যে কথা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি তা হল, তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন এবং পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হয়ে তিনিই গুরুর নাথ ধর্ম প্রচার করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নাথ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানিস ?

বললুম: যা জানি তা যৎসামান্য।

তাই বল্ না।

তাহলে এঁদের সময়টা জানা দরকার অর্থাৎ এঁরা কোন্ কালে বিদ্যমান ছিলেন। পণ্ডিতরা বলেন, এঁরা মধ্যযুগের মানুষ। কিন্তু মধ্যযুগ বললে সঠিক কোন ধারণা হয় না। মৎস্যেন্দ্রনাথের কাল নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয়েছিল কিনা জানি না, তবে গোরক্ষনাথকে কেউ অষ্টম শতাব্দীর মানুষ বলেছেন, কেউ বলেছেন ষোড়শ শতাব্দার মানুষ। এই সাত আটশো বছর খুব দীর্ঘ সময়। তবে নানা ঐতিহাসিক কারণে তাঁকে একাদশ শতাব্দীর মানুষ বলেই মনে কবা হয়। নেপালের ইতিহাস যাঁরা ভাল করে পড়েছেন, তাঁরাই এই কাল সমর্থন করতে পারবেন। তাব কারণ এই গোরক্ষনাথের সঙ্গে গোর্খা জাতির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তিনি তাদের কাছে দেবতার মতো পূজনীয়। পণ্ডিতরা মনে করেন যে গোরক্ষনাথের সবচেয়ে বড় কীর্তি নেপালের গোর্খা শহর ও গোর্খা জাতির প্রতিষ্ঠা। তাঁরই নামে যে এই নাম হয়েছে তাতে পণ্ডিতদেব মনে কোন সংশয় নেই।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস

বললুম : এখন এই নাথ ধর্ম উড়িষ্যা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আর এর প্রধান কর্মকেন্দ্র হল তোমাদের গোরখপুব।

বলে পরমানন্দের দিকে তাকাতেই সে বলল : এ যে একেবারে নতুন কথা শোনাচ্ছ গোপালদাদা!

হেসে বললুম : তোমার কাছে নতুন কথা, কিন্তু সবার কাছে নয়।

হাবুলদা জিজ্ঞাসা করল : নাথ ধর্মটা আবার কী?

বললুম : এই জন্যেই সময়টার কথা আগে বললুম। দেশে তখন তন্ত্র মন্ত্র প্রবল, তার সঙ্গে শৈবাচার হঠযোগও চলেছে। বৌদ্ধ মহাযানও পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচলিত। আবার অনেক জায়গায় সহজিয়া ধর্মপূজা এসবও চলেছে সমান তালে। আসাম থেকে নেপাল পর্যন্ত সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এই সবের সংমিশ্রণে ধর্ম এক বিচিত্র রূপ ধারণ করছিল। বাঙলায় তখন মৎস্যেন্দ্রনাথ একটা নতুন ধর্ম, মানে সাধনার

মার্গ আবিষ্কার করলেন এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই এই সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করতে লাগল।

তাদের বৈশিষ্ট্য কী?

একটা যোগী সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল। তাদের মাথায় জটা, গায়ে ছাইভস্ম, কানে কুণ্ডল বা কড়ি, গলায় কাঠের গুটি বাঁধা সুতো, বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে মল, হাতে ত্রিশূল, কাঁথা ও ঝুলি কাঁধে।

এ তো এক বিচিত্র রূপ!

এটা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রচার কবেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে পরবর্তী কালে এই রূপ হয়েছিল নাথ যোগীদেব। মৎস্যেন্দ্রনাথ গোবক্ষনাথ এঁরা তো সন্ন্যাসী ছিলেন! মনে হয় এঁদের যোগী বেশ দেখে দেখেই তাঁদের শিষ্যরা এই সব বাধ্যতামূলক কবেছিলেন।

হাবুলদা বলল: ঠিক বলেছিস।

বললুম: বাঙলায় এই সম্প্রদায়েব কাজ কী জানো? তাদের যুগী বলে, জীবিকা কাপড় বোনা কিংবা কবিবাজী। বকুল গাছকে তারা কুলবৃক্ষ বলে, আর কচু শাক তাদের বিশিষ্ট খাদ্য।

দূর, কচু শাক আবাব একটা খাদ্য!

বললুম: হাবুলদা, এ সব আমি বইএ পড়েছি। এও পড়েছি যে এদের দীক্ষা এক দিনে হয় না, তিন দিন ধরে দীক্ষা নিতে হয়।

কী রকম?

প্রথম দিন শিষ্যের চুল কেটে দেবেন গুরু নিজে, আর দ্বিতীয় দিনে তার কানে কুণ্ডল পরিয়ে দেবেন। পরের দিন হবে উপদেশী।

সে আবার কী?

প্রথমে পূজো—গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হরপার্বতীর, তারপর গোরক্ষনাথের পূজো।

মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজো নেই?

সেটাই তো মজার কথা। গোরক্ষনাথের পুজো হয়ে গেলে ভাল মদ ও মাংস খেয়ে আকাশ ভৈরবের পুজো করতে হবে। দীপ জ্বলবে সারা রাত, আর অনুষ্ঠান হবে নানা রকম। এর নাম জ্যোৎ জাগান।

পরমানন্দ্ বলল : এ সব তো দীক্ষার ব্যাপার। সাধনাটা কী রকম?

হাবুলদা বলল : তোর কি সাধনা করার ইচ্ছে নাকি?

পরমানন্দ্ একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল : গোপালদাদার কাছে দু চারটে কথা জেনে রাখি।

বললুম : আমি তো নাথপন্থী নই যে সব কথা জানি।

হাবুলদা বলল : যা জানিস তাই বল্।

নাথপন্থের তপস্যা হল হঠযোগ বা কায়াসাধন করে নিজের দেহটাকে পরম সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করে তোলার চেষ্টা। এই নাথ মার্গে গোরক্ষনাথ তন্ত্র ও রহস্যবাদকে মিলিয়েছেন। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যখন কমে আসে, সেই সময়েই এই নাথ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং গোরক্ষনাথ নিজে বৌদ্ধ হয়েও মৎস্যেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে এই ধর্ম প্রচার করায় এ একটা বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হয়েছিল সেই সময়ে। নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম ছিল, ছিল তন্ত্র মন্ত্র, তার সঙ্গে শৈবাচারও ছিল। আজ এখানে বোধনাথ স্বয়ম্ভুনাথের সঙ্গে পশুপতিনাথও সমান আদৃত। কাজেই গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথও যে দেবতায় পরিণত হয়েছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলুম। তাই দেখে বললুম : একটা মজার কথা বলি। কিছু বুঝতে না পারলেই আমরা বলি গোলকধাঁধা। এই শব্দটা কোথা থেকে এল জানো?

হাবুলদা বলল : না।

বললুম : গোরক্ষ-ধন্ধা থেকে। এটি হল সাংকেতিক ভাষায় লেখা গোরক্ষনাথের পদাবলী।

ট্যাক্সি এসে হোটেলের দরজায় থামতেই আমরা নেমে পড়লুম। ড্রাইভার বলল : আমি তাহলে অপেক্ষা করি।

হ্যাঁ।

বলে হাবুলদা ভিতরে ঢুকল। দেখলুম যে নীরা নিচে নামছে ঘিনয়ের সঙ্গে। হাবুলদা বলে উঠল : এসে গেছি আমরা।

কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার মুখ বাড়িয়ে বললেন : আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রলোক।

২১

সিনেমা দেখতে যাবাব ইচ্ছা আমাব ছিল না। তাই আমি ম্যানেজারের ঘবে ঢুকে পড়লুম। দেখলুম আমাদেব বাসের সহযাত্রী রামলাল এসেছেন। হাসি মুখে তাঁকে নমস্কাব কবে বললুম : কতক্ষণ এসেছেন ?

ভদ্রলোক বললেন : আপনাবা যে এই হোটেলে উঠেছেন তা জানতাম না তো, আমি আমাব নিজেব কাজেই এসেছিলাম। এঁর কাছে শুনলাম যে পাঁচজন বাঙালী এসে এখানে উঠেছেন। ভাবলাম, আপনারা কিনা তা দেখে যাই।

বললুম : দেখে যাবেন কেন, বসুন একটখানি, দুটো কথা বলি আপনার সঙ্গে।

বাইরে থেকে হাবুলদা আমাকে ডাকল। তাই শুনে বললুম : আসছি এখুনি।

বাইরে আসতেই হাবুলদা বলল : বিদেয় কর ভদ্রলোককে, এখনই আমাদের সিনেমায় যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে।

বললুম : আমাকে বাদ দাও হাবুলদা, বড় ক্লান্ত লাগছে আমার।

বিনয় বলল : ঠাণ্ডা ঘরে এখনই চাঙ্গা হয়ে উঠবি।

পরমানন্দ বলল : নীরা বলছে, দারুণ ছবি।

কিন্তু আমি উৎসাহ দেখালুম না দেখে হাবুলদা বলল : তোর জেদ তো খুব!

নীরার দিকে চেয়ে দেখলুম যে সে এখন সকালের চেয়েও বেশি সেজেছে। হাওয়ার মতো হালকা শাড়ি, ঝলমল করছে তাব রঙ আর পাড়। উলের কার্ডিগান একটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে, গায়ে

দেয় নি এখনও। তাই শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক যত্নে মুখের প্রসাধন করেছে, আর একটা উগ্র সৌরভ আসছে নাকে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললুম : জেদ তো তোমাদেরই বেশি দেখছি হাবুলদা, জোর করছ অন্যের ওপরে!

পরমানন্দ বলল : তবে ছেড়ে দাও হাবুলদাদা, গোপালদাদা যখন যেতে চাইছে না।

তুই থাম্ তো!

বলে হাবুলদা তাকে থামিয়ে দিল। আর এই মুহূর্তেই রামলাল বেরিয়ে এসে বললেন : আমার জন্যে আপনি এখানে বসে থাকবেন না গোপালবাবু, আপনি এঁদের সঙ্গে যান। আমি বরং অন্য সময়ে আসব।

আমি বললুম : না রামলালবাবু, আপনার জন্য আমি বসছি না। বন্ধ ঘরে সিনেমা দেখতে বসলে আমার কষ্ট হয়।

নীরা বলল : চলে এসো হাবুলদা, আর দেরি করলে সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবে।

বলে গটমট করে এগিয়ে গেল।

কেউ আমার কথা শুনছে না!

বলে হাবুলদাও সবার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম : আসুন রামলালবাবু, আমরা একটা কোনার দিকে বসে একটু চা খাই।

বলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেলুম।

আমার মুখোমুখি বসে রামলাল বললেন : আপনি আমার জন্যে গেলেন না বলে আমার খুব খারাপ লাগছে। এ রকম জানলে আমি অপেক্ষা করতাম না।

আমি হেসে বললুম : আমি যেতুম না রামলালবাবু। আপনি না থাকলে আমি অন্য কোন ছুতো করে থেকে যেতুম। আপনি তো জানেন, আমরা এখানে দুটো দিনের জন্যে এসেছি। এর পর

হয়তো আর কখনও আসাই হবে না। এখানে আমরা সিনেমা দেখব কেন। সুযোগ পেলে এখানকার আমোদ উৎসব দেখব। সে রকম সুযোগ না পেলে আপনাব কাছে তার গল্প শুনে সিনেমা দেখার চেয়ে বেশি আনন্দ পাব।

হোটেলেব ম্যানেজার নিজেই দু পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই চা খেতে খেতে আমি অনেক কথা বামলালেব কাছে জেনে নিলুম।

নেপালী ভাষার ইতিহাস আমার জানা ছিল। নেপালী গোর্খা শাসক বাজাদের ভাষা। একে গোর্খালীও বলে। গ্রিয়ার্সন সাহেব মনে করেন যে এই ভাষার সঙ্গে বাজস্থানী ভাষার সাদৃশ্য আছে। নেপালে বিভিন্ন জাতির ভোটবর্মীদের বাস আছে, তাই এই ভাষাব ওপর ভোটবর্মী প্রভাবও পড়েছে। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন একটি শিলালিপি। সেটি রাজা পুণ্যমলের আমলের। যত দূর মনে পড়ে তা ১৩৫৯ শকাব্দের। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে একজন বিদেশী নেপালী ভাষার প্রথম ব্যাকবণ বচনা করেন। ভদ্রলোকের নাম আলেকজাণ্ডাব আয়টন। কলকাতা থেকেই এই ব্যাকরণেব বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালে। কিন্তু এ সব কথা না বলে আমি রামলালকে বললুম: নেপালী ভাষা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

বামলাল বললেন: নেপালী হল নেপালের সরকারী ভাষা। আসলে এই ভাষা গোর্খালী, একে খসকুরাও বলা হয়।

খসকুরা মানে?

খসদের ভাষা। আবার অনেকে পর্বতিয়াও বলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে হিন্দীর প্রভাব আছে এর ওপরে। সাহিত্যের ওপরে তো আছেই। আর নেপালী ভাষায় স্বতন্ত্র কোন লিপি নেই তো, নাগরীতেই এই ভাষা লেখা হয়।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন: এর প্রধান কথ্য ভাষা হল

পন্না। অনেক বলেন যে কুমায়ুনী ভাষার প্রভাব আছে তার ওপর

আমি বললুম : আমার একটি কথা জানার ইচ্ছা।

বলুন।

হিন্দীর সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য কোথায় ?

রামলাল বললেন : হিন্দীতে লিঙ্গ ব্যাকরণগত, কিন্তু নেপালীতে দুটি লিঙ্গই প্রাকৃতিক। হরু বা হেরু দিয়ে বহু বচন করতে হয়। সহায়ক ক্রিয়া ছ ও হো দিয়ে।

হেসে বললুম : এই ছ বোধহয় মৈথিলী থেকে এসেছে।

রামলালও হেসে বললেন : একটি আধুনিক কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ছে—

হামী স্বতন্ত্র ছৌ
র পনি হামী কৈদ্ ছৌ

বললুম : এর মানে বোধহয়—আমি স্বাধীন, অথচ আমি কয়েদ হয়ে আছি।

ভদ্রলোক সোৎসাহে বললেন : ঠিক বলেছেন।

হেসে বললুম : এবারেতবে আপনি নেপালী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রামলাল লজ্জিত ভাবে বললেন : আমি কারবারী মানুষ, সাহিত্যের আমি কী জানি বলুন তো!

যা জানেন তাই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হবে।

ভদ্রলোক বললেন : শুনেছি এই সাহিত্য হিন্দীর মতো প্রাচীন নয়। নেপালী ভাষার প্রথম কবির নাম জানি। তাঁর নাম উদয়ানন্দ অর্জ্যাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি নেপালী ভাষায় প্রথম কবিতা লেখেন।

তারপর ?

নেপালী ভাষায় রামায়ণ রচনা হয়। কবির নাম ভানুভক্ত।

আমি শুনেছিলুম যে এই রামায়ণ বাল্মীকি অনুসরণ করে লেখা

হয় নি, লেখা হয়েছিল অধ্যাত্ম রামায়ণের ভিত্তিতে। এর রচনা কাল ১৮৭০ সাল। কিন্তু এ সব কথা বলে আমি তাঁকে বাধা দিলুম না। কিন্তু ভদ্রলোক আর কিছু বলতে পারলেন না। বললেন: পড়াশুনোর তো সময় পাই নে, মাঝে মাঝে সময় কাটাবার জন্যে যা পড়ি তা বলার মতো নয়।

বললুম: কিংবদন্তী বা লোকগাথা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

নতুন কিছু আছে বলে মনে হয় না।

কেন?

আমাদের কিংবদন্তী বলতে তো রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প, অথবা বৌদ্ধ জাতকের গল্প। হিন্দু বা বৌদ্ধ দেব দেবী নিয়েই সব গল্প তৈরি হয়েছে। গল্প তৈরির রীতি পদ্ধতিও একই রকম। লোক গাথা বা ফোক্ টেল্‌স্ বলতেও তাই। এখানকার তরাই অঞ্চলের অধিবাসী তো ভারতেরই সীমান্তের লোক। আর এই উপত্যকার অধিবাসীও কেউ বাইরে থেকে মানে ভারত থেকে এসেছে, কেউ বা হিমালয় অঞ্চলেরই অধিবাসী। হিমালয় তো শুধু নেপালের নয়, কাজেই নেপালের নিজস্ব কিছু আছে বলে মনে হয় না।

বললুম: এ আপনার বিনয়।

বেশ, তাহলে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। এ সব গল্প আপনাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে কিনা বলুন। বীরত্বের গল্প হল এই রকম— কোন বালকের পিতা মাতা শত্রুর হাতে মারা পড়েছে, বড় হয়ে সেই ছেলে কী ভাবে তার প্রতিশোধ নিল সেই গল্প। দুটি ছেলে মেয়ের দেখা হল, প্রেম হল, তারপর অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলন হল তাদের। তারপর ধূর্তের গল্প, বোকার গল্প, পশুপাখির গল্প। তবে হ্যাঁ, নেপালের পশুপাখির একটা চরিত্র আছে। যেমন শেয়াল হলে ধূর্ত, হাতি হলে মহানুভব, গণ্ডার হলে পবিত্র।

হেসে বললেন: হাতি আর গণ্ডার নেপালের জন্তু কিনা তাই। নেপালের সাধারণ মানুষ খুব দরিদ্র, তাই গল্পে সেই দরিদ্র

মানুষ হাতির পিঠে উঠতে চাইবে, বড় বাড়িতে বাস করতে চাইবে। সাধু-সন্ন্যাসীরও গল্প আছে—তারা কাউকে বর দেন, কাউকে দেন শাপ। আর মানুষেরা সরল বিশ্বাসী বলে দেখা যায় যে সন্ন্যাসীকে খুশী করতে পারলেই বর দেন তাঁরা, আর তাঁকে না মানলেই বিপদ। ছেলে-মেয়েরা ছোট বেলাতেই শেখে যে যোগীদের মান্য করতে হবে, ভক্তি করতে হবে দেবদেবীকে, সাবধান হতে হবে অনেক ব্যাপারে।

একটু থেমে বললেন : আমার মনে হয় এ রকমের গালগল্প আপনাদেরও আছে। শুধু আপনাদের কেন, বিশ্বের সব দেশেই এই সব গল্পের ধাবা কতকটা একই রকম।

বললুম : আমারও তাই মনে হয়। এবারে তাহলে আপনাদের উৎসবের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ভদ্রলোক হাসলেন আমাব কথা শুনে। বললেন : আমাকে কি আপনি সবজান্তা পেয়েছেন ?

আমিও হেসে বললুম : যতটুকু জানতে পারি, ততটুকুই তো লাভ।

রামলাল বললেন : এখানে উৎসব তো প্রায় সবই ধর্মীয়, জাতীয় উৎসব অল্পই। কিন্তু একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করবার মতো। সাধারণ মানুষ এই সব উৎসবে ধর্মনির্বিশেষে যোগ দেয়। ধর্মের গোঁড়ামি এ দেশে নেই। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো।

কী ?

এমন মাস নেই যে মাসে কোন উৎসব নেই। এমন কি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এ দেশের কোন না কোন জায়গায় একটা উৎসব আছে। কেউ যদি নেপালের উৎসব দেখতে আসেন, তাহলে তাঁকে সারা বছর সমান ব্যস্ত থাকতে হবে।

কিছু বলুন তাহলে ?

রামলাল বললেন : বৈশাখ মাস থেকেই ধরুন। পয়লা বৈশাখেই

নববর্ষের উৎসব। নেপালে বিক্রম সম্বৎ চলে। সেদিন সরকারী ছুটি নব বর্ষের উৎসব পালনের জন্যে। এব পর মাতা তীর্থ স্নান।

সেটা কী?

শিশুরা মাতা নদীতে স্নান কবে মায়েদের ফল ও মিষ্টি উপহার দেয়। যাদের মা নেই, মারা গেছে মা, তারা এই দিনটিতে নিজেদের মায়ের কথা স্মরণ করে।

বললুম: ভারি সুন্দর উৎসব তো! এই উৎসবটি বোধহয় আপনাদের একেবারেই নিজস্ব।

রামলাল বললেন: হ্যাঁ। পয়লা বৈশাখেই লাল মচ্ছেন্দ্রনাথের রথ যাত্রা হয়। তাঁকে পাটনের একটা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, এক সপ্তাহ ধবে তিনি পাটনে নানা উৎসবের মধ্যে কাটান। তারপর বুদ্ধ জয়ন্তীর উৎসব। জ্যৈষ্ঠ মাসের সীথি উৎসবটাও বোধহয় নেপালের নিজস্ব। এই উৎসব হয় বিষ্ণুমতী নদীর তীরে। সেদিন দেশের সমস্ত কুয়ো আর পুকুর পরিষ্কার করা হয়।

বললুম: এ রকম উৎসবের কথা আমি এর আগে শুনি নি।

রাজার জন্মদিনটাও খুব ধুমধাম করে পালিত হয়। রাতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে, আর বাজী পোড়ানো হয়। দশহরার উৎসবে দশ রকম কাঁচা সবজি খাওয়া হয়। এব পর ত্রিভুবন জয়ন্তী আষাঢ় মাসে। এটি নেপালের জাতীয় উৎসব।

কিছু কৌতূহল নিয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম।

তাই দেখে তিনি বললেন: স্বর্গত রাজা ত্রিভুবনের কথা তো আপনি জানেন। ১৯৫০-৫১ সালে তিনি গণ আন্দোলন পরিচালনা করে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারই স্মরণে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় সারা দেশে।

তারপর বললেন: শ্রাবণ মাসে কর্কট সংক্রান্তি, নাগপঞ্চমী, রাখীবন্ধন ও ঘণ্টাকর্ণ।

হেসে বললুম: ঘণ্টাকর্ণ আবার কী?

কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় ধান বোনা হবার পর এই উৎসব হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেরা বাঁশ আর পাতা দিয়ে সাজিয়ে চাঁদা তোলে ফুর্তির জন্যে। সেদিন জুয়া খেলার কোন বাধা নেই। ভাদ্র মাসে অনেক উৎসব। প্রথমে গাই যাত্রা। পয়লা ভাদ্র থেকে আট দিন ধরে এই উৎসব কতকটা কার্নিভালের মতো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : গাই যাত্রা?

হ্যাঁ, গরু উৎসব। যে পরিবারে কেউ মারা গেছে, সেই পরিবার থেকে একজনকে গরু সাজিয়ে পাঠাতে হবে রাজ পথে। গরুর ও নানা বিদঘুটে মুখোস পরে শোভাযাত্রা বেরোবে, নাচ গান হবে, নাটকের অভিনয় হবে খোলা আকাশের নিচে। তারপর। কৃষ্ণাষ্টমী। এই উৎসব দেখতে হয় পাটনের কৃষ্ণমন্দিরে। পঞ্চদান বা বন্দে যাত্রা বৌদ্ধ উৎসব। সেদিন বৌদ্ধ পুরোহিতরা মুড়নো মাথায় ঘরে ঘরে ভিক্ষে করতে বেরোবে ধর্ম সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে, গৃহিণীরা ঘরের বাইরে বসে থাকবে ভিক্ষে দেবার জন্যে।

তারপর?

গোকর্ণ ঔঁসি, মানে বৈশাখে যেমন মায়ের উৎসব, তেমনি ভাদ্রে বাবার। ছেলে মেয়েরা সেদিন বাবাকে মিষ্টি ও উপহার দেবে। যাদের বাবা নেই, তারা তাদের বাবাকে স্মরণ করে গোকর্ণ নদীতে স্নান করবে।

বললুম : পিতৃপক্ষের অমাবস্যায় আমাদের পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে হয়।

কতকটা সেই রকমই। আর এই ভাদ্র মাসেই মেয়েরা তিজ ব্রত করে তিন দিন ধরে। প্রথম দিন তারা পেট ভরে খায়, তারপরে উপোস করে দেবদেবীর পূজো করে নদীতে স্নান করে, আর ভজন গায়। কিন্তু ভাদ্র মাসের ইন্দ্রযাত্রাই বোধহয় সব চেয়ে জনপ্রিয়। তার কারণ হিন্দু বৌদ্ধ সবাই এই ইন্দ্রযাত্রায় যোগ দেয়।

বললুম : ইন্দ্রযাত্রা তো পৌরাণিক কাল থেকেই চলে আসছে।

গোকুলের ইন্দ্রযাত্রা বন্ধ করেছিলেন কৃষ্ণ। না, ইন্দ্র যাত্রা নয়, তাকে বোধহয় ইন্দ্রযজ্ঞ বলত।

রামলাল বললেন : এও সেই বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে নিয়েই যাত্রা। আট দিন ধরে এই উৎসব চলে। কাঠমাণ্ডুর পুরনো রাজবাড়ি হনুমান ঢোকা দেখেছেন তো?

বললুম : না।

খুব কাছেই তো, হেঁটে গিয়েই দেখে আসতে পারবেন। সেখানে একটা কাঠের পোস্ট্ পোঁতা হয় প্রথম দিনে। তারপর নানা রকমের মুখোস পরে ক্লাসিকাল নৃত্য শিল্পীরা নাচবে এইখানে। তৃতীয় দিনে তিনটি রথ বেরোবে শোভাযাত্রা করে তাতে থাকবে কুমারী গণেশ ও ভৈরব।

কুমারী?

জানেন না! কুমারী আমাদের লিভিং গডেস, সাহেবরা বলে ভেস্টাল ভার্জিন। হনুমান ঢোকায় তাঁর মন্দির আছে, বারান্দায় বেরিয়ে তিনি সবাইকে দর্শন দেন। আর এই সময়ে রথে চড়ে শোভাযাত্রা করে বেরোন। রাজাকে আমরা বিষ্ণুর অবতার ভাবি, তিনিও কুমারীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। শহরের পথে এই শোভাযাত্রা বেরোয় তিন দিন। তখন ভাল ভাল নাচ হয়—মহাকালী মহালক্ষ্মী ও দশ অবতার নাচ। এই সব নাচ হয় কুমারী মন্দিরের সামনে যে নারায়ণ মন্দির আছে, তারই চত্বরে। বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ নাকি এই দিনে নেপাল জয় করেছিলেন। হ্যাঁ, আপনাদের সবচেয়ে ভাল লাগবে কোন্ নাচ জানেন? ভৈরব আর লাখে নাচ। বিদেশীরা ছবি তুলে নিয়ে যায়।

তারপর?

রামলাল বললেন: আশ্বিন মাসে উৎসব কম—ষোল শ্রদ্ধা ও দশাইন, মানে আপনাদের দুর্গা পুজো। ষোল শ্রদ্ধা মানে পিতৃপক্ষে

ষোল দিন পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দশাইন নেপালেও একটা জাতীয় উৎসব, পনর দিন ধরে এই উৎসব চলে। দেবী, দুর্গা, ভবানী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তিতে পূজো হয়। উৎসব হয় আপনাদের মতোই।

বললুম: এবারে তাহলে কার্তিক মাসের উৎসবের কথা বলুন।

কার্তিক মাসে তিহার হল আলোর উৎসব। লক্ষ্মীপূজোর নামে ঘর বাড়ি সাজানো হয় বাতি দিয়ে। প্রথম দিন কাক তিহার। কাক হল যমের দূত, তাই কাককে খাওয়ানো হয়। তার পরদিন ভৈরবের বাহন কুকুরকে খাওয়ানো হয়। আর তৃতীয় দিনে গোমাতাকে। পঞ্চম দিনে বোনেরা ভাইকে খাওয়ায় পূজো করে। তারপর হরি বোধনী একাদশীর দিন তুলসী গাছের পূজো করা হয়। পর দিন সবাই নারায়ণ ও বুড়ানীলকণ্ঠে যায়। চার মাস শয়নের পর বিষ্ণু সেদিন জাগেন।

তারপর?

মার্গ মাসে, মানে, আপনাদের অগ্রহায়ণ মাসে, জনকপুরে সীতার বিবাহ উৎসব। আর ধান্য পূর্ণিমা আপনাদের পিঠে সংক্রান্তির মতো। পৌষ মাসে রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহর জন্মোৎসব, আর শ্বেত মচ্ছেন্দ্র স্নান।

মনে হল যে রামলাল এবারে এই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছেন। বললেন: মকর সংক্রান্তিকে আমরা মাঘ সংক্রান্তি বলি। আর বসন্ত বা শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজো। দেবপাটনে পশুপতি-নাথের মন্দিরের কাছে সরস্বতীরও মন্দির আছে। হনুমান ঢোকায় রাজা এসে বসন্তের গান শোনেন। মাঘ পূর্ণিমায় বাগমতী নদীতে স্নান। আর ফাল্গুন মাসে নেপালের রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র দিবস। তারপর মহাশিবরাত্রি ও হোলি। পশুপতিনাথে বিরাট মেলা বসে, মহাদীপ আর লক্ষদীপ জ্বলে। আর হোলির উৎসব রাজবাড়িতেও হয়।

বললুম: এর পরেই তো বছরের শেষ মাস চৈত্র!

রামলাল বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু উৎসব আছে অনেকগুলো। প্রথমেই ঘোড়া যাত্রা, মানে ঘোড়ার রেস হয়। চৈত্র দশাইনে শ্বেত মচ্ছেন্দ্রনাথের উৎসব। তারপব রামনবমী, তাবপর ভক্তপুরের বিসকেত উৎসব, মানে ভৈবব ভদ্রকালীর রথযাত্রা।

অনেক আগেই আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উৎসবের কথা শেষ হয় নি বলে তিনি উঠতে পারছিলেন না। এই বাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আপনার অনেক সময় আমি নিয়ে নিয়েছি।

বললুম : কিন্তু জানা হল তো সামান্যই।

আরও কিছু জানবাব ইচ্ছা আছে নাকি ?

গান-বাজনা, আব—

বলুন।

হিমালয়ের কথা—মুক্তিনাথ গোঁসাই কুণ্ড মাউন্ট এভাবেস্ট—যে কথা নেপালের নিজের কথা।

বামলাল বললেন : কাল বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে হনুমান ঢোকায় চলে' আসবেন, আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব।

আজ ?

আজ আমাব স্ত্রীকে নিয়ে পশুপতিনাথেব মন্দিবে যেতে হবে আরতি দেখাতে।

বলে আর অপেক্ষা করলেন না, একটা নমস্কার কবে দ্রুত পায়ে বেবিয়ে গেলেন।

২২

রামলাল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পশুপতিনাথের মন্দিরে যাচ্ছেন আরতি দেখতে। ভদ্রলোকের এই কথার সূত্র ধরে আমার মন চলে গেল অতীতে। রামেশ্বরমের কথা। রাত তখনও বেশি হয় নি। ক্লান্তির জন্যই আমরা একটু তাড়াতাড়ি শোবার উদ্যোগ করছিলুম। পাণ্ডার এক লোক এসে খবর দিল, রামেশ্বর রূপোর রথে শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছেন। কয়েকজন যাত্রী পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে এই উৎসব করাচ্ছেন।

মামা তখন শুয়েই পড়েছিলেন, মামীও মুখে পান দিয়ে শোব শোব করছিলেন। স্বাতি উঠে বসল ধড়মড় করে। মামী চমকে উঠে বললেন, যাবি নাকি এত রাত্তিরে ?

স্বাতি বলল, এত রাত কোথায় মা ?

মামা শুয়ে শুয়েই ব্যস্ত হলেন। কাজেই দরকার আমার। স্বাতি আমাকে বলল, ভয় পেলে নাকি গোপালদা ?

বললুম, ভয়-ডর থাকলে কি এত দূরে আসতুম !

মামা বললেন, কিন্তু বেশি রাত কোরো না যেন !

স্বাতি বলল, এখুনি ফিরে আসব বাবা।

তখন আমি জানতুম না যে এইভাবে বেরোবার জন্যে আমাদের আনন্দের মুহূর্তের উপরে একটা কঠিন ছেদ পড়ে যাবে।

স্বল্পালোকিত রামেশ্বরের পথ তখনও প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে আছে। একটি মন্দির নিয়ে শহর। সেই মন্দিরে যখন উৎসব, তখন শহর ঘুমোবে কোন্ লজ্জায় ! কিন্তু মন্দিরের দরজায় এসে আর এগোনো গেল না। রূপোর রথ বেরিয়েছে পথে। তার মধ্যে রামেশ্বরের সোনার

ভোগমূর্তি। ফুলে মালায় আলোয় ও সজ্জায় উজ্জ্বল রথ। পথে পুণ্যার্থীর ঠেলাঠেলি, উল্লাস আর জয়ধ্বনি। ভিড়ের তরঙ্গের ভিতরে আমরাও মিশে গেলুম। অশান্ত অবিচ্ছিন্ন এই তরঙ্গ, বেরিয়ে আসবার পথ আর রইল না।

এক সময়ে মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হল। রূপোর পাল্কিতে ব্রাহ্মণের কাঁধে চড়ে রামেশ্বর আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। যাত্রীর ধাক্কায় কী ভাবে কোথা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এলুম তা জানি নে। নিজেকে দেখবার অবকাশ পেলুম যখন বাবার শয়ন আরতি আরম্ভ হল। যাত্রীর স্রোতে তখন ভাঁটা পড়েছে। ভিড়ের ভেতর আমাদের ঠেলে দিয়েই পাণ্ডার লোক সরে পড়েছিল দেখেছিলুম। এখন স্বাতিকেও নিজের পাশে খুঁজে পেলুম না। ওধারে মেয়েরা জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়, হয়তো তাদের সঙ্গেই সে ভিড়ে গেছে। ফেরার সময় খুঁজে নিলেই হবে।

এমন শয়নারতি আমি কোথাও দেখি নি। ধূপে ধুনোয় বাদ্যে ও উদাত্ত স্বরে ভরে গেল মন্দিরের প্রাঙ্গণ। চাতালের উপরে একটু স্থান পেয়েছিলুম। একটা থামে হেলান দিয়ে দেবতার মাহাত্ম্যে সারা দিনের ক্লান্তি আমি ভুলে গেলুম।

এক সময়ে আরতি শেষ হল। ব্রাহ্মণেরা বাবার ভোগমূর্তি পার্বতীর কাছে নিয়ে চললেন। বাজনার বিরাম নেই, ত্রুটি নেই আয়োজনের, আর কৌতূহলেরও সীমা নেই সমবেত যাত্রীর। প্রাঙ্গণের একধারে দোলায়মান মঞ্চের উপরে পার্বতীর ভোগ মূর্তি বিরাজিত। ব্রাহ্মণেরা তাঁরই পাশে রামেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন।

এইটুকুর যেন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। দেবতা সারা দিন ভক্তের পুজো নিয়েছেন, পার্বতীর দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তাঁর। এইবারে কর্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নিতে এলেন পার্বতীর কাছে। দেবতারও এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কী প্রশান্ত পরিতৃপ্তি! দেহ-মন যেন জুড়িয়ে গেল।

বাদ্যভাণ্ডের প্রবল সমারোহে আমার ঘুম ভাঙল সকালে। চমকে জেগে উঠে আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। রাতে আমি মন্দিরের চাতালে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মনে পড়ল বাবার শয়নারতি দেখবার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলুম এইখানে। আরও মনে পড়ল, রাতে কেউ বা কারা যেন ঠেলাঠেলি করেছিল আমাকে জাগাবার জন্যে। ঘুমের ঘোরে তখন আমি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। তারপর স্বাতির কথা আমার মনে পড়ল। একা একা পথ চিনে সে বেচারা হয়তো ধর্মশালায় ফিরে গেছে। আর মামা মামী আমার দায়িত্ব হীনতার জন্যে নির্মম ভাবে ভর্ৎসনা করেছেন আমায়। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হল।

ব্রাহ্মণেরা তেমনি সমারোহ করে রামেশ্বরের ভোগমূর্তি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মূল মন্দিরে। যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি, এবারে আবার সারা দিন ধরে ভক্তের পূজো নেবার জন্যে তাঁকে তৈরি হতে হবে।

আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ধর্মশালার উদ্দেশে পা বাড়িয়ে দিলুম। মন্দিরে তখনও যাত্রীর ভিড় হয় নি, দু ধারের দোকানও সব বন্ধ। রাস্তায় রোদ নেই, প্রভাতের আলোর স্পর্শে অন্ধকার দূর হয়েছে মাত্র।

মোড়ের মাথায় পাণ্ডার লোকেরা আমায় ঘেরাও করে ফেলল। তাদের সম্মিলিত প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত হয়ে গেলুম। উত্তরের যেন কারও দরকার নেই, প্রশ্ন করেই তাদের কর্তব্য শেষ। আর তাদের এই সব প্রশ্নেই পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মামী অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আমাকে ঠেলে তুলেছিলেন। সলা পরামর্শে আরও কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছিল। শেষটায় মামা খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলেন পাণ্ডার বাড়ি। যে লোকটি আমাদের ডাকতে এসেছিল, তাকে ধরে আনা হয়েছিল। পাণ্ডা বিচক্ষণ লোক। নিজে

তদন্তের ভার নিয়ে মামাকে ধর্মশালায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, আশ্বস্ত হতে বলেছিলেন মামীকে। দেবতার স্থান এই বামেশ্বর। এখানে চুরি ডাকাতি গুণ্ডামি নেই, নেই পাপাচাবের ভয়।

সকালেব দিকে স্বাতিকে তারা ধর্মশালার কাছাকাছি খুঁজে পেয়েছিল। একই বাস্তায সে ঘুরে মবছিল। আমাব হদিস পায় নি কোনখানে।

ভযে কাঠ হয়ে ছিল সেই লোকটি, যে আমাদেব ভিডেব ভেতব ঠেলে দিযে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কবেছিল। সবাই এক মত হযে গেছে যে এরাবে তার বামেশ্ববেব পাট উঠল। এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাপিষ্ঠকে দেবস্থানমে থাকতে দিলে দেবতাব অসম্মান কবা হবে।

বাবান্দাতেই অপেক্ষা কবছিলেন মামা আব মামী। পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন পাণ্ডা নিজে। আমাকে দেখতে পেযে হাসি ফুটল পাণ্ডাব মুখে, মামী উঠে গেলেন ঘবেব ভিতবে।

কিন্তু বাবান্দায পা দিতেই আমাব হাত ধবে যিনি আমায ছিনিযে নিযে গেলেন, ধাক্কাটা সামলে দেখলুম যে তিনি আমাদেব কালী-ঘাটেব কালীকেষ্ট হালদাব। ঘবে টেনে এনে চাপা গলায বললেন, বাঘেব মুখে যাচ্ছেন অবলীলাক্রমে, প্রাণেব মাযা নেই এতটুকু?

বাঘেব কানেও বোধ হয সেই গর্জন পৌঁছল। বললেন, বসুন এইখানে।

তাবপব কানেব কাছে মুখ এনে ফিসফিস কবে বললেন, কোথায় ছিলেন বাত্তিবে?

পুরু ঠোঁটেব ফাঁকে তাঁব নোংবা দাঁতেব পাটিও যেন দেখতে পেযেছিলুম। কী একটা অভদ্র ইঙ্গিত। ইচ্ছে হয়েছিল, একটা চড় কষে দিই তাঁব ওই খোঁচা দাড়িওয়ালা ফুলো গালে।

তাবপব তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সে সব কথা মনে রাখবাব মতো নয়। মেঝেব উপবেই আমি শুয়ে পড়েছিলুম। তাবপর মামা-মামীব সঙ্গে স্বাতি বেরিয়ে যাবাব পব তিনি দরজাটা

ভেজিয়ে দিয়ে আমার কাছে ঘনিয়ে বসেছিলেন, গলাটা নামিয়ে বলেছিলেন, ছেলেমানুষি করে নিজের ইহকালটি ঝরঝরে করলেন। অমন পয়সাওয়ালা মামা। কোথায় আখের গুছোবেন, তা নয় সুন্দর মুখ দেখেই সব ভুললেন! ভদ্রলোক দুঃখ করে বলছিলেন, ওই একটি মাত্র মেয়ে, সেও পর হয়ে যাচ্ছে অঘ্রান মাসে। ইচ্ছে ছিল, ভাগনেকে নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে কাছে রাখবেন, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া সে কথা বুঝল না।

তারপর মাথাটা একটু নামিয়ে বলেছিলেন, আরে মশাই, নিজের ভবিষ্যৎটা আগে গুছিয়ে নিন। সঙ্গতি থাকলে মেয়ে অনেক জুটবে বাঙলা দেশে!

কী ইতর অভদ্র ইঙ্গিত! ইচ্ছে হল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সত্যিই একটা চড় কষে দিই। কিন্তু কী আশ্চর্য! খোলা বিস্কুটের মতো মিইয়ে গেছে মনের ভিতরটা। যেমন শুয়েছিলুম, তেমনি শুয়ে রইলুম।

হালদার মশাই মুখটা আরও নিচু করে বললেন, পাত্রের খবর রাখেন কোন?

তাতে আমার প্রয়োজন নেই।

কথাটা বুড়ো চেপে গেলেন। কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে কোথায় একটু গণ্ডগোল আছে। বিলেত ফেরতা সাহেব পাত্তর, দেহে বোধহয় মেমের গন্ধ এখনও লেগে আছে। গায়ের জোরে বিয়ে পাকা করছেন বুড়ি নিজে, কিন্তু বুড়োর কোথায় খচখচ করছে।

আমি চোখ বুঁজেছিলুম কড়া করে, হালদার না থামলে আর চোখ খুলব না। কিন্তু তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, কী মশাই, ঘুমুলেন না কি?

আমি কোন সাড়া দিলুম না। বুঝতে পারলুম যে ভদ্রলোক এবারে উঠে প্রাতঃকৃত্যে যাবার আয়োজন করছেন। বেরিয়ে যাবার আগে আর একটা কদর্য ইঙ্গিত করে গেলেন, সারা রাত্তির রাসলীলা করেছেন কেষ্ট ঠাকুর, ঘুমের আর দোষ কী!

মাদুরায় মামা আমাকে বলেছিলেন, কাজটা ভাল কর নি। দুদিন বাদে বিয়ে করে সংসারী হবে, ছেলে বউ নিয়ে রথ যাত্রার মেলা দেখতে গিয়ে তাদের হারিয়ে এলে তো চলবে না!

একটু থেমে বলেছিলেন, তোমার মামী যত আঘাত পেয়েছেন, ভয় পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি। ধর্মশালায় কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে দেখলুম। ধর্মের নামে অধর্ম করে হাত পাকিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া মন্ত্রের নামে নিন্দে ছড়ায়, আর পরচর্চা করে ধর্মসভায়। দেশে ফিরলে যে দুর্যোগ আসবে, তাই ভেবেই মরে যাচ্ছেন তোমার মামী।

তারপর বলেছিলেন, দেশের রুচি জানো তো আজকাল? নীতি বাক্য কেউ শোনে না, দুর্নীতির গল্প শুনতে আসে ভিড় করে। পাড়ায় কীর্তন হবে শুনলে পুলিসে খবর দেয়, আর বিড়ির বিজ্ঞাপন নিয়ে মেয়ে বেরিয়েছে শুনলে বড় রাস্তাতেও গাড়ি আটকে যায়। এ দেশে মুখরোচক মিথ্যে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই তোমার মামীর এই ভাবনা।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম এই কথা শুনে। কিন্তু পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মামা বলেছিলেন, নেভার মাইণ্ড, মাই বয়। আমি তোমার নিন্দে করি না। তবে তোমার মামীকে একটু সমঝে চোলো।

কিন্তু স্বাতির আচরণে আমি কোন ভয় দেখতে পাই নি। বরং সে যেন আরও নির্ভয় হয়ে উঠেছিল। কন্যাকুমারীর কথা আমার মনে পড়ে গেল।

রাতে ধর্মশালার ঘরে আমার মন টিঁকছিল না। বাইরে পথে প্রাঙ্গণে দেওয়ালে আর জলে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছিল। কী অনাবিল উদার মুক্তি! কন্যাকুমারীর মন্দিরে উৎসব তখন শুরু হয়েছে, তার শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোলের শব্দ পাচ্ছি অবিশ্রান্ত ভাবে। পাইপে ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে মামা বলেছিলেন, যাবে?

মৌন থেকেই আমি যাবার অনুমতি পেয়েছিলুম। পাশের ঘর

থেকে স্বাতি কটাক্ষে দেখেছিল আমাকে। যেন দেখতে পায় নি, এমনি ভাব করেই সে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

পথে বেরিয়ে ভাবলুম, এ কোন্ ছল স্বাতির! তার সমস্ত সাহস আর দর্প কি আজ এইখানে এসে এমনি পরিবেশের ভিতরেই নিঃশেষ হয়ে গেল! মায়ের শাসনই শেষে বড় হল তার কাছে!

মন্দিরের দিকে আমার পা গেল না, মন টেনেছে যে রাক্ষসী পা দুটো সেই দিকেই গেল। একটি সরু পথে বালি আব পাথর ডিঙিয়ে জল আর ফেনা বাঁচিয়ে একখানা পাথরের উপরে উঠে বসলুম। জীবনে এমন রূপ দেখি নি প্রকৃতির।

জলের শেষ নেই চোখের সামনে। ঢেউএরও শেষ নেই। একটাব পর একটা ঢেউ এসে পায়ের উপবে আছড়ে পড়ছে। চতুর্দশীর চাঁদেব আলোয় এখানে ওখানে তরঙ্গ বিক্ষোভের উপবে ঝিকমিক করছে চন্দ্র কিরণ। সমুদ্রেব গর্জন শোনা যাচ্ছে একটানা ।ববামহীন বৈচিত্র্য হীন। ঝড়েব মতো বাতাস বইছে, বিত্রস্ত বিপর্যস্ত করে যাচ্ছে মাথার চুল আব জামা কাপড়।

পূর্ব দিকে মন্দিরের দেওয়াল উঠেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে। ক্রমে সেই জমি সরু হয়ে সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে একেই বলে ল্যাণ্ড্স্ এণ্ড। হিমালয়ে যে মাটির আরম্ভ, কন্যা-কুমারীতে সেই মাটির শেষ।

খানিকটা জল পেরিয়ে দুটো পাহাড় অন্ধকার জড়ো করে আছে। নিচু নিচু মাথা কাটা পাহাড়। চারিদিকের ঢেউ এসে অবিরাম আক্রমণ করছে তাদের। জব্বলপুরের মার্বেল পাথর হলে এত দিনে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যেত। এই পাহাড়ের নাম বিবেকানন্দ রক্স্। বিবেকানন্দের মতোই অটল আর অক্ষয়।

আমি যখন বিবেকানন্দর কথা ভাবছিলুম তখন কে একজন এসে আমার পাশে বসেছিল। হয়তো আমার মতোই এক পাগল। আমার ধ্যান ভাঙল তার আঁচলের স্পর্শে। চুলের সৌরভ আসছিল

অল্প অল্প। আর আঁচল সামলাবার চেষ্টা দেখলুম তাব চুড়ির শব্দে। স্বাতি নাকি!

হ্যাঁ, স্বাতিই তো। বলল: কী ভাবছ অমন গভীব ভাবে?

কী ভাবছি?

তোমাব মন আজ কোন্ রাজ্যে বল তো!

বললুম, একা বেবিযে এসেছ তুমি, অনুমতি পেযেছ তো?

স্বাতি হেসে বলল, অনুমতি। না পেয়ে আদেশ অমান্য করার চেযে না চাওযাই তো ভাল। নিজেব কর্তব্য যেখানে স্থির কবতে পাবি নে, সেখানেই অনুমতিব দবকার।

চিন্তিত ভাবে আমি বলেছিলুম, তাবপব?

দোহাই তোমার, অত ভাবতে পারছি নে আজ।

একটানা গর্জন কবছে সমুদ্র, পাযেব নিচে আছডে পড়ছে ঢেউএর পব ঢেউ। বাতাসে তাব আঁচল উডছে, আব আকাশে আলোব প্লাবন। স্বাতি বলল, কী ভাবছ বললে না তো!

বললুম, ভাবনাব কথা থাক। তুমি কেন এলে তাই বল।

সে কথাও থাক।

একটা বড ঢেউ এসে আছডে পডল। ফেনা আব জল ছিটকে এল উপরে। বললুম, সেদিন গভীব অপবাধ হযেছে আমাব।

স্বাতি দৃঢ স্বরে বলল, অপবাধ কিসেব?

বললুম, তোমাকে মন্দিবে এনে হারিযে ফেললুম, সে অপবাধ নয়?

স্বাতি বলল, বামেশ্ববেব মন্দিব প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েও কি তোমার দায়িত্ব ফুবোবে না? এ যদি অপরাধ হয তো এই অপবাধই জীবনে সত্য হয়ে উঠুক।

সংকল্পেব দৃঢতা দেখলুম তাব কণ্ঠস্বরে। বললুম, তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দিই। এই সাহস তোমাকে মহৎ কববে। কিন্তু সেদিন আমার বুক শুকিয়ে উঠেছিল ভয়ে। দাযিত্ব নেবার প্রয়োজন হয় নি জীবনে, কাঁটাব মতো বিঁধেছে সেই ব্যর্থতা।

দূরে গর্জে উঠেছিল দুরন্ত সাগর। আর স্বাতি বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কত! তুমি স্বাধীন, তোমার স্বাধীনতায় কেউ কখনও হাত দেবে না।

হেসে বলেছিলুম, সত্যি। নটা কুড়ির লোকালে হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে আসব কলকাতায়, বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ডাল-হৌসি স্কোয়ার। দশটা-পাঁচটা কলম পিষে আবার সেই পাঁচটা তিরিশের লোকাল। কী সুন্দর স্বাধীনতা!

স্বাতি বলেছিল, সেও আমার চেয়ে ভাল। মনের ওপর চাপ না পড়লে তাকে স্বাধীনতাই বলব। ইংরেজের জেলে বন্দী ছিলেন মহাত্মাজী, তাঁর স্বাধীনতা তাতে কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নি।

বলেছিলুম, তোমাকে পরাধীন করল কে?

গভীর ভাবে স্বাতি বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে সব মেয়েই করে। আমিও ভয় পাই নে বিয়ে করতে। বিয়ে তো মানুষের সঙ্গেই হয়। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে হবে যে লোককে, তাকে আমি মানুষ ভাবি নে।

আমি দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রশ্ন জানিয়েছিলুম। আর স্বাতি বলেছিল, লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে, মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাহেবিআনা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে বান্ধবীর, আর সে প্রযোজনটাও নিতান্ত জৈব। এক দিন মনে হয়েছিল, তার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে রামখেলাওনের সঙ্গে ইলোপ করাও সহজ হবে আমার কাছে।

মানুষের মনের উপরে জোর খাটে মনেরই। তাই মুখে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার হয় নি। স্বাতি বলেছিল, কন্যাকুমারীর সান্ত্বনা ছিল অন্যখানে। শিব তাঁকে গ্রহণ করেন নি সত্যি, কিন্তু গ্রহণ করে প্রবঞ্চনা করেন নি। প্রত্যাখ্যানের আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু প্রবঞ্চনার পরিতাপ ছিল না।

এত জল, এত আলো, এমন আকাশ, এমন উদার অসীম পরিবেশেও

স্বাতি হারাতে পারে নি নিজেকে, বলেছিল, একটা অনুরোধ আ
তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছো
কোরো না।

বলেছিলুম, আমি কী ভাবছি জানো? ভাবছি, এই দিনগুলে
আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।—

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মূরতি।

২৩

হোটেলের ডাইনিং হলে একটা টেবলের উপরে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সিনেমা দেখে ফিরে এসে হাবুলদা আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ঃ খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়িস নি কেন!

এ কথা'র উত্তর আমি দিই নি।

হাবুলদা বলল ঃ আর দেরি না করে খেয়ে নে সবাই। কাল আবার সকাল সকাল বেরোতে হবে। কাল তো দূরের যাত্রা।

খেতে বসে নীরা বলেছিল ঃ ছবিটা দারুণ। তাই না বিনয়দা?

বিনয় বলল ঃ ইংরেজী বইএর মতো নয়।

কিন্তু নীরা বলল ঃ হিরোইন দারুণ পার্ট করেছে! লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সমস্ত গুণ্ডাগুলোকে তাড়াল! মেয়েরা যে এই রকম ফাইট দিতে পারে তা এই প্রথম দেখলাম।

পরমানন্দ্ বলল ঃ তা না হলে হিরো তো খতম হয়ে যেত!

হাবুলদা বলল ঃ হিরো খতম হলে ছবিও খতম। ট্র্যাজেডি দেখবে কে!

বিনয় বলল ঃ বম্বে ফিল্মের নাচগানগুলো গ্র্যাণ্ড্ হয়।

নীরা বলল ঃ গ্র্যাণ্ড্ বলছ কেন, বল ফ্যান্টাস্টিক। একটা গানেই যা খরচ করে, তাতে একখানা গোটা বাঙলা ছবি তোলে কলকাতায়।

বিনয় বলল ঃ রাবিশ! ঐ সব প্যানপেনে বাঙলা ছবি আবার ভদ্রলোকে দেখে!

কিন্তু পরমানন্দ্ বলল ঃ কিন্তু বিনয়দাদা, আমি শুনেছি যে প্রাইজ ট্রাইজ গুলো বাঙলা ছবিই পায়।

হাবুলদা হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলল: তুই কোন কথা বলছিস না যে গোপাল!

বললুম: যা জানি নে তা নিয়ে আমি কী বলব!

হাবুলদা বলল: হ্যাঁ, ঘুমে খুব কাতর হয়ে পড়েছিস দেখছি। ভেবেছিলাম তোর কাছে নেপালের আরও কিছু কথা শুনব, কিন্তু না। তোরা শুয়ে পড়্ তাড়াতাড়ি। কাল পথে যেতে যেতে শুনব।

রাত বেশি হয় নি। তবু আমরা যে যার ঘরে গিয়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু ঘুম আমার আসছিল না। ঘুরে ফিরে স্বাতির কথাই আমার মনে পড়ছিল। মনে হল সে একেবারে অন্য জাতের মেয়ে। তার মতো মেয়ে কি আমি আজও দেখেছি!

নীরার সঙ্গে তার তফাৎটাই আজ আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ এই মুহূর্তে নীরাকেই আমার বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, আর স্বাতিকে মনে হচ্ছে কল্পনার জগতের মানুষ। তাই সে আমার মতো করে বলতে পারে নি, আজকের এই স্মৃতি আমাদের অক্ষয় হয়ে রইল। তাই সে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছিল, ভুল। এ হচ্ছে দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা। তোমার কবি বলেছেন, হেথা মোর তিলে তিলে দান। কিন্তু তুমিই বল, হৃদয় কি তিলে তিলে দেবার জিনিস, না দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়!

একটু থেমে বলেছিল, এই জন্যেই ব্রাউনিংকে আমার ভাল লাগে। বলিষ্ঠ মনের ইঙ্গিত আছে তাঁর লেখায়। পরম পাওয়ার মুহূর্তকে ধরে রাখবার জন্যে পরফিরিয়াকে হত্যা করেছে তার লাভার।

বলেছিলুম, কাব্যে আর জীবনে তফাৎ আছে স্বাতি। আঙুর টক বলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দের মুহূর্তকে চিরন্তন করবার জন্যে প্রিয়ার গলায় চুল জড়িয়ে তাকে হত্যা করা যায় না।

স্বাতি বলেছিল, তোমাকে মানতে হবে যে আনন্দের মুহূর্তকে ধরে রাখবার চেষ্টাতেই আছে পৌরুষ।

বাতাস তখন বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। অসভ্যের মতো খেলা করছিল স্বাতির আঁচল আর চুলের সঙ্গে। কাছে দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ, আর তার নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর গর্জন। অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি বলেছিল, Who knows but the world may end to night ?

আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না তা কে জানে !

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছিল নক্ষত্রের নৃত্য সভা। নিচে আমরা দুজন। এমন পরিপূর্ণতাব মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতার আভাস পাচ্ছিলুম। মুখে উত্তর এসেছিল, পূর্ণিমার আরও একটি দিন বাকি। আজই সব কিছুর শেষ চেয়ো না।

এর চেয়ে কাছাকাছি আমরা আসতে পারি নি, আর যা বলতে চেয়েছিলাম তা তো আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি নি। মনে হল, সে চেষ্টা করলে সমুদ্রেব মতো অসভ্য মনে হত নিজেদের। দেহেব মতোই মনটাকেও বোধহয় নিবাবরণ করা যায় না, দ্বিধা সঙ্কোচ লজ্জা এসে বাধা দেয় প্রাত মুহূর্তে। সেই রুদ্ধ অব্যক্ত অনুভূতির জন্য যন্ত্রণা ও বেদনাবোধ আছে, কিন্তু তাব প্রতিধ্বনি শুনতে পেলে এক অনাস্বাদিত আনন্দে সেই যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম ঘটে। আমার মনে হয়েছিল যে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, স্বাতি তা বুঝতে পেরেছিল, মেনে নিয়েছিল আমাব কথা।

তার বিলেত ফেরৎ পাণিপ্রার্থীকে সে কী ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিল তা জানতে পারি নি। সে কথা জেনেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি তাকে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে বলেই ভয় হয়েছিল। আরও একটা কথা আমি স্বাতির কাছে স্পষ্ট করে বুঝে নিতে পারি নি। সে বলেছিল, রামেশ্বরেব মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েও কি তোমার দায়িত্ব ফুরোবে না ? এ যদি অপরাধ হয় তো এই অপরাধই জীবনে সত্য হয় উঠুক। তার এই উক্তি আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল এ কথার অর্থ আমি

জেনে নিই। কিন্তু সেই দ্বিধা, সেই সঙ্কোচ, সেই লজ্জা। তাই বলেছিলুম, তোমার সাহসকে আমি ধন্যবাদ দিই।

আমি বঞ্চনা করেছিলুম নিজেকে। জীবনে যা সত্য হয়ে উঠুক বলে সে চেয়েছিল, তা কি সত্য হয়ে উঠেছে, না আজও সে তা সত্য করে তুলবার জন্যে সচেষ্ট! জো রায়কে সে ফিরিয়ে দিয়েছে কিনা জানি না, তবে এটা বিশ্বাস করি যে আজও সে তার সংকল্পে অটল আছে। দেহের বন্ধন তার কাম্য নয়, আজও সে বোধহয় খুঁজছে তার মনের মানুষকে।

কিন্তু না, এর পর আমি আর ভাবতে পারছি না, ভয় করছে ভাবতে। অসীম আকাশে আমি আমার স্বপ্ন বেছাতে পারব না।

ভোরবেলায় পরমানন্দ্ আমায় জাগিয়ে দিল, বলল: গোপাল-দাদা, তোমার পালং চা এসে গেছে।

বলে কাঁধে তোয়ালে ফেলে বাথরুমে চলে গেল।

আমি উঠে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলুম। এমন সময়ে হাবুলদাও চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হল। বলল: রাতে ভাল ঘুমিয়েছিস তো?

হেসে বললুম: হ্যাঁ।

হাসছিস যে?

বললুম: তোমার কথাটা অভিভাবকের মতো শোনাল। এবারে তোমার আদেশ ঘোষণা কর।

হাবুলদা বলল: নীরাকে জাগাবার ভার দিয়েছি বিনয়ের ওপর। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে তো, তাই বড় আদরে মানুষ হয়েছে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে হাবুলদা বলল: তবে কী জানিস! বিয়ের আগে সব মেয়েই এই রকম হয়, তারপর চাপে পড়ে একেবারে অন্য রকম। তখন আর তাদের চেনাই যায় না।

বললুম: মানিয়ে নিতে হয় তো, তাই।

ঠিক বলেছিস।

কিন্তু আজকাল মেয়েরা বেশি লেখাপড়া শিখছে বলে সব সময়ে মানিয়ে নিতে পারছে না। ছাড়াছাড়ি বিচ্ছেদ এ সবও আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে।

হাবুলদা বলল ঃ সে সব বড়লোকের সমাজে, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত সমাজে নয়।

বললুম ঃ তা ঠিক। কিন্তু আমি তো মধ্যবিত্ত সমাজেরও প্রতিনিধি নই, আমাকে তুমি দরিদ্রই বলতে পার। আমাদের সমাজে আইনে বিচ্ছেদ হচ্ছে না ঠিকই, তবে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। আর তারপর—ইংরেজীতে যাকে আজকাল ভদ্রভাষায় বলে লিভিং টুগেদার—তাও চলেছে পুরোদমে। এতে সুবিধে অনেক। বনিবনা হল না, আর একজনের সঙ্গে ঘর কর। দু পক্ষ মেনে নিলেই হল।

হাবুলদা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল ঃ কী বলছিস এ সব! এ তো পাগলের প্রলাপ! আর তুই নিজেকে দরিদ্র বলছিস কেন? তোর অভাব কিসের?

বললুম ঃ হাবুলদা, তুমি ভাল কাজ কর, থাকো কলকাতার বাইরে। তাই জানো না আমাদের অবস্থা। কেরানীগিরি করে কলকাতায় সংসার চলে না, এর চেয়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাস করা ভাল। অভাব থাকলেও সেখানে শান্তি আছে বলে শুনেছি।

কলকাতায় অশান্তিটা কী?

বললুম ঃ সময়ের যন্ত্র আমাদের পিষে মারছে। ঘুম ভাঙলেই অফিসে ছোটার ভাবনা। সংসার নেই, তাই বাজারে ছুটতে হয় না, শেষ রাতে উঠে হাঁড়ি ঠেলতে হয় না কাউকে। হারানিধির চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে অফিসে যাই, খাই অফিসের ক্যান্টিনে। ছুটি হলে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরি। সত্যি বল তো, এই কি জীবন!

হাবুলদা গম্ভীর হয়ে বলল ঃ চিরদিন কি তুই কেরানীর চাকরিই করবি?

তা না হলে আর কী করব বল! কেউ কি আমাকে রাতারাতি রাজা করে দেবে?

তা কেউ দেবে না। আজকাল কেউ কারও জন্যে যে কিছু করে না তা ঠিক। কিন্তু নিজের তো একটা চেষ্টা আছে! চেষ্টায় কী না হয়!

সেদিন আর নেই হাবুলদা। একটা চাকরি গেলে আর একটা চাকরি জোটাতে আমরা পারি না। যারা পাবে, তাদের চাকরিরও দরকার কম। তাই তারা পছন্দ না হলেই চাকরি বদলায় বউ বদলানোর মতো।

হাবুলদা বোধহয় একটু হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা বড় করুণ দেখাল। বলল: তুই যেমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে ছিলি, তোব এই অবস্থা আমরা ভাবতে পারি নে।

বললুম: ভাববে কেন, দেখতেই তো পাচ্ছ। একজন মামা না থাকলে চাবি দিক অন্ধকাব।

হাবুলদা এবারে যেন থই পেয়ে গেল, বলল: তা তোব মামা তোর জন্যে কী করছেন শুনি! তিনি তো শুনেছি দিল্লীতে থাকেন! তোর জন্যে কি কিছু কবতে পারেন না?

না।

কেন?

আমার গুরু আমাকে মামাব দয়া ভিক্ষা কবে বাঁচতে বারণ করেছে। বলেছে, না খেয়ে মরা ভাল, কিন্তু কারও দয়া নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করবে না।

হাবুলদা এবারে পরম বিস্ময়ে বলে উঠল: এই বয়সে তুই গুরু ধবেছিস!

গম্ভীর ভাবে বললুম: না, আমি ধরি নি।

তবে?

গুরু নিজেই আমাকে ধরেছে।

এই সময়ে পরমানন্দ্ ফিরে এল। হাবুলদাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল ঃ গজব্ ব্যাপার হাবুলদাদা।

কী রকম ?

নীরা উঠে পড়েছে। বলল, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমার জন্যে তোমাদের দেরি করতে হবে না।

সত্যি নাকি।

বলেই হাবুলদা তার চায়ে শেষে চুমুক দিয়ে পেয়ালা হাতে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও নিজের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমে যাবার উদ্যোগ করছিলুম। সেই সময়ে শুনলুম পরমানন্দ্ সুর করে রামচরিতমানস থেকে দোঁহা পাঠ করছে —

তুলসী তাঁহা না যাইয়ে, যাঁহা নাহি বরণ বিবেক।
বাং রূপা কয় ভূয়া, শ্বেৎ অশ্বেৎ সব এক্॥
বড়ে বড়ে যো কহতে হেঁয় বড়েমে তাল খজুর।
যব ঠনকো ছায়া নাহি, ফল পাওনকা দূব॥
বিন্ বন মিলে লকড়ি, বিন্ সায়ের মিলে নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর যও স্বপক্ষ রঘুবীব॥
বাম বাম সবকোই কহে, ঠক ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেমসে বীঝৎ নহি তুলসী নন্দ কিশোর॥

হঠাৎ আমার দিকে নজর পডতেই বলে উঠল ঃ তুমি শুনছ নাকি গোপালদাদা ?

বললুম ঃ এর মানে বলবে পরমানন্দ্ ভাই ?

পরমানন্দ্ লজ্জিত ভাবে বলল ঃ যেখানে গুণের বিচার নেই, সেখানে তুমি যেও না তুলসী। রাং রূপা রুয়া ভূয়া সবই সমান। বড় বললেই মহৎ হয় না। তাল খেজুব তো বড় গাছ, কিন্তু তার ছায়া নেই, ফলও অনেক দূবে। রঘুবীর সপক্ষে থাকলে বনের বাইরেও লকড়ি পাওয়া যায়, জলাশয় ছাড়াও জল, আর দরিদ্রের ঘরে

আহার। ঠক ঠাকুর আর চোর সবাই রামনাম করে, কিন্তু প্রেম ছাড়া কি নন্দকিশোরকে পাওয়া যায়?

বললুম: ভারি সুন্দর কথা।

পরমানন্দ গাইল—

হস্তী চলে বাজার মে কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুনকে দুর্ভাব নহি যঁও নিন্দে সংসার॥

এই দোঁহার মানে আমি বুঝতে পারলুম। বাজারে হাতি এলে হাজার কুকুর ডাকে। তেমনি সংসারেব সবার নিন্দাতেও সাধু হাতির মতোই অবিচলিত থাকে।

প্রসন্ন মনে আমি ঘর ছেড়ে বেবোলুম।

২৪

পরমানন্দের সঙ্গে আমি নিচে নেমে এসেছিলুম। দেরি হচ্ছিল আর সবার জন্যে। এই সুযোগে আমি ম্যানেজারের কাছ থেকে কাঠমাণ্ডু উপত্যকার একখানি সরকারী মানচিত্র সংগ্রহ করে শহরের পথ ঘাট ও আশপাশের জায়গাগুলো চিনে নেবার চেষ্টা করছিলুম।

কাঠমাণ্ডু শহরের মধ্য দিয়ে ছোট বড় অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বিষ্ণুমতী ও বাগমতী এই দুটি নদী প্রধান হলেও আরও অনেক নদী নালা এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বিষ্ণুমতী নদী শহরের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। বাগমতী শহরের পূর্ব দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ ধারায় এঁকেবেঁকে দক্ষিণে নেমেছে। তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে পশ্চিমমুখী হয়ে। বিষ্ণুমতীর সঙ্গে তার সঙ্গম শহরের বাইরে দক্ষিণ-পশ্চিমে, মিলিত ধারা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। ত্রিভুবন রাজপথ ধরে এলে বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। দক্ষিণে সঙ্গমের কাছে আরও একটি পুল আছে বিষ্ণুমতীর উপরে। আজ আমরা সেই পুল পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে যাব। যে সব নদী-নালা বাগমতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল হনুমন্তে ও মনহরা নদী। এই দুটি নদী পেরিয়ে ভক্তপুরে যেতে হয়। ধোবিখোলাও বাগমতী নদীতে পড়েছে।

গতকাল আমরা পশুপতিনাথের মন্দিরের পিছনে বাগমতী নদী দেখেছি। উত্তরে সুন্দরাজলের কাছে তার উৎস। গোকর্ণ গর্জের মধ্যে দিয়ে গোকর্ণ বনের পাশ দিয়ে এই নদী দক্ষিণে নেমেছে। গোকর্ণ বনের একাংশে রাজকীয় অভয়ারণ্য। এইখান থেকে মনহরা নদী পেরিয়ে ছাঙ্গু নারায়ণ মন্দিরে যাবার পথ আছে। নগরকোট ভক্তপুর থেকে যাওয়া যায়, আবার সুন্দরীজল থেকে যাবারও পথ আছে।

রাজপ্রাসাদের সামনে থেকে সুন্দরীজল যাবার পথ বোধনাথ স্তূপের পাশ দিয়ে। অন্য পথ উত্তরে বুড়ানীলকণ্ঠ গেছে শীতল নিবাস নামে স্টেট গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে। আর একটি পথ বিষ্ণুমতী নদী পেরিয়ে বালাজু উদ্যানে পৌঁছেছে। কাল আমরা এই পথেই বালাজু থেকে শহরে ফিরেছি।

সিংহ দরবার শহরের মাঝখানে। এক সময়ে এটি রাণাদের বাসগৃহ ছিল। এখন নেপাল সরকারের সেক্রেটারিয়েট। তার পিছনে ঘণ্টা ঘর। যে অঞ্চলে আমরা আছি, তার নিকটেই টুরিস্ট ইনফর্মেশন সেণ্টার। পুরনো রাজবাড়ি হনুমান ঢোকাও এই অঞ্চলে। ভাদগাঁও যেমন পূর্ব দিকে শহর ছাড়িয়ে যেতে হয়, তেমনি পাটনও দক্ষিণে বাগমতী নদীর পরপারে। এ দিক থেকেই যেতে হয় গোদাবরী বা বজ্রবারাহী, টিকা ভৈরব ও সরস্বতী কুণ্ডে। এ সমস্তই বাগমতী নদীর পূর্ব দিকে।

আজ আমবা নদীর পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণে নামব। কীর্তিপুর এই ধাবে। পাহাড়ের উপরে সেই পুবনো শহব। পথের ধারে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়। খানিকটা দক্ষিণে আমরা ছোবার গর্জ্ দেখব, আরও দক্ষিণে নেমে ফার্পিং এবং সব শেষে দক্ষিণকালীর মন্দির। তার পব আমরা ফিরে আসব। যদি সময় বেশি না লাগে, তবে হনুমান ঢোকায় নেমে শহরেব অন্যান্য দ্রষ্টব্যও দেখে নেব। এই হল কাঠমাণ্ডু উপত্যকা।

হাবুলদা এসে আমকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল : অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছিস গোপাল ?

আমি লজ্জিত হয়ে ম্যাপখানা মুড়ে ম্যানেজারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম : তেমন কিছু নয়।

পবমানন্দ্ কাছেই ছিল। সে বলল : একটা নক্সা।

আমি দেখলুম, নীরা আর বিনয়ও নেমে এসেছে। সবাই এক সঙ্গে বসে চা খেয়ে আমবা বেরিয়ে পড়লুম। পরমানন্দের জন্যে দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, আর ডিমের বদলে মিঠাই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটুখানি ঘুরপাক খেয়ে একটা বড় রাস্তা পেরিয়ে আমরা দক্ষিণের পথ ধরলুম। বিষ্ণুমতী নদীর পুল পেরোবার সময় বাঁ হাতে বাগমতী নদীও দেখতে পেলুম। সঙ্গমের কাছেই পুল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাবুলদা ছবি তুলল একখানা। বলল : তোর কাজে লাগতে পারে। ওকে আমি তোর কাছে পাঠিয়ে দেব।

বিনয় বলল : বই লিখে তো পয়সা নেই, শুধু শুধুই ও সময় নষ্ট করে। তবে পয়সা খরচ করে ওকে ছাপাতে হয় নি, এইটেই লাভ।

হাবুলদা বলল : সেটাই বা কম কথা কী! আমরা তো বই লিখতে পারি না!

পরমানন্দ বলল : একদিন নাম হতে পারে প্রেম চন্দের মতো।

হাবুলদা এক ধমক দিয়ে বলল : দূর গাধা, বল্ শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো। বাঙলায় প্রেমচাঁদকে কে চেনে!

নীরা বলল : সদ্‌গতি দেখে নি? গোদান? শতরঞ্জকা খিলারী?

দূর! ওরা কি আর হিন্দী ছবি দেখে! গোপালের কাণ্ড তো কাল দেখেছিস, সিনেমায় না গিয়ে একচোট ঘুমিয়েই নিল।

আমি পিছন ফিরে দেখলুম যে নীরা একটা কঠিন মন্তব্য করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। আর বিনয় বলল : আজ বিকেলে একটা ভাল প্রোগ্রাম করতে হবে, কী বলিস নীরা?

অবিলম্বে নীরার মুখের ভাব বদলে গেল, বলল : সোয়াল্‌টিতে ডিনার খাওয়াবে বিনয়দা? ভাল ফ্লোর শো আছে।

তাই নাকি?

আমার এক বন্ধু বলেছিল। তুমি একবার টেলিফোনে জেনে নিও না?

আইডিয়া!

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : আমার ফাণ্ডে কিন্তু টাকা নেই। তোরা নিজের খরচে যাস।

বিনয় বলল : ও.কে।

আর পরমানন্দ্ আমাকে চুপি চুপি বলল : তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিও গোপালদাদা। আমি ও দলে নেই।

কিন্তু হাবুলদা এ কথা শুনতে পেয়ে বলল : গোপাল যে যাবে না, তুই সে কথা বুঝলি কী করে?

পরমানন্দ্ বলল : যে মানুষ সিনেমা দেখতে যায় না, সে যাবে ফ্লোর শো দেখতে! তার আগে পৃথিবীটাকে ওল্টাতে হবে।

বলে প্রসন্ন মনে হাসতে লাগল।

কেন জানি না, আমার একটা উত্তর দিতে ইচ্ছা হল। তাই বললুম : না পরমানন্দ ভাই, কথাটা তা নয়। আমি গরিবের ছেলে, গরিব দেশের ছেলে, নিজেও গরিব। এ কথাটা কোন সময়েই ভুলতে পারি নে। আমাদের জগতে আমরাই বাঁচবার জন্যে নাচি। সবাই আমাদের নাচায়। আর বিনে পয়সায় যখন নাচ দেখতে পাওয়া যায়, তখন পয়সা খরচ করে নাচ দেখব কেন ভাই!

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : বুঝেছি।

কী বুঝেছ বল তো!

সে আর তোর শুনে কাজ নেই। তার চেয়ে অন্য কিছু বল্।

পরমানন্দ্ বলল : হ্যাঁ, সেই ভাল। নেপাল সম্বন্ধেই কিছু বল গোপালদাদা।

কিন্তু কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই বললুম : নেপালের তো সবই আমাদের দেখা হয়ে গেল, বাকী আর রইল কী!

এ কথার প্রতিবাদ করল ট্যাক্সির ড্রাইভার। সে বলল : টুরিস্টরা এই রকম কথাই বলেন।

কেন, এ কথা ঠিক নয়?

নেপালের আপনারা কতটুকু দেখেছেন বলুন! কাঠমাণ্ডু শহরটাই এখনও দেখেন নি! শহরেই কি দেখবার জিনিস কম আছে! যেখানে গেছেন, সেখানেও ভাল করে কিছু দেখেন নি।

তারপরেই মাথা দুলিয়ে বলল : হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এক একজন

সাহেব আসে, দেখতে জানে তারা। আমরাও জানি নে এমন কথাও তারা বার করে।

আমি বললুম : কথাটা একটু বুঝিয়ে বল তো।

ড্রাইভার বলল : এই পশুপতিনাথের কথাই ধরুন। আপনারা তো দেবপাটনের সব দেখে এসেছেন। একটা চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি দেখেছেন কি?

পরমানন্দ বলল : না তো।

ড্রাইভার খুশী হয়ে বলল : পশুপতিনাথের কাছেই ছাবল নামে একটা জায়গা আছে। সেই খোলা জায়গায় কিছু ঝোপঝাড় আছে চারি দিকে, আর অনেক দূরে পাহাড় দেখা যায়। একটা বাঁধানো ভিতের ওপরে ব্রহ্মা বসে আছেন। তাঁর পরনে ধুতি, খালি গা। কিন্তু মুখ চার দিকে চারটে, মাথার জটা খোঁপার মতো করে বাঁধা। আটটা কানে কুণ্ডল ঝুলছে, আর কোন অলঙ্কার নেই।

মন্দির নেই?

না। কোন পূজা হয় না এই মূর্তির। টুরিস্টদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, অথচ এই মূর্তির কথা আমার জানা ছিল না।

বললুম : তারপর?

ড্রাইভার বলল : কাল পাটনে আমি আপনাদের তুসাহিতি দেখালাম। আপনারাও দেখলেন। কিন্তু এই তুসাহিতিই আমাকে দেখিয়েছিল সেই সাহেব। নিজে ছবি তুলে সেই ছবি আমাকে দেখিয়েছিল। আমি চিনতে পারি নি যে সেটা তুসাহিতির ছবি।

কেন?

কী দেখলাম জানেন? লক্ষ্মীকে বাঁ পায়ের ওপরে নিয়ে বসে আছেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ, তাঁর নিচুতে পাখা মেলে বসেছেন গরুড়। সামনে গোমুখ থেকে জল পড়ার ব্যবস্থা। আর পেছনের কারুকার্য যে এত সুন্দর এর আগে আমি তা বুঝি নি।

নীরা পিছন থেকে প্রশ্ন করল : তুসাহিতি আবার কী?

উত্তর দিল পরমানন্দ, বলল ঃ রাজবাড়িতে নাহাবার জায়গা।

হাবুলদা বলল ঃ নাহাবার নয় বে, স্নানেব জায়গা বল্।

পবমানন্দ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু ড্রাইভার বলল ঃ আর একটা চোখ দেখিয়েছিল সাহেব। চোখেব ছবি। ভুরুর নিচে একটা খোলা চোখ, তাব মধ্যে মণি। সেই মণিব মধ্যে নাবায়ণ বসে আছেন। এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য যে না দেখলে আপনাবা বিশ্বাস কববেন না।

আমি বললুম ঃ সেটা কোথায়?

সাহেবকে আমিও এই কথা জিজ্ঞেস কবেছিলাম। কিন্তু সাহেব কোন উত্তর না দিয়ে হেসেছিলেন। আব আমাদেব কথা তো বোঝেন! আমবা তো নিজেবা কিছু দেখি না, দেখাই আপনাদেব। যা জানি তাই দেখাই। আপনাদেব সময় এত কম যে কোথাও দাঁড়িয়ে কিছু দেখেন না, দেখতে না দেখতেই এগিয়ে যান। একে কি দেখা বলে!

বিনয় রেগে গেল। বলল ঃ হ্যাঁ, আমাদের কাজকর্ম তো নেই, নেপালে এই সবই দেখে বেড়াব!

এব পরে ড্রাইভার অনেকক্ষণ কথা কইল না। দ্রুত বেগে গাড়ি চালিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল, আর নিজে নেমে নীবাব দিকেব দরজাটা খুলে দাঁড়াল।

হাবুলদা অন্য ধার থেকে নেমে বলল ঃ এখানে কী?

ড্রাইভার সংক্ষেপে বলল ঃ চোভাব।

সে আবার কী?

দুটো পাহাড়ের মাঝে একটা ফাঁক।

হাবুলদা আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম ঃ গর্জ্।

তারপর ড্রাইভারের কাঁধে একটা হাত রেখে বললুম ঃ চল, ভাল করে দেখিয়ে দেবে আমাদের।

ড্রাইভার বিনয়ের মন্তব্য শুনে দমে গিয়েছিল খুবই। আমার কথায় খুব বেশি উৎসাহ না পেলেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি বললুম ঃ জায়গাটা ভারি মনোরম বলে মনে হচ্ছে।

এই কথা শুনেই ড্রাইভার বলল : এ জায়গা আগে এ রকম ছিল না। ঐ যে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফাঁক দেখছেন, আগে তা ছিল না। আর কাঠমাণ্ডু উপত্যকা ছিল একটা বিরাট জলাশয়। মঞ্জুশ্রী এই উপত্যকার জল বার করে দেবার জন্যে তাঁর তরোয়াল দিয়ে পাহাড়কে ঐ ভাবে কেটেছিলেন।

সত্যি ?

সত্যি না হলে পাহাড়ের মাঝখানে ও রকম ফাক হল কী করে ! ও তো দুটো পাহাড় নয়, পাহাড় একটাই। উপত্যকার জল বার করে দেবার জন্যে মঞ্জুশ্রী ঐ ভাবে পাহাড়কে দু ভাগ করেছেন। আর পাহাড়ের ওপরে ঐ যে মন্দির দেখছেন, ওটা আদিনাথের মন্দির।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : জৈনদেব আদিনাথ ?

ড্রাইভার বলল : তা কেন হবে। আদিনাথ হলেন বৌদ্ধদের দেবতা লোকেশ্বর। রাজা অংশুবর্মা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পাহাড়ের ওপরে উঠলে দেখবেন, মন্দিরটা ছোট হতে পারে, কিন্তু দেখতে প্যাগোডার মতো। সাহেবরা লিচ্ছবি আমলের মতো বলেন।

বিনয় তাড়া দিয়ে বলল : পাহাড়ে আর উঠতে হবে না, এখান থেকেই ফিরে চল্।

ড্রাইভার মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : আর একটা মন্দির ছিল এখানে। জল বিনায়কের মন্দির। মল্ল আমলে তৈরি গণেশের মন্দির। ভারি সুন্দর দেখতে।

কিন্তু সে মন্দির দেখবার জন্যে কেউ এগোল না। আমরা নিজেদের গাড়িতে উঠে আবার যাত্রা করলুম।

ড্রাইভার বলল : চোভার থেকে বরফের পাহাড়ও দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা দেখলুম না কেন ?

আপনাদের যে রকম তাড়া, অনেক কথাই সময় মতো মনে পড়ে না। আজকের দিনটা তো পরিষ্কার ছিল, হয়তো দেখা যেত।

অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে এসেছি, এখন আর ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। তাই আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে ছুটে এক সময়ে ফার্পিং নামের একটা জায়গায় এসে নামলুম।

এ জায়গাটিও মনোরম বলে মনে হল। টিলার মতো একটা নিচু পাহাড়। পথেব ধাব থেকে উপরে উঠে একটি বাঁধানো পুকুর। তাতে আছে নানা রকমের মাছ। ভিতরের দিকে এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে মন্দির। দেবতার নাম শেক নারায়ণ। এই অদ্ভুত নাম কেন হল তা কেউ বলতে পাবল না। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার গল্প শোনা গেল। রাজা হরিদত্ত বর্মা স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেবতা তাঁকে মন্দিব নির্মাণ করতে বলেছেন। তাই বাজা মন্দিব নির্মাণ কবে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে শেক নারায়ণ আছেন, আছেন লক্ষ্মী কামধেনু। যে পুকুর খনন করিয়েছিলেন, তার নাম বাসুকি কুণ্ড। এই মন্দিরে যাত্রীর ভিড় হয় প্রতি শনিবারে।

দক্ষিণকালীর মন্দির এখান থেকে খুবই কাছে। এই মন্দিরেও যাত্রীর ভিড় হয় শনিবাবে। তারা ফার্পিং ও দক্ষিণকালী এক সঙ্গেই দেখে। শহব থেকে এ জায়গাব দূবত্ব বেশি নয়, আট মাইলেব মতো হবে। বাস যাতায়াত কবে। মনে হয় যে শনিবারে বাসেব জন্যে বোধহয় যাত্রীকে অপেক্ষা করতে হয় না।

আমাদের ট্যাক্সি যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে আমরা পাহাড়ী পথে অরণ্যময় পবিবেশে ধীরে ধীরে হেঁটে মন্দিবের সামনে পৌঁছে গেলুম।

বাঙলায় কালী অনেক আছেন, তার মধ্যে দক্ষিণাকালী অন্যতম। কিন্তু এখানে দক্ষিণাকালী বলে মনে হল না। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার দক্ষিণে এই মন্দির অবস্থিত বলেই বোধহয় দক্ষিণকালী নাম হয়েছে। যাত্রী এখানে ছিলেন না তা নয়, যাঁরা ছিলেন তাঁদের স্থানীয় লোক বলেই মনে হল পূজার পদ্ধতি দেখে। একজন কাঁচা ডিম দেবীর দুধারে মাটিতে ছুঁড়ে ভাঙলেন। এরই নাম দেবীকে ভোগ নিবেদন।

আর একজন দু পায়ের মাঝখানে তরোয়ালের মতো একখানা খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন যাত্রী একটি মোরগ তার হাতে দিতেই সে এক পোঁচে তার গলাটি কেটে দূরে ফেলে দিল। এর নাম বলিদান।

এই দৃশ্য দেখবে না বলে পরমানন্দ্ পালিয়ে গিয়েছিল, আর মজা লেগেছিল নীরার। বিনয়কে সে বলল: এতক্ষণে একটা মজার জিনিস দেখলাম।

মন্দিরের চারিধার ভারি সুন্দর। আমি ঘুরে ঘুরে পরিবেশটা দেখলুম। কাছেই একটা ছোট পুল আছে। বর্ষার সময় বোধহয় তার নিচে দিয়ে ঝর্ণার মতো জল বয়ে যায়। কয়েক জায়গায় কিছু ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র দেখে মনে হল যে ছুটির দিনে এখানে অনেকে পিকনিক কবতেও আসে। পিকনিকের জন্য আকর্ষণীয় স্থানই বটে। খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু হাবুলদা আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল, বলল: এখানে সময় নষ্ট করিস না গোপাল। বেলা এখনও বেশি হয় নি, কাঠমাণ্ডু শহরটাও আমরা এ বেলাতেই দেখে ফেলতে পারব।

বললুম: চল তাহলে।

দলপতির আদেশ। কাজেই সবাই আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসলুম। ড্রাইভারও আর দেরি না করে কাঠমাণ্ডুব দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

আমি নীববে বসেছিলুম। পরমামন্দ্ মাঝে মঝেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করল: তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব গোপালদাদা?

তার সঙ্কোচ দেখে আমিহেসে বললুম: কী কথা পরমানন্দ্ ভাই?

কথাটা রাতে শেষ হয়নি হাবুলদাদার ঘুম পেয়ে গেল বলে।

হাবুলদা শুনতে পেয়েছিল; পিছন থেকে বলে উঠল: কী কথা রে পরমানন্দ্?

পরমানন্দ্ বলল: নেপালের রাজাদের কথা। এখানকার প্রধান

মন্ত্রীরা রাজার ক্ষমতা কী করে দখল করলেন, আর রাজা সেই ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করলেন কেমন করে, সেই কথা।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস তো!

নিজের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা শুনে পরমানন্দ্ খুশী হয়ে বলল : তোমার সেই গল্পটা এবারে শেষ কর গোপালদাদা।

বিনয় বলল : নেপালের ইতিহাস নাকি?

হাবুলদা বলল : তোরা শুনিস নি তো! তাহলে গোপাল, গোড়া থেকেই বল্ তুই। কিন্তু বেশ সংক্ষেপে বলবি।

নীরা এখন পথের দিকে চেয়ে আছে। আমি জানি যে ইতিহাসের কথা আরম্ভ করলেই সে চোখ বুঁজবে, আর বিনয়ও হাই তুলবে। কিন্তু পরমানন্দ্ বলল : হ্যাঁ গোপালদাদা, গোড়া থেকেই বল।

বললুম : এ রাজ্যের আদিবাসী হল কিরাত। এখানকার অধিবাসীরা এসেছে ভারত থেকে। এ দেশে বৌদ্ধ ধর্মও এসেছে ভারত থেকে অশোকের সময় তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ত্রিহুতের লিচ্ছবিরা এ দেশ দখল করে চতুর্থ শতকে। তারা ছিল শৈব। এখনও পশুপতিনাথ শিব এ দেশের রাজাদের দেবতা। সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এ দেশে ঠাকুর বংশ রাজত্ব করেন। তারপর ন শো বছর রাজত্ব করেন নেওয়ারী রাজারা। এদের মধ্যেই ছিলেন মল্ল রাজারা এবং তাঁদের আমলেই এই রাজত্ব চার ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গোর্খা রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ যখন এই দেশ জয় করেন, তখন নাকি এ দেশে ছোট ছোট রাজা ছিলেন ছাব্বিশ জন।

হাবুলদা বলল : এই পর্যন্তই বোধহয় তুই বলেছিলি।

আমি পিছন ফিরে দেখলুম যে নীরা এখন সত্যিই ভাল করে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছে। কিন্তু বিনয় এখনও হাই তুলছে না। বলল : ইতিহাসের কথা থাক। নেপালের মন্ত্রীরা কী করে রাজাদের ক্ষমতা দখল করল, সেই কথা বল্।

বললুম: সে কথা তো আমাদের ইতিহাসে এখনও লেখা হয় নি। তবে ঘটনার বিবর্তন দেখে অনুমান করা যেতে পারে। একজন লিখেছেন যে বহু বিবাহের ফলে নেপালের রাজ সিংহাসন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, সেই সময় অর্থাৎ এই শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজা বাধ্য হয়ে প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেন। আবার কেউ বলেন যে এই শতাব্দীরই গোড়ার দিক থেকে ভীমসেন নামে একজন ক্ষমতাশালী প্রধান মন্ত্রী রাজার ক্ষমতা দখল করতে আবম্ভ করেন এবং বংশানুক্রমে প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্টির পথ রচনা করেন। এঁদেবই প্রথম হলেন জং বাহাদুর বাণা। তিনিই ১৮৪৫-এ প্রধান মন্ত্রী হয়ে ধীবে ধীবে রাজার সমস্ত ক্ষমতা হরণ করেন। প্রথমে তিনি বিলেতে গিয়ে বাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন, বৃটিশ সেনা বাহিনীতে গোর্খাদেব দিয়েছিলেন এবং ভাবতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে, অর্থাৎ বৃটিশ যাকে বলেছে সিপাহী বিদ্রোহ, তাতে বৃটিশকে মদৎ দিয়েছিলেন। এই বাণা শাহীর অবসান হয ১৯৫১ সালে। দবিদ্র প্রজা শোষণ কবে এই সরকার একটি বিলাসী অভিজাত সমাজেব সৃষ্টি কবেছিল।

হাবুলদা এক ধমক দিয়ে বলল: বাণা শাহীব অবসান তুই এক কথায় ঘটালি!

আমাদের স্বাধীনতা লাভেব মতো তাদেরও অনেক প্রচেষ্টা আছে। নেপালে প্রজা পবিষদ গঠিত হয়েছিল, আব নেপালী ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমাদেরই কলকাতায়। প্রধান মন্ত্রীদের বলা হত মহাবাজা। শেষ মহাবাজা মোহন সম্শের দিল্লীতে এসে বন্ধুতার চুক্তি কবেছিলেন ভারত সরকাবের সঙ্গে। আর নেপালে বাজা মহেন্দ্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাটকীয় ভাবে। সে কাহিনী আমি পড়বার সুযোগ পাই নি।

হাবুলদা বলল: আর সুযোগ পেয়ে দরকাব নেই। যথেষ্ট বলেছিস। নীরা ঘুমিয়েই পড়েছে তোর কথা শুনে।

এক সময়ে আমরা শহরে পৌঁছে গেলুম। ড্রাইভার বলল: শহর দেখবেন তো?

হাবুলদা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল: হ্যাঁ।

আদেশপেয়েই ড্রাইভার এদিকসেদিক ঘুরে যেখানে এসে দাঁড়াল, তার নাম শুনলুম হনুমান ঢোকা। কাঠমাণ্ডুর রাজার পুরনো বাড়ি এটি। দরবার স্কোয়ারকে হনুমান ঢোকা বলে কেন তা বলে দিতে হল না। গেটের ধারেই হনুমানের মূর্তি দেখতে পেলুম। ছাতার নিচে সেজে গুজে বসে আছেন একটি বিরাট আকারের হনুমান। ড্রাইভার বলল: কাঠমাণ্ডু শহরের প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজা গুণকাম দেব ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু যে কাষ্ঠমণ্ডপের জন্যে শহরের নাম হয়েছে কাঠমাণ্ডু, সেটির প্রতিষ্ঠা ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা লক্ষ্মীনরসিংহ মল্ল এটি স্থাপন করেন। একটি গাছের গুঁড়ি থেকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

বললুম: সেটি তো দেখতে পাচ্ছি না!

সিংহ দরবারের পথে দেখিয়ে দেব। কিন্তু হনুমান ঢোকায় স্তম্ভের উপরে যে রাজার মূর্তি দেখছেন, তা রাজা প্রতাপ মল্লের।

হাবুলদা আমাকে ডেকে বলল: চলে আয়, সব কিছু দেখে নেওয়া যাক তাড়াতাড়ি। সময় মতো ফিরতে হবে হোটেলে।

কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি দেখলুম যা দেখবার ছিল। কাল ভৈরবের একটি বিশাল মূর্তি দেখলুম, বাহির থেকে দেখলুম তলেজুর মন্দির। দেবী ভবানীর নাম তলেজু হল কেন, তা কারও কাছে জানতে পারলুম না। প্রশ্ন করে উত্তর পাবার মতো কাউকে দেখতেও পেলুম না। ন তলা বাড়ি দেখলুম একটি, তার নাম বসন্ত দরবার। দরবার মানে বোধহয় রাজবাড়ি। তারপর করোনেশন প্ল্যাটফর্ম দেখলুম। রাজার অভিষেকের উৎসব হত এখানে। হল্ অফ পাবলিক অডিয়ান্সে রাজা প্রজাদের দেখা দিতেন মনে হয়। রাজবাড়ির ভিতরে একটি ছোট জাদুঘরও আছে শুনলুম। কিন্তু তা দেখবার

উৎসাহ ছিল না কারও। বড় ঘণ্টা আব বড় ড্রাম দেখলুম, দেখলুম প্যাগোডা স্টাইলের কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির।

গাড়ির কাছাকাছি এসে হাবুলদা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল: সব দেখা হচ্ছে তো?

ড্রাইভাব বলল: আসল জিনিস দেখাই তো বাকি আছে!

সে আবাব কী?

কুমাবীব মন্দিব।

বলে একটি সুন্দব বাসগৃহেব দিকে আমাদেব নিযে গেল। ভাগ্য আমাদেব নিতান্তই সু-সন্ন। এক দল বিদেশী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন উপবেব দিকে চেযে, আব তাঁদেব গাইড জোবে জোরে হাতে তালি দিযে অপেক্ষা কবছিল। এই সমযে একটি বালিকা দেবীব মতো সাজ কবে দোতলাব বাবান্দায এসে দাঁড়ালেন খনিকক্ষণেব জন্যে। তাবপব ভিতবে চলে গেলেন। ড্রাইভাব আমাকে বলল: প্রণাম করুন কুমাবী দেবীকে।

বলে সে নিজেও প্রণাম কবে বলল: ইন্দ্র যাত্রায যখন ইনি বথে বেবোন, তখন বাজাও একে প্রণাম কবেন। ইনিই নেপালেব লিভিং গডেস।

হাবুলদা আমাকে তাড়া দিযে বলল: চল্।

তাবপব ড্রাইভাবকে বলল: আব কিছু দেখবাব নেই তো?

ড্রাইভাব বলল: সিংহ দববাব দেখবেন না?

সে আবাব কী?

আগে বাণা মহাবাজাদেব বাড়ি ছিল, এখন সেক্রেটাবিয়েট হয়েছে। এত বড় বাড়ি শহবে আব নেই।

বিনয় বলল: বাবিশ!

কাজেই আমবা হোটেলেই ফিরে এলুম।

২৫

আমরা ফিরতেই হোটেলের ম্যানেজার তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। এক গোছা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন: রামলাল আপনার খোঁজে এসে এই সব দিয়ে গেছেন।

বললুম: কখন এসেছিলেন তিনি?

সে অনেকক্ষণ আগে। আপনার দেখা যে পাবেন না তা তিনি জানতেন। বলেছেন, আপনি তাঁর কাছে যা জানতে চেয়েছেন, তার কিছু এতে আছে। বিকেলে আবার আসবেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাকে কি হনুমান ঢোকার কাছে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন?

বললুম: হ্যাঁ।

এবারে বললেন যে তিনি নিজেই এসে নিয়ে যাবেন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। সেখানে আপনার সব রকম প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।

খুব ভাল হয় তাহলে।

ম্যানেজার বললেন: বিকেলে আপনাদের কোন প্রোগ্রাম নেই তো?

বললুম: আমি সানন্দে সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করব। আপনি এই কাগজপত্র এখন আপনার কাছেই রাখুন। খেয়ে ওপরে যাবার আগে আমি নিয়ে যাব।

বেশ।

বলে তিনি কাগজপত্র নিজের ড্রয়ারেই রেখে দিলেন।

পরমানন্দ. দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল: কী খবর গোপালদাদা?

বললুম: আমাকে বোধহয় বেরোতে হবে।

এখন?

না, বিকেলের দিকে।

তুমি একা যাবে?

পবমানন্দের চোখে উদ্বেগের ভাব দেখে হাবুলদা এগিয়ে এল। সে মুখ হাত ধুয়ে এসেছিল। বলল: কোন দুঃসংবাদ নাকি?

হেসে বললুম: আমার কাছে সুসংবাদ।

কী রকম?

এক বন্ধুর সঙ্গে বেরোতে হবে আমাকে।

একে সুসংবাদ বলছিস কেন?

বললুম: কালকেব মতো আজও তোমাদেব বেহাই দেব। তোমরা ইচ্ছে মতো বেবোতে পারবে।

হাবুলদা গম্ভীব মুখে বলল: সিনেমা পর্যন্ত আমাব চলে, তার বেশি না।

আজ আমি পরমানন্দ.কে সবার সঙ্গে বসিয়ে দিয়ে নিজে একা একটা টেবিলে বসে নিঃশব্দে আহার সেবে নিলুম। তারপর ম্যানেজারেব কাছ থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ কবে নিজের ঘবে চলে এলুম। বিছানায় শুয়ে সেই কাগজের উপবে চোখ বুলিযে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মাউন্ট এভারেস্ট সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ, কিন্তু সেটি কার লেখা তাব উল্লেখ নেই। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সেই কাগজ পড়তে লাগলুম।

প্রথমেই একটা নূতন শব্দ পেলুম। সেটা হল মায়োসিন যুগ। এই শব্দটির অর্থ আমার জানা নেই। বুঝতে পারলুম যে এই যুগেই আমাদের হিমালয়ের জন্ম হয়েছে। আজ থেকে সাত আট কোটি বছর নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ কোটি বছরও আগে হতে পারে। এই

সময়ে একটা প্রবল ভূ-আন্দোলন হয়েছিল, তাতে তিব্বত ও ভারত কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করার জন্যেই সেই চাপে এই দুই দেশের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে হিমালয়ের। এ যেন একটা বেলুনকে দু হাতে চাপ দিয়ে মাঝখানটা ফুলিয়ে উঁচু করে দেওয়া। সময়ের হিসেবটা আমাদের মতো অনভিজ্ঞের কাছে হাসির বস্তু বলে মনে হতে পারে।

এক সময়ে এই গিরিশৃঙ্গের নাম ছিল ইংরেজী অক্ষর এইচ। তারপর ১৮৪৯-৫০ সালে এর নামকরণ হয় পিক ফিফ্‌টীন, ইংরেজীতে লেখা হত PEAK XV। তখন কারও জানা ছিল না যে এটাই বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। ১৮৬২ সালে হিমালয়ের উঁচু গিরিশৃঙ্গগুলির মাপ করা হয়। তাতে দেখা যায় যে গোটা চল্লিশেক গিরিশৃঙ্গ আছে যাদের উচ্চতা ১৮,২৮৮ ফুট বা তার বেশি। সেই সময়েই জানা যায় যে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ হল পিক ফিফ্‌টীন এবং ভারতের ভূতপূর্ব সার্ভেয়ার জেনারেল সার জর্জ এভারেস্টের নামে এই শৃঙ্গের নাম হয় মাউন্ট এভারেস্ট।

এই শৃঙ্গের সঠিক উচ্চতা নিয়ে বহু দিন মতভেদ ছিল। ১৯৫২-৫৫ সালে এর উচ্চতার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়। এই ব্যাপারে রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্ব আছে অনেকখানি। এখন আমরা জানি যে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট অথবা ৮,৮৪৮ মিটার। এই শৃঙ্গটি নেপাল ও তিব্বতের অনির্দেশিত সীমান্তে অবস্থিত।

এর পর এভারেস্ট অভিযানের কথা। কিন্তু তা পড়বার অবকাশ পেলুম না। তার আগেই পরমানন্দের সঙ্গে হাবুলদা এসে উপস্থিত হল। দুজনের মুখই ভার। কিন্তু হাবুলদাই প্রথমে কথা কইল, বলল : তুই কি আমাদের ওপরে রাগ করেছিস ?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সে কি, আমি তোমাদের ওপর রাগ করতে যাব কেন ?

হাবুলদা বলল : আমি তো তাই মনে করি। কিন্তু ওরা বলছিল—

ওরা কারা?

পরমানন্দ্ বলল: কথাটা খুলেই বল না হাবুলদাদা।

খুলে বলব?

পরমানন্দ্ বলল: নিজেদের মধ্যে আবার রেখে ঢেকে কথা বলার দরকাব কী!

ঠিক বলেছিস। কিন্তু—

কিন্তু আবার কী?

আগে তোর কথাটা শুনে নিই, তারপবে আমাদের কথা বলব।

আমি বললুম: কী শুনতে চাও বল।

তুই অমন চুপচাপ খেয়ে আমাদের ফেলে একা ওপরে চলে এলি কেন?

হাবুলদাব কথায় আমি লজ্জা পেয়ে বললুম: সেটা আমাব মস্ত ভুল হয়ে গেছে হাবুলদা, এব জন্য কিছু মনে কোরো না।

ভুল হয়ে গেছে!

বলে হাবুলদা পরমানন্দের মুখের দিকে চাইতেই আমি বললুম: রামলালবাবু কিছু কাগজপত্র রেখে গিয়েছিলেন ম্যানেজাব ভদ্রলোকের কাছে। তা পড়বাব জন্যে আমি ব্যস্ত হয়েছিলুম। বিকেলেই আমাকে আবাব একজনের কাছে নিয়ে যেতে আসবেন কিনা!

কাব কাছে নিয়ে যাবে?

তা জানি নে। তবে বলেছেন যে এমন একজনের কাছে, যার মুখে অনেক কথা জানতে পাব।

সত্যি বলছিস?

তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলব কেন!

ঠিক বলেছিস। তাই না?

বলে পরমানন্দের দিকে তাকাল হাবুলদা। আর পরমানন্দ্ বলল: আমিও তো তাই বলছিলাম তোমাদের। গোপালদাদা কোন

সাতে পাঁচে থাকবার লোক নয়। কিন্তু নীরাই এ কথা বিশ্বাস কর:ছ না।

কেন?

হাবুলদা বলল: সে ভাবছে যে তোকে ইগ্‌নোর করা হচ্ছে বলেই তুই রাগ করেছিস। মানে তোকে কেউ গ্রাহ্য করছে না, মানে খাতির করছে না, মানে—

আমি হেসে উঠলুম উচ্চ কণ্ঠে, তারপবে বললুম: তোমাকে আর এত মানে বলতে হবে না হাবুলদা, আমি সব বুঝতে পেবেছি।

কী বুঝেছিস?

তোমরা যে আমাকে যথেষ্ট খাতির করছ তা এই সব ভাবনা চিন্তা দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু কিসের জন্যে এত খাতির বল তো!

বলব, সময় হলেই বলব।

বলে হাবুলদা গম্ভীর হয়ে গেল। আব পরমানন্দ্ বলল: হাবুলদাদা একটা মিশন নিয়ে বেবিয়েছে। মানে, এই টুরের পব মজঃফরপুবে পৌছে আর একটা বিয়েব দিন পাকা করে ফেলবে।

কার বিয়ে?

হাবুলদা তাব গাম্ভীর্য বক্ষা কবে বলল: ক্রমশ প্রকাশ্য। এতক্ষণ কী পড়ছিলি তাই বল্।

বললুম: এভাবেস্ট অভিযানের কথা।

হাবুলদা বলল: বেশ তো, জোরে জোবে পড়, আমরাও শুনব।

বললুম: মাউন্ট এভারেস্টকে আমরা নেপালের সম্পত্তি বলে মনে করি। তাবা এই গিরিশৃঙ্গকে বলে সাগরমাতা। কেন বলে তা বলতে পারব না। এতে সে কথার উল্লেখ নেই।

হাবুলদা বলল: যার উল্লেখ আছে তাই বল্।

বললুম: আসলে এই এভারেস্ট নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তে এমন জায়গায় যে কার সম্পত্তি তা বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুদিক

থেকেই, মানে ছ্ দেশ থেকেই, এভারেস্টের চূড়োয় ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে। তিব্বতের পথ মুক্ত হয়েছে ১৯২০ সালে, আর তাব পর থেকেই এভারেস্ট অভিযান আরম্ভ হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম: এভারেস্ট জয় হয়েছে কবে মনে আছে?

হাবুলদা বলল: সে অনেক দিন হয়েছে।

আমি খানিকটা পড়ে নিয়ে বললুম: ১৯৫৩ সালের উনত্রিশে মে। এড্‌মণ্ড্ হিলারি আর শেরপা তেনজিং উঠেছিলেন একেবারে শিখরে।

পরমানন্দ্ বলে উঠল: মনে পড়েছে। আমরা খবরের কাগজে পড়েছি।

হাবুলদা এক ধমক দিয়ে বলে উঠল: তোর বয়েস তখন কত ছিল রে গাধা?

পরমানন্দ্ লজ্জিত ভাবে বলল: খুব ছোট ছিলাম আমরা।

হাবুলদা আমাকে বলল: তুই থামলি কেন?

বললুম: কিন্তু এক দিনেই বা এক বাবের চেষ্টাতেই এভারেস্টের মাথায় ওঠা সম্ভব হয় নি। এর আগে তিনটে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ-কারী দল পথঘাট খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিল এবং অভিযাত্রী দল শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করেছিল সাত বার।

এ সব কথা লেখা আছে নাকি?

বললুম: তাই তো পডছি।

হাবুলদা বলল: পড়্, জোরে জোবে পড়্, আমবাও শুনি।

আমি পড়লুম: প্রথম পর্যবেক্ষণকারী দল পথ খুঁজে বার করার অনুমতি পায় ১৯২১ সালে। এই দলের নেতা ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল হাওয়ার্ড ব্যুরি। তাঁর দল হিমালয়ে ২২,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে অনেক পথঘাট বার করেছিলেন। অভিজ্ঞতার অভাবে এই দলের অনেকে মারা যান এবং তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

পরের বছরেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রুসের দল এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করেন সাড়ে তিন মাস ধরে। অনেক চেষ্টায় তাঁরা সাড়ে সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন। কিন্তু দলের কয়েকজন শেরপা বরফ চাপা পড়ে মারা পড়েছিল।

তারপর ?

দু বছর পর এই ভদ্রলোকই আবার চেষ্টা করেন। কয়েকজন পুরনো অভিযাত্রীর সঙ্গে নতুন কয়েকজনও ছিলেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবু নর্টন নামে একজন আটাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। এঁদের পর যাঁরা অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ এত দূর পৌঁছতে পারেন নি।

হাবুলদা বলল : আটাশ হাজার ফুট মানে তো চূড়োর প্রায় কাছাকাছি।

পরমানন্দ হিসেব করে বলল : আর এক হাজার আটাশ ফুট উঠলেই তেনজিং হত।

বললুম : না, কথাটা ঠিক হল না।

কেন ?

নর্টন তেনজিং হত না, তেনজিংই নর্টন হত।

হাবুলদা বলল : ঠিক বলেছিস।

আমি পড়ছিলুম মনে মনে। হাবুলদা বলল : থামলি কেন, পড়ে যা।

তাই পড়লুম : এর সাত বছর পরে, মানে ১৯৩৩ সালে, তৃতীয় অভিযান হয় হিউ রাট্‌লেজের নেতৃত্বে। এঁদের মধ্যে এমন অভিযাত্রী ছিলেন যে আশা করা গিয়েছিল এই দলটি এভারেস্ট জয় করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতি হল এমন প্রতিকূল যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শৃঙ্গ জয় তো হলই না, সাতাশ হাজার চারশো ফুট থেকেই তাঁদের নেমে আসতে হল।

তারপর ?

এর দু বছর পরে একটি প্রাথমিক, পর্যবেক্ষক দল পথ ঘাটের অনুসন্ধান এবং আবহাওয়া ও মৌসুমী বায়ুর গতি বিধি লক্ষ্য করবার জন্যে হিমালয়ে উঠলেন। এই দলের নেতা ছিলেন এরিক শিপটন। তাঁরা খুব সুবিধে করতে না পারলেও পূর্ব পশ্চিমের কয়েকটি শৃঙ্গে উঠতে পেরেছিলেন। পরের বছব হিউ রাটলেজ আবার ওঠবার চেষ্টা করলেন পশ্চিম দিক দিয়ে। কিন্তু এবারে হঠাৎ বর্ষা নেমে গেল, তার সঙ্গে প্রবল তুষারপাত। বাপ বাপ বলে তাঁরা নেমে এসে প্রাণ বাঁচালেন।

তাবপর ?

দু বছর ধরে উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল।

একটা মজা হল এই যে প্রতি বছরেই পুরনো অভিযাত্রী দু চার জন দলে থাকতেন। এই ভাবে টিলম্যান একটি দল গড়ে পঞ্চম বার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু বিপদ সেই একই। তুষারপাত। আর এগোতে না পেরে ছাব্বিশ হাজার দুশো ফুট থেকেই তাঁরা নেমে এলেন। এর পর অনেক দিন সবাই চুপচাপ রইলেন। ১৯৫১ সালে একটি পর্যবেক্ষক দল যাত্রা করল। এই দলের নেতা ছিলেন পুরনো নেতা এরিক শিপটন। হিলারিও ছিলেন এই দলে। সেবারে তিব্বতের মধ্য দিয়ে অভিযান সম্ভব ছিল না, নেপাল সরকার দক্ষিণ দিক থেকে ওঠবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্ষার জন্য কিছুই করা সম্ভব হয় নি।

পরমানন্দ্ বলল : তেনজিং এই দলে ছিল না ?

বললুম : না।

তাহলে কি সে প্রথম বারেই শৃঙ্গ জয় করেছিল ?

তাও না।

তবে ?

বললুম : শোন এইবারে। পরের বছর বসন্ত কালে ষষ্ঠ অভিযাত্রী

দল যাত্রা করল ডুনাণ্টের নেতৃত্বে। এই দলেই তেনজিং ছিলেন শেরপা সর্দার।

কত দূর উঠেছিল তারা?

এঁরা দু দলে ভাগ হয়ে উঠেছিলেন। একটি দল ছাব্বিশ হাজার পঞ্চাশ ফুট উঠেছিল।

মোটে?

আর একটি দল আটাশ হাজার ফুট।

ইস্, অল্পের জন্যে এরাও ফেল হয়ে গেল!

হাবুলদা বলল: পরের দলটিই তো এভারেস্টে উঠল?

না হাবুলদা, ১৯৫১ সালেই পরের দলটি উঠেছিল শরৎকালে। এর নেতা ছিলেন চিভ্যালি। এঁরাও তুষারপাতের জন্যে নেমে আসতে বাধ্য হন। আর এর দু বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে যাত্রা করলেন বিজয়ী দল। এর নেতা ছিলেন কর্ণেল হাণ্ট। এটি অষ্টম দল। এর মধ্যে ছিলেন ইভান্স গ্রেগরি হিলারি নয়েস ওয়ার্ড ওয়েস্টম্যাক্ট চলচ্চিত্রকার স্টবার্ট আর ডাক্তার পাফ। তেনজিং ছিলেন শেরপা সর্দার। তিন সপ্তাহ ধরে এঁরা ট্রেনিং নিলেন ঐ অঞ্চলে। সতেরোই মে তাঁরা প্রথম ক্যাম্প ফেললেন চব্বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখান থেকেই এক একটি দল এক এক দিক দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছাব্বিশে মে ইভান্স তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে উঠলেন আটাশ হাজার সাতশো ফুট।

পরমানন্দ্ বলে উঠল: হায় হায়, মাত্র তিনশো আটাশ ফুট বাকি!

হাবুলদা বলল: তুই হলে লাফিয়েই উঠতে পারতিস, তাই না?

বললুম: হাণ্ট্ তাঁর সঙ্গী শেরপাকে নিয়ে উঠেছিলেন আঠাশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ ফুট। দুদিনের চেষ্টার পর তাঁরা ক্যাম্প তুলে নিয়ে গেলেন সাতাশ হাজার নশো ফুট উঁচুতে। ঠিক হয় যে পর দিন ভোরেই তাঁরা শেষ চেষ্টা করবেন।

হাবুলদা বলল: থামিস নে। পড়ে যা তাড়াতাড়ি।

আমি পড়লুম: তেনজিং ছিলেন হিলারির সঙ্গে। সকাল নটায়

তাঁরা শৃঙ্গের খুব কাছাকাছি পৌঁছলেন, কিন্তু শৃঙ্গে উঠতে তাঁদের আড়াই ঘণ্টা সময় লাগল।

পরমানন্দ্ বলে উঠল : সাব্বাস!

আমি পড়তে লাগলুম : নয়েস তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে শৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। নামবার সময় তেনজিংদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়।

বেচারা।

বলে পরমানন্দ্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জুন মাসের দু তারিখে এই দল ফিরে আসে।

হাবুলদা একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বললুম : আর একটু শুনে যাও।

শেষ হয় নি?

এর পরে যাঁরা এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন তাঁদের নামও আছে। তাঁদের খবর তো আমরা রাখি না, কিন্তু জেনে রাখা ভাল।

হাবুলদা বসে পড়ে বলল : বল্।

আমি পড়লুম : ১৯৫৬ সালে এভারেস্ট জয় করেছিল সুইস্ অভিযাত্রী দল। তাদের মধ্যে ছিল স্মিট মার্মাট বাইস্ট ও রোডল্‌ফ্। আমেরিকান অভিযাত্রী দল তিনবার উঠেছিল ১৯৬৩ সালে। তাদের নেতা ছিলেন ডিবেনফর্ট। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় দল চারবার উঠেছিল, তাদের নেতা ছিলেন কোহলি।

পরমানন্দ্ বলে উঠল : সাব্বাস!

হাবুলদা বলল : তারপর?

এক চীনা অভিযাত্রী দলও ১৯৬০ সালে এভারেস্ট জয় করেছে বলে দাবী করেছে।

আর এখন আমরা জানি যে জাপানের মহিলারাও পিছিয়ে নেই। সে দেশের এক মহিলা অভিযাত্রী দল এভারেস্ট জয় করেছে ১৯৭৫ সালে। এই বই লেখার সময়ে এটুকু আমার নিজের সংযোজন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে হাবুলদা একবার দরজার কাছে দাঁড়াল। তারপর পরমানন্দের দিকে চেয়ে বলল : তুই গোপালের সঙ্গে বেরোস না।

পরমানন্দ্ বলল : কেন হাবুলদাদা ?

বিকেলে আমি এখানকার বাজারটা দেখতে বেরোব। তুই আমার সঙ্গে থাকবি।

আমি বললুম : আমি একটা কথা বলব হাবুলদা ?

হাবুলদা ধমক দিয়ে বলল : যা বলতে চাস বল্ না! ভূমিকা করছিস কেন ?

বললুম : এখানে তো অনেক খরচ পত্র হচ্ছে —

তুই থাম তো গোপাল! তোরা তো আমাদের গেস্ট্! তোদের কাছে টাকা নিলে মা আর মাসিরা আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছিস!

পরমানন্দ্ বলল : কেন, আমরা কি তোমাদের পর হলাম!

হাবুলদা একেবারে জল হয়ে গেল। বলল : আপন পরের কথা নয় রে হাঁদা। কথাটা হল দরকার হলে নিশ্চয়ই নিতাম। ট্যাক্সির ড্রাইভার তো বেরোবার আগেই পেট্রোলের টাকা নিচ্ছে, ম্যানেজারকে দিয়েছি অ্যাড্ভান্স। এখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে বাস ও ট্রেনের টিকিটও কাটা আছে। দু পয়সা যা বাঁচবে, তাতে কিছু কিনে নিয়ে যাব। শুনেছি, এখানে অনেক বিদেশী জিনিস বেশ সস্তায় পাওয়া যায়।

পরমানন্দ্ বলল : ঠিক বলেছ হাবুলদাদা, ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তবে চেকিং আছে বীরগঞ্জে।

জানি।

বলে হাবুলদা বেরিয়ে গেল। আর পরমানন্দ্ বলল : তুমি এই বারে একটু চোখ বুঁজে আরাম করে নাও গোপালদাদা, তা না হলে রাতে ঘুম পাবে।

সেই ভাল। বলে কাগজপত্র সামলে রেখে আমি চোখ বুঁজলুম।

২৬

চোখ বুঁজে শুয়ে পড়তেই আমার পুরনো ভাবনা এসে চেপে বসল। হাবুলদা বাজারে যাচ্ছে বিকেলে। বুঝতে পারছি যে পরিবারের সবার জন্যে টুকিটাকি কিছু কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার পরিবার নেই, এমন কারও কথা মনে পড়ছে না যার জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেতে পারি। নিজেকে বড় হতভাগ্য বলে মনে হল।

স্বাতির কথা আমার মনে এল। সে কলকাতায় থাকে না, থাকে দিল্লীতে। বিয়ের জন্যে কলকাতায় এসেছিল বড়দিনের সময়ে। পুরীতে কালীঘাটের হালদার মশায়ের কাছে শুনেছি যে সে বিয়ে ভেঙে গেছে। তিনি নিজেই নাকি কোন কৌশলে বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। কথাটা সত্য কিনা তা জানি না। কলকাতায় ফিরে খোঁজ নিতে যাই নি সঙ্কোচে। তারপর ভেবেছি যে তারা নিশ্চয়ই দিল্লীতে ফিরে গেছে। কিন্তু স্বাতিব জন্যে কি আমি কোন উপহার কিনে নিয়ে যেতে পারতুম! টাকা দিয়ে কেনা উপহার যে তার কাছে মূল্যহীন তা আমি তার সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছি। তার কাছে মূল্যবান কী, তারও আভাস পেয়েছি খানিকটা। সে অর্থ প্রতিপত্তির চেয়ে শিল্প সংস্কৃতিকেই বেশি ভালবাসে, ভালবাসে সঙ্গীত সাহিত্য ও স্বাধীনতা। এই জগতের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত পাখির মতো উড়ে যেতে চায় আনন্দলোকে অমৃতের আস্বাদের জন্য। কোন বন্ধন ভালবাসে না বলেই সংসারে আবদ্ধ হতে চাইছে না। তার সঙ্গ পেতে হলে পৌঁছতে হবে তার ভাবের জগতে।

সেবারে দিল্লীতে আমি তার একটুখানি পরিচয় পেয়েছিলুম।

তাদের কাছে গিয়ে অবধি আমি একখানি সেতার দেখছিলুম ঘরের কোণায় টাঙানো আছে। জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কে বাজায় এটা?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হেসেছিল। আমি বলেছিলুম, তোমারই সম্পত্তি বুঝি! কিন্তু আমি জানতুম না তো!

সব কথাই যে জানতে হবে তার কী মানে আছে!

এক সঙ্গে থেকেও জানি নে, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

দিন কয়েক এক সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাকেই কি এক সঙ্গে থাকা বলে!

বলেছিলুম, তর্ক থাক, কিছু বাজিয়ে শোনাও।

স্বাতি সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিল, সঙ্গত করতে পারবে?

বলেছিলুম, আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বাজনা শুনতে চাই। তবলার সঙ্গত না হলেও আমি তোমার হাতের স্থুর উপভোগ করতে পারব। মানে, তোমার দিকে যখন চাই তখন আমি তোমাকেই দেখি, রাণার পাশে তোমাকে কেমন মানাবে সে কথা ভাবি নে।

স্বাতি বলেছিল, সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জানো না, এই তর্কে তুমি তারই প্রমাণ দিচ্ছ।

তা হয়তো দিচ্ছি, কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীত শাস্ত্রসম্মত না হলেও তাতে কোন ভেজাল নেই। তোমার স্থুরও খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই আঘাত করবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুরু করতে পার।

স্বাতি বলেছিল, আর একটা বাধা আছে। এখন বিকেল, এ সময়ের কোন রাগিনী আমার জানা নেই।

জানালার দিকে চেয়ে বলেছিলুম, সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। তার জন্যে শুনেছি অনেক রাগিনী আছে।

শ্রীরাগ আমার ভাল লাগে না।

তবে বসন্তের কোন রাগিনী বাজাও, চৈত্র এখনও শেষ হয় নি।

আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে। তাকে কি ফিরিয়ে আনতে পারব কোন দিন?

তারপর বলেছিল, রাত গভীর হোক. তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাব। সেই আমার মনের সুর হবে।

সেদিন আমি স্বাতির এই ক্ষোভের জবাব দিতে পারি নি। এলাহাবাদেব জ্ঞানশঙ্করবাবুব উত্তাধিকাবী হতে আমি রাজী হয়েছিলুম। তাই সেদিন স্বাতি আমাকে এই কথা বলতে পেরেছিল। কিন্তু কেন আমি রাজী হতে বাধ্য হয়েছিলুম, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারি নি। সে যে অর্থের জন্য নয়, তা কেউ বিশ্বাস কববে না। কিন্তু সে কিসের জন্যে, তা আমার কাছেই অবিশ্বাস্য। এমন আবেগ আমার কোন দিন ছিল না। তাই বলেছিলুম, রাতাবাতি আমার জীবনের মূল্য বদলে যাবে, সে কি কম কথা!

স্বাতি স্তম্ভিত হয়েছিল আমার কথা শুনে, ক্ষুব্ধও হয়েছিল। বলেছিল, রাতারাতি তোমার জীবনের আদর্শ বদলে যাবে, এ কথা আমি ভাবতেও পারি নি। এই পবিবর্তনেব কথা বিশ্বাস করতেও আমাব সময় লাগবে।

একটু থেমে বলেছিল, পয়সাব প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি না। জীবন ধারণের জন্যে তাব প্রয়োজন যত, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে। তোমাব পয়সা ও প্রতিষ্ঠা থাকলে এই পরিবারের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ যে অন্য রকম হত, তাও স্বীকাব করি।

মনে মনে আমিও এ কথা মানি বলে নীরবে ছিলুম। আর স্বাতি বলেছিল, কিন্তু তার জন্যে কি জীবনটা বিকিয়ে দিতে হবে!

বিকিয়ে দিলুম কোথায়?

বিকোনো আর কাকে বলে গোপালদা? কোথায় রইল তোমার স্বাতন্ত্র্য, তোমার স্বাধীনতা! জীবনের লক্ষ্যকে অনুসরণ করবার স্বাধীনতাই যদি ঘুচে গেল তো ভারী একটা দেহ বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কোথায়!

জীবনের আবার লক্ষ্য কী?

বাধা দিয়ে স্বাতি বলেছিল, আমাকে ঠকাতে চেয়ো না গোপালদা, ঠকাতে পারবেও না। তোমাকে যদি না চিনতাম, তবে এমনি করে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি হয়তো হত না। রাণাবাবু এই রকম কাজ করলে আমি হাততালি দিয়ে নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দিতাম।

আমি জানি যে একজনের মনের উপরে জোর খাটে না আর এক জনের। তাইতেই বোধহয় মন জানাজানির আকুতি বুকের ভিতরে ঠেলে ওঠে। বাহিরটা নিয়ে যে সুখ সে ক্ষণকালের, সেই মোহ উত্তীর্ণ হলেই চাই মনের সংবাদ। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই দেহটা মরে যায়, মরণ নেই মনের। সেদিন আমার মোহ ভঙ্গ হচ্ছিল। তাই বলেছিলুম, রাণার সঙ্গে আমার প্রভেদটা তো আমি খুঁজে পাই নি!

স্বাতি তখনই জবাব দিয়েছিল, আজ পাও না আজ আর কোন প্রভেদ নেই বলে। যেদিন ছিল, সেদিন তোমায় দেখেছিলাম। সে দিনের কথা যে আমি তোমার মতো এমন চট করে ভুলতে পারব না।

কান্নার মতো করুণ শুনিয়েছিল তার কণ্ঠস্বর, আর আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এই ভেবে যে এমন আদর্শবাদী মেয়ে আজও আছে।

রাতে বাহিরে একখানা খাটিয়া নামিয়ে আমি শোবার ব্যবস্থা করেছিলুম। শৈশবের কথা আমার মনে এসেছিল। আর একটা মিষ্টি সুর কানে এসে লাগছিল অনেকক্ষণ থেকে। ভাল করে শুনেই বুঝতে পারলুম যে স্বাতি সেতার বাজাতে বসেছে। ভারি মিষ্টি হাত তার, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছিল আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ, বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমি উৎকর্ণ হয়ে তার বাজনা শুনেছিলুম।

এক সময়ে মনে হয়েছিল যে স্বাতি আমার মনের সুরটি যেন ধরতে পেরেছে। এক মুঠো কাশ ফুলের মতো সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই,

লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গেল। মনে হল যে স্বাতিকে আজও আমি চিনতে পারি নি, তার মনের কথাটি আজও আমার অজানা রয়ে গেছে।

তান শেষ করে স্বাতি তখন ঝালা ধরেছিল। অত্যন্ত দ্রুত উঠছিল ঝঙ্কার। মনে হচ্ছিল, নিজেকে আমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছি। আমার চেতনা বুঝি অবশ হয়ে আসছে। ভুলে গিয়েছিলুম আমার উত্তরপাড়ার ঘর, ভুলে গিয়েছিলুম এলাহাবাদের ঐশ্বর্য আর দিল্লীর দরবার। জগৎটাকেই যেন আব দেখতে পাচ্ছিলুম না। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছিল। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

সকাল বেলায় স্বা ত বলেছিল, কাল বাজনা শুনেছিলে আমার? বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

না, আজ কাঠমাণ্ডুর এই হোটেলে কেউ সেতার বাজাচ্ছে না। পরমানন্দ ঘুমিয়ে পডেছে, তার নাক ডাকছে। কিন্তু আমার আজ ঘুম আসছে না। ঘুম আসবে না জানি। রামলালবাবু হয়তো আমাকে নিয়ে যেতে এখুনি এসে পড়বেন। বেরোতে হবে আমাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি তাঁর কাছে গান-বাজনার কথা শুনতে চেয়েছিলুম, শুনতে চেয়েছিলুম হিমালয়ের কথাও। এই জন্যই তিনি আমাকে তাঁর কোন বন্ধুর কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। আজ তিনি গান বাজনার কথা শোনাবেন না হিমালয়ের কথা, তা জানি নে। হিমালয়ের কথা তো কাগজটাতেই দিয়ে গেছেন, এবারে বোধ হয় গান-বাজনার কথাই শুনতে পাব। তাতে আমার লাভ হবে বেশি। স্বাতির সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় তো তাকে আমি এই কথা শোনাতে পারব। তার সঙ্গে যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সে সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা জানতে চেয়েছে। দেশের মানুষকে জানতে তিন জায়গায় নাকি যেতে হয়—বাজারে মন্দিরে আর গণিকালয়ে নাচ-গানের আসরে। এই তিন জায়গাতেই আছে মানুষের পরিচয়, তার সমাজের রুচি ও সংস্কৃতির বিজ্ঞাপন।

এক সময়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হোটেলের বেয়ারা এসে আমাকে জাগিয়ে দিল। বলল যে রামলালবাবু নিচে অপেক্ষা করছেন।

আমি পরমানন্দকে জাগিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের যদি কোন প্রোগ্রাম না থাকে তবেই আপনি আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন তা না হলে ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

আমি তাঁর কাগজপত্র ফেরৎ দিয়ে বললুম: খুব ভাল লাগল বলে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। দু চোখ ভরে দেখেও সব জানা যায় না তো, তাই শোনবারও দরকার আছে। এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে গুরু ধরবার নির্দেশ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন—এই তিনটেই সমান দরকার কিছু জানার জন্যে।

রামলাল বললেন: বুঝতে পরলাম না।

আমি হেসে বললুম: শুনতে হবে, ভাবতে হবে, তারপর ধ্যান করতে হবে। চলুন, বেরিয়ে পড়ি আমরা।

ম্যানেজার বললেন: সে কি, বিকেলের চা খেয়ে বেরোবেন না?

রামলাল বললেন: ধন্যবাদ, বন্ধুর বাড়িতে একজন অতিথি নিয়ে গেলে এক কাপ চা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, আসুন।

বলে তিনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পথে যেতে যেতে বললেন: আজ আমাদের ভাগ্য ভাল। আমার বন্ধুরও এক বন্ধু এসেছেন। তিনি ট্রেকিং করতে বেরোন ছুটি পেলেই। কর্ণেল রবার্টসের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। একটু পরেই ফিরে আসবেন। তাঁর কাছে আপনি মুক্তিনাথ কেন ভাবতেরও অনেক দুর্গম জায়গার কথা জানতে পারবেন। তবে আপনাকে আগে নিয়ে যাচ্ছি এই জন্যে যে নাচগানের কথাও তো জানতে চেয়েছিলেন। বন্ধুকে চেপে ধরতে পারলে অনেক কথা জানতে পারবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কর্ণেল রবার্টস কে?

রামলাল আশ্চর্য হয়ে বললেন: নাম শোনেন নি তাঁর?

বললুম ঃ না।

টুরিস্ট্ লিটারেচারে তাঁর তোলা ছবি দেখেন নি ?

বললুম ঃ খেয়াল করি নি।

রামলাল বললেন ঃ বরফ পাহাড়ের দারুণ ছবিগুলোর নিচে লেখা দেখবেন—কার্টসি জে এম. রবার্টস।

এবপর রামলাল কর্ণেল রবার্টসের কথা বললেন সংক্ষেপে ঃ পর্বত অভিযানের ব্যাপারে এঁর জুড়ি পাবেন না। তিরিশ বছরেরও বেশি তিনি এই কাজ নিয়ে আছেন। সার্ভে করে পাহাড়ের পথঘাট বার করেছেন, অনেক অভিযানে সাহায্য করেছেন, নিজেও উঠেছেন পাহাড়ে। শুনেছি, কর্ণেল হান্ট্‌কে এভারেস্ট অভিযানে সাহায্য করেছেন এবং নিজে নেতা হয়ে অন্নপূর্ণা ফোর জয় করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এখন কি এখানেই থাকেন ?

রামলাল বললেন ঃ নেপালকে ভালবেসে ফেলেছেন। তাই বাড়ি কবে বাস কবছেন এইখানে। বালাজু ওয়াটার গার্ডেন ছাড়িয়ে একটুখানি এগোলেই তাঁব একটি ছোটখাট দোতলা বাড়ি আছে। এখনও লোকে তাঁব কাছে যায় উপদেশের জন্যে।

কথা বলতে বলতেই আমরা পথ চলছিলুম হেঁটে। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলুম বামলালের বন্ধুর বাড়িতে। সামনের দবজা খোলাই ছিল। বামলাল হেঁকে বললেন ঃ আমরা এসে গেছি।

ডাক শুনেই এক প্রসন্ন চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যেতে। বললেন ঃ আসুন।

রামলাল বললেন ঃ এঁরই নাম গোপালবাবু, ইনি কলকাতা থেকে আসছেন।

আর আমি এখানকারই অধিবাসী, নাম পুষ্করলাল।

রামলাল বললেন ঃ ইনি কিন্তু লেখাপড়া করেছেন আপনাদের মতো, কলেজে ছাত্র পড়ান। আমরা মূর্খ কারবারী বলে আপনাকে যোগ্য লোকের কাছে নিয়ে এলাম।

পুষ্করলাল বললেনঃ এটা ওঁর বিনয়। উনি আমার সঙ্গেই লেখাপড়া করেছেন, এখন বাপের কাজ কারবার দেখছেন।

রামলাল তৎপর ভাবে বললেনঃ বিস্তা সাহেব ফিরেছেন?

এখনই ফিরবেন।

তাহলে

বলে রামলাল আমাব মুখেব দিকে তাকাতেই আমি বললুমঃ তাহলে আমবা নেপালেব নাচগান সম্বন্ধেই কিছু শুনি।

পুষ্করলাল বললেনঃ নতুন কিছু বলতে পাবব বলে মনে হয় না।

কেন?

নেপাল স্বাধীন দেশ হতে পাবে, কৃষ্টি-সংস্কৃতিব ব্যাপাবে তো ভিন্ন দেশ নয়, আমবা ভাবতে থাকলে ভারতীয়, আব নেপালে আছি বলে নেপালী। কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ। কেউ হিন্দু তান্ত্রিক, কেউ মহাযানী বৌদ্ধ। অথবা দুই তুয়ে মিলে নাথ বা অন্য কিছু। আব এই ধর্ম চেতনা থেকেই তো শিল্প সংস্কৃতিব জন্ম। তাই আমাদেব নাচ বলতে পার্বতীব নাচ, কুমাবীব নাচ, গন্ধর্ব-অপ্সরাব নাচ, আব তা না হলে নানা বকমেব মুখোস পবে নাচ। তাবই নাম ক্লাসিকাল ডান্স্। আপনাদেব যে বকম কথক বা ভবতনাট্টম, সে বকম নাচ এদেশে নেই। গানও আপনাদেব মতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নয়। আমাদের দেশেব নাচগানকে আপনি ফোক্ সং বা ফোক্ ডান্স বলতে পারেন। কিংবা তাব চেয়ে কিছু উঁচু জাতেব।

আমি বললুমঃ এতে আপনাদের লজ্জা পাবাব মতো কিছু নেই। আমি বাঙলাব ছেলে, বাঙলাব নিজস্ব বলতে যা ছিল তাকে নিকৃষ্ট মানেব ব্যাপাবই বলা উচিত। কতকটা আদিবাসী নাচগানের মতো। অবশ্য আদিবাসী নাচগানেও মানুষের মন ভোলে। কিন্তু মানেব দিক থেকে তা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা নৃত্যেব মর্যাদা পেতে পারে না।

পুষ্করলাল বললেনঃ আদিবাসী নৃত্যগীতও অনেক সময়ে উচ্চাঙ্গের হয়।

বললুম : শুধু উচ্চাঙ্গের নয়, শিল্প সমন্বিত হতেও দেখা যায়। এই সব নৃত্যের আধুনিক মার্জিত রূপ এখন বিদেশেও আদৃত হচ্ছে বলে শুনতে পাই।

রামলাল বললেন : বাঙলার নাচগানের কথা আপনি ঠিক বললেন না। কাঠমাণ্ডুতেই আমবা বাঙালী নাচগান দেখেছি। নৃত্য নাট্য। আমাদেব সকলেবই তা খুব ভাল লেগেছিল।

বললুম : এই নৃত্য নাট্য ববীন্দ্রনাথেব নিজেব সৃষ্টি। তিনি সাবা ভাবতেব শিল্পীদেব এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং যেখানকাব যেটি ভাল তা এক সঙ্গে কবে নাচ ও গান বেঁধেছেন। নিজে তালিম দিযে শিল্পী তৈবি কবতেন। তিনি না জন্মালে গর্ব কববাব মতো বাঙলাব কিছু ছিল না।

কিন্তু তখনি মনে পড়ে গেল যে এখানে আমি নিজেব কথা বলতে আসি নি, এসেছি এঁদেবই কথা শুনতে। তাই একই নিঃশ্বাসে বললুম : আপনাদেব নাচ গানেব কথা বলুন এবাবে।

পুষ্কবলাল বললেন : অনেকেব ধাবণা যে শিবেব তাণ্ডব নাচ থেকে এখানকাব লাস্য নাচেব জন্ম এবং মেযেবা এই নাচ শিখেছে পার্বতীব কাছ থেকে। এব বৈশিষ্ট্য হল হিমবাহেব মতো ধীব মন্থব গতি। ধান নাচ আধুনিক বীতিতে হলেও এব সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম ভাবনাব যোগ আছে। গুরুংবা যে নাচ নাচে তা নাকি কৈলাস অঞ্চলেব নাচ। তাদেব ধাবণা যে এই নাচ শিব নাচতেন এবং তিনিই গুরুংদেব এই নাচ শিখিযছিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এই বিশ্বাস কি এখনও আছে?

আছে বলেই তো তাবা এই বকমেব কথা বলে!

তাবপর?

এ দেশে আবও অনেক নাচ আছে—দেবী নাচ, মহাকালী নাচ, বজ্রযোগিনী নাচ, বরাহ নাচ, নরসিংহ নাচ, বুদ্ধ বন্দনা—এ সমস্ত খুব প্রাচীন নাচ। মন্দির ও পুরনো ঘরবাড়ির কাঠের ওপরে এই সমস্ত

নাচের ভঙ্গির নানারকম কারুকার্য আছে। কুসুমঘাটু, সধাঘাটু, লগ্‌মা ও কেলগ্‌মাও খুব পুরনো নাচ। গুরুংদের সোরাথি নাচ ও গান নেপালী সেনাবাহিনীর খুব প্রিয় নাচ। এতে একজন পুরুষ তার দুদিকে দুজন স্ত্রীকে নিয়ে নাচে। শিবের নাকি দুই স্ত্রী ছিল পার্বতী ও গঙ্গা এবং তিনি দুজনকে দুদিকে নিয়ে নাচতেন। কেউ বলেন, ইন্দ্র তাঁর দুই স্ত্রী উষা আর নক্তকে নিযে নাচ্ছেন।

তারপর ?

পোখরা উপত্যকায় গেলে আপনি সরস্বতী নাচ দেখতে পাবেন। নাচের অনেক নাম আছে—জোগিরা, তামাং সেলো, তুঙ্‌না, জয়াপু, আরও নানা নাম। এই সব নাচের সঙ্গে মাদল বাজবে, বাজবে ডম্ফু ও ধিমে। পাহাড়ী অঞ্চলে বাদ্যযন্ত্রও আছে নানা রকম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিয়েব সময়ে ববেব বাড়িতে বস্তেলি নাচ হয়, তীজ উৎসবের সময়ে হয় সঙ্গিনী নাচ, এ ছাড়া বোধিঘর নাচ, রাখাল নাচ —

বললুম ঃ বুঝেছি। নাচের নামেব কোন শেষ নেই।

ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ তারপব গান। সব ঋতুতে সব মাসের আছে লোকগীতি। পূর্ব দিকেব পাহাড়ী অঞ্চলের গান হল হক পারা। বাই আব লিম্বুরা এই গানে ওস্তাদ। অচ্ছুৎদের গান বাজনাব চল আছে—গায়েনদের 'গায়েন গীত আর প্রেমের গান হল মায়ালু গান আর রেল্লি মাই। তফাৎ হল আনন্দ ও বেদনার সুবে।

তারপর ?

নেওয়াবীদেব আছে বাবো মাসের গান। ভারি মিষ্টি এই সব গানের সুর। বসন্তকালে চৈতে গীত হল বিরহের গান। বর্ষায় শাওনে গীত গায় নববধূ তার শ্বশুর বাড়িতে বাপের বাড়ির কথা মনে কবে। মাদলে গানের সঙ্গে নাচও আছে। গুরুং মেয়েরা রোদ্দি গান গায়। ধর্মানুষ্ঠানে ও সামাজিক উৎসবের সময়ে হকপারা বা লয়াবারি গানের প্রচলন আছে। এই সব নাচে বাজি ফেলাও হয়

ছেলে ও মেয়ের দলের মধ্যে। হেরে গেলে পুরুষদের জরিমানা দিতে হয়, আর জিতলে মেয়েদের বিয়ে করতে পারে।

আমি বললুম: ভারি মজার ব্যাপার তো!

ভদ্রলোকও হেসে বললেন: মেয়ে পছন্দ না হলে হেরে গিয়ে জরিমানা দেওয়াই ভাল। দুর্গা পুজোর সময়ে মাল সিরি গানের চল আছে। মহাভারত ও রামায়ণের গানকে সিলোক গান বলে। মনে হয় যে শ্লোক শব্দটি থেকেই সিলোক শব্দটি এসেছে। ভুয়ারি গান হল ছেলে মেয়েদের প্রেমের গান, ক্ষেত খামারে কাজ করতে করতে এই গান গাইবার চল।

রামলাল এবারে সহাস্যে বললেন: নাচ গানের যে আবার এত নাম আছে, তার কোন ধারণাই আমার ছিল না।

পুষ্করলাল বললেন: এখনও নাম বলা শেষ হয় নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তিহারে ভায়লো গান গায় মেয়েরা বড়দের শ্রদ্ধা জানিয়ে। পর দিন লক্ষ্মীপুজোর রাতে গাইতে হয় দেওসি। এই গানের ধুয়ো হল দেওসিস।

মনে হল যে দেবতার আশিসকেই দেওসিস বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু জানতে চাইবার আগেই পুষ্করলাল বললেন: সয়াই গান হল গাথা গল্প গাইবার গান। এতে ঐতিহাসিক ঘটনা সুর করে গাওয়া হয়। আর ধর্মের কাহিনী গাওয়া হয় বলন গানে। মাদল আর খইচণ্ডি বাজনার সঙ্গে গায়করা দলবদ্ধ হয়ে এই গান গায়।

বুঝতে পারলুম যে খইচণ্ডি কোন বাদ্যযন্ত্রের নাম। এর আগেও তিনি ডম্ফু ধিমে প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। ভেবেছিলুম যে এইবারে বাদ্যযন্ত্রের কথাও জেনে নেব। কিন্তু তার আগেই এক ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল বাহিরে। পুষ্করলাল উঠে গেলেন।

২৭

ঘরের বাহির থেকে পুষ্করলালের কণ্ঠস্বব শুনতে পেলুম। বললেন ঃ এসো কৈলাসপতি, তাড়াতাড়ি এসো, বাঁচাও আমাকে।

আগন্তুক ঘরের ভিতরে পা দিয়ে বললেন ঃ বিপদটা কিসের ?

পুষ্কবলাল সহাস্যে বললেন ঃ তুমি নেই বলে এই বাঙালী মহাশয়কে আমার নাচগানের কথা বলতে হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ বলতে কষ্ট হচ্চে ?

তা হবে না !

তবে এক কাজ কর। কথায় নাচ বোঝাবাব চেষ্টা না করে নেচে ডেমন্‌স্ট্রেশন দিয়ে দাও। আমি ডমরু বাজাতে জানি।

বলে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ ডমরু জানেন তো ! ডুগডুগি। ডুগডুগির সঙ্গে পুষ্কর ভাল নাচে।

ভদ্রলোক যে রসিক লোক তা বুঝতে পারলুম। পুষ্করলাল আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ ইনিই সেই বিখ্যাত ট্রেকাব কৈলাসপতি বিস্তা।

আর আমি একজন অখ্যাত টুরিস্ট্ গোপাল।

বলে নমস্কার বিনিময় করলুম তাঁর সঙ্গে। তারপরে বললুম ঃ এভারেস্ট অভিযানের কথা পড়লুম। খুব ভাল লাগল। অনেক কথাই আমার জানা ছিল না।

কী রকম ?

বললুম ঃ ১৯৫৩ সালের ঘটনা তো, প্রায় সব কথাই ভুলে গিয়েছিলুম। আর তার আগে এভারেস্ট জয়ের চেষ্টার কথা তো জানতুমই না। সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই, এভারেস্ট নামটা যে ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের নামে, তাও আমার জানা ছিল না।

কৈলাসপতি হাসছিলেন। তাই দেখে আমি বললুম: কিন্তু কোথা থেকে এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করতে হয়, সেই কথাটা পাই নি।

কৈলাসপতি বললেন: চলুন না আমার সঙ্গে, একেবারে কাছে থেকে আপনাকে এভারেস্ট দেখিয়ে আনি।

বললুম: কত দূর যেতে হবে?

যাবেন আপনি?

মনসা মানে কল্পনায় ঘুরে আসতে পারি। নিয়ে যাবেন?

ঘরে বসেই এভারেস্ট দেখে আসতে চাইছেন।

পুষ্করলাল বললেন: তুমি তো অনেকবার ঘুরে এসেছ জানি। বল না তোমার অভিজ্ঞতার কথা, আমরাও শুনি।

রামলাল বললেন: আমার একটু কাজ ছিল।

পুষ্করলাল গম্ভীর ভাবে বললেন: চায়ের পর কাজের কথা বোলো।

এই সময়েই চা এল এবং তার সঙ্গে ঘরে তৈরি খাবার। বাড়ির গৃহিণী নিজেই এ সব আনলেন, তাঁকে সাহায্য করলেন পুষ্করলাল। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলাকে নমস্কার করলুম। তিনি প্রতিনমস্কার করে হাসলেন, কিন্তু কোন কথা না বলেই ভিতরে চলে গেলেন। মনে হল যে ইনি তাঁর স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। এটা এই পরিবারের বা সমাজের নিয়মও হতে পারে।

চা খেতে খেতেই কৈলাসপতি আমাদের বললেন: কাছে থেকে এভারেস্ট দেখতে হলে আপনাকে নাম্‌চে বাজার যেতে হবে আগে।

সে আবার কোথায়?

কাঠমাণ্ডু শহর থেকে দেড়শো মাইল উত্তর-পূর্বে। পায়ে হেঁটে যেতে আসতে বত্রিশ দিন সময় লাগবে।

পুষ্করলাল বললেন: সংক্ষেপে এই পথের কথা বল।

প্রথম দিন তুমি বানেপা পৌঁছবে, তার পরদিন দোলাল ঘাট—

বাধা দিয়ে পুষ্করলাল বললেন: এসব নাম আমরা মনে রাখতে পারব না। পথে দেখবার মতো কিছু থাকলে সেই কথা বল।

কৈলাসপতি বললেন : নাম্‌চে বাজার পৌঁছতে লাগবে চোদ্দ দিন। বাজার আছে কয়েক জায়গায়, শনিবার হাট বসে অনেক জায়গায়। পথে অনেক নদী আর খোলাও পেরোতে হবে—সঙ্কোশি তামাকোশি দুধকোশি লিখুখোলা রিঙ্গমোখোলা লামডিংখোলা।

পুষ্কবলাল বাধা দিয়ে বললেন : এ সব নামে আমাদের কোন দরকাব নেই। দেখবার কী আছে বল।

কৈলাসপতি বললেন : বানেপা থেকে জিরি পর্যন্ত পাহাড় আর তাব ঢালে ধান আব ভুট্টাব চাষ। জিবিতে পৌঁছে দেখবে গৌরীশঙ্কর। লিখুখোলার উপত্যকাটিও সুন্দব। আব দুধখোলা এই পথের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। এখান থেকে হিমালয়েব অনেকগুলি তুষার শৃঙ্গ খুব কাছে থেকে দেখা যায়। এই পথে যাবার সময় হল এখন—ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। এর পর বর্ষা বাদ দিয়ে অক্টোবর নভেম্বর।

আমি বললুম : নাম্‌চে বাজারে দেখবার কী আছে?

সমুদ্রতল থেকে ন হাজার দুশো ফুট উঁচুতে শেরপাদের একটি সুন্দর গ্রাম। প্রায় শ খানেক বাড়ি আছে এই গ্রামে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে এলে চলবে না। ছ মাইল দূরে থিয়াংবোচে গ্রাম এগার হাজার চার শো ফুট উঁচুতে। দু ঘণ্টাতেই পৌঁছনো যায় পাহাড়ের মাথায়। আর সেখান থেকে দেখবে সাগরমাতাকে লোৎসে আর নুপ্‌ৎসের মাঝখানে। গ্রাম থেকে তফাতে দেখবে একটি গোম্ফার সোনার চূড়া দিনের আলোয় ঝকমক করছে। অপরূপ দৃশ্য।

এখান থেকেই ফেরা তো?

ইচ্ছে থাকলে প্যাং বোচে বা খুম্বুও ঘুরে আসতে পাবো। প্যাংবোচেও একটি শেবপা গ্রাম, তার উচ্চতা তেবো হাজার ফুট। আর খুম্বু উপত্যকা না দেখে এ অঞ্চল থেকে ফিরে এলে পস্তাতে হবে।

কেন?

এ জায়গার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। পাহাডের গায়ে রডোডেনড্রন ফুলের শোভা, আর বরফে ঢাকা সাগরমাতার পথ।

এক দিকে নীল আকাশের গায়ে দেখবে মুপৎসে, অন্য দিকে পুমারি শৃঙ্গ যেন এই উপত্যকার রক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপত্যকার উপরের দিকে খুম্বু হিমবাহও দেখতে পাবে। আর —

অমি বললুম ঃ বলুন।

এই উপত্যকার থামি গ্রামে জন্মেছেন আমাদের সবার প্রিয় তেনজিং নোরকে, সাহেবরা যার নাম দিয়েছে টাইগার অফ দি স্নো, বরফের বাঘ। আর এখানকারই খুমজং গ্রামে শেরপা ছেলেদের জন্যে আধুনিক স্কুল খুলে দিয়েছেন এভারেস্ট জয়ী এড্‌মণ্ড্ হিলারি। এই সব দেখে শুনে ফিরতে আপনার বত্রিশ দিন লাগবে।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ সঙ্গে কী নিতে হবে ?

সাধারণ গরম জামা কাপড় আর কম্বল নিলেই চলবে। বানেপায় মিশন হাসপাতাল আর জিরিতে সুইস হাসপাতাল আছে। জুন-বেসিতে আছেন ডক্টর একলফ। কিন্তু নিজেদের সঙ্গেও কিছু ওষুধ রাখা দরকার। যেমন ম্যালেরিয়ার দু হপ্তা আগে থেকেই ক্লোরোকুইন খাওয়া উচিত, পেটের জন্যে সালফাগোয়ানিডিন, জল পরিষ্কার করার ওষুধ, ওরিও মাইসিন পেনিসিলিন। তবে এ সবই তো পুরনো ওষুধ। ডাক্তার হয়তো আপনাকে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা দেবেন।

চা খাওয়া শেষ করে রামলাল বিদায় নিলেন। পুষ্করলালকে বলে গেলেন আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে। কিন্তু পুষ্করলাল তখন গল্পে মজে গেছেন, বললেন ঃ হেলাম্বুও তো শেরপাদের গ্রাম !

কৈলাসপতি বললেন ঃ হেলাম্বু কাঠমাণ্ডু থেকে বত্রিশ মাইল দূরে। উচ্চতাও মাত্র আট হাজার ফুট। তাছাড়া বর্ষা ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে সেখানে যাওয়া যায় বলে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর জেনে রাখো যে হেলাম্বু একটা শেরপা গ্রাম নয়, হেলাম্বুতে অনেকগুলি শেরপা গ্রাম আছে। হেলাম্বু পাহাড়ের নামেই এই অঞ্চলের নাম হেলাম্বু হয়েছে। এখানকার আবহাওয়া যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর এখানকার দৃশ্য !

পুষ্করলাল বললেন : যেতে আসতে কদিন লাগে বল।

দশ বারো দিনেই ঘুরে আসা যায়। সুন্দরীজল তো জানো? এখান থেকে ছ মাইল দূরে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখান থেকে আটশো ফুট চড়াই উঠতে হবে ছ মাইলে। সে জায়গার নাম মূল খারকা। খসকুবাস ছ মাইল দূরে, আটশো ফুট নেমে যেতে হবে। তারপব বোরলাং পর্যন্ত আবার ছশো ফুট চড়াই, পথ সাত মাইল। সাত হাজার ফুটে পাতিভঞ্জিয়াং আট মাইল দূরে।

তারপর?

বাকি আর কতটুকু রইল? মাইল তিনেক! এখান থেকে পূব দিকের পথ ধরে যাওয়াই ভাল। মাঝপথে তারাং মারাং।

আমি বললুম : কী দেখবার আছে সেখানে?

কৈলাসপতি বললেন : পেঙ্গ্রি হিমল নামে একটি গিরিশৃঙ্গের কোলে এই জায়গা। স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। যদি বসন্তের শেষে কিংবা গ্রীষ্মের প্রথমে যান তো রডোডেনড্রনেব বাহার দেখতে পাবেন—লাল আব সাদা ফুলে আলো হয়ে থাকে চারিদিক। মানুষগুলোও যেমন সুন্দর, তাদের ব্যবহারও তেমনি মিষ্টি। এই হাসিখুশি জাতের শেরপাদের সঙ্গে মেলামেশা করেও আনন্দ পাবেন।

আমি গোঁসাই কুণ্ডের নাম শুনেছিলুম। গোঁসাই কুণ্ড ঘুরে এসে গল্প করেছেন অনেকেই, কিন্তু তাঁদের কাউকে আমি চিনি না বলে জায়গাটার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। তাই বললুম : গোঁসাই কুণ্ড কি এই দিকে?

কৈলাসপতি বললেন : গোঁসাই কুণ্ড নেপালের খুব বড় তীর্থ, কিন্তু পথ অন্যত্র আর দূরও বেশি নয়, কিন্তু উচ্চতার জন্যে বেশ কষ্টসাধ্য। হেলাম্বু থেকেও গোঁসাই কুণ্ডে যাওয়া যায় উত্তরে পনর হাজার ফুট উঁচু একটি গিরিসঙ্কট দিয়ে। দূরত্ব বারো মাইল। কিন্তু এখান থেকে আপনাকে যেতে হবে ত্রিশূলির পথে। দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল। যাতায়াতে বারোদিন সময় লাগবে।

উচ্চতা কত ?

ষোল হাজার ফুট। ল্যাঙ্‌ট্যাঙ্‌ হিমল শৃঙ্গের নিচে ১৬,৭৪৬ ফুট উঁচু এই অঞ্চলকে নেপালের লেক ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারেন। ছোট বড় অনেকগুলো হ্রদের মধ্যে গোঁসাই কুণ্ডই সবচেয়ে বড়। আর এটি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। যেতে হয় এপ্রিল থেকে জুন বা সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। গোঁসাই কুণ্ড থেকে কিন্তু ফিরবেন সুন্দরীজল হয়ে। আর খাবার জিনিসপত্র সবই সঙ্গে নেবেন।

কী দেখবার আছে ?

কৈলাসপতি বললেন : গোঁসাই কুণ্ডের পথে আপনি সাতটা লেক দেখবেন সরস্বতী কুণ্ড রক্ত কুণ্ড দুধ কুণ্ড নাগ কুণ্ড সূর্য কুণ্ড ভৈরব কুণ্ড ও গোঁসাই কুণ্ড। সূর্য কুণ্ডের জল পূর্ব থেকে পশ্চিমে নাগকুণ্ড পর্যন্ত যুক্ত। প্রথমের কুণ্ডটি দেখে ভাববেন না যে সেটি গোঁসাই কুণ্ড, তার ধার দিয়ে এগিয়ে যাবেন। দুটি কুণ্ডের মাঝখান দিয়ে আছে চলার পথ। সাবধানে এগিয়ে যেতে হবে। হয়তো ঝির ঝির করে বরফ পড়বে মাথার ওপর, কুয়াশায় ঢেকে যাবে সব কিছু। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেই গোঁসাই কুণ্ডের ধারে পৌঁছে যাবেন। মনে হবে শ্রম আপনার সার্থক হয়েছে।

এত সুন্দর ?

পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এক সুবিশাল জলাশয়, তার চারি দিকে পাহাড়। নীল জল টলটল করছে, তাতেই ছায়া পড়েছে চারিদিকের পাহাড়ের। যদি তুষারপাত হয়ে থাকে, তো সে রূপের তুলনা শুধু পোখরাতেই পাবেন। পোখরার কথা আপনাকে পরে বলব।

এই গোঁসাই কুণ্ড কি মানস সরোবরের মতো তীর্থস্থান ?

মানস সরোবরের মতো কিনা জানি না, তবে নেপালীদের কাছে সেই রকমই বটে।

সেখানেও কি তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে হয় ?

কৈলাসপতি বললেন: না। লেকের ধারে ধর্মশালা আছে পাথরের। পাশাপাশি অনেকগুলি কুটীর, তার দেওয়াল পাথরের, কিন্তু ওপরে কাঠেব তক্তা বিছিয়ে ছাদ। অনেক সময়ে বরফ গড়িয়ে পড়ে কাঠের ফাঁক দিয়ে।

কোন মন্দিব নেই?

শিবলিঙ্গ আছেন খোলা ময়দানে একটা বেদীর ওপরে, সামনে পাথরের নন্দী। আব কয়েকটা উঁচু বাঁশের গায়ে লাগানো পতাকা। গোঁসাই কুণ্ডেব জলে স্নান কবে যাত্রীবা এই শিবেরই পুজা কবে চন্দন মাখিয়ে। গোঁসাই কুণ্ডের ধাবে দাঁড়িয়ে আপনি চারিদিকের অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন—গণেশ হিমল, ল্যাঙ্ট্যাঙ্, লিরুঙ্ ও দোর্জে লাক্পা গিরিশৃঙ্গ। পথে দেখতে পাবেন রডোডেনড্রনের সমারোহ, অগণিত ইয়াক, আর অনেকগুলি বৌদ্ধ গোম্ফা। না গোপালবাবু, কষ্ট আপনার ব্যর্থ হবে না। একবার লম্বা ছুটি নিয়ে আসুন। আগে থেকে জানালে নেপাল সবকারেব অনুমতি আমরা নিয়ে বাখব।

অনুমতির দরকার হয় নাকি?

কৈলাসপতি বললেন: সব দেশেই এ সবের দরকার হয়। বসন্ত-পুবে টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকেই অনুমতি পাওয়া যাবে। এ একটা ফর্মালিটি, আর কিছু নয়।

এই সময়ে আমার রাপ্তি ভ্যালির কথা মনে পড়ে গেল। বললুম: পোখবার কথা শোনবার আগে রাপ্তি ভ্যালির কথা কিছু বলবেন?

কৈলাসপতি বললেন: রাপ্তি ভ্যালি যেতে ট্রেকিংএর দবকার নেই। কাঠমাণ্ডু শহরে আপনি মোটবে চাপবেন, আর দেড়শো মাইল দূরে গিয়ে এই উপত্যকায় নামবেন।

জায়গাটা কোথায়?

কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণ-পশ্চিমে। উত্তরে মহাভারত ও দক্ষিণে শিবালিক এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে রাপ্তি উপত্যকা। এই অঞ্চলকে ইনার টেরাই বা ভিতরি মাধেশ বলে। এই ঘন অরণ্যে নানা রকমের জন্তু

জানোয়ার আছে। এক শৃঙ্গের গণ্ডার হাতি বাঘ চিতেবাঘ—এ সবই আছে। এটির নাম হয়েছে মহেন্দ্র ন্যাশনাল পার্ক। বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য। এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম ভরতপুর—মোটরের পথ আছে, এরোপ্লেনেও যেতে পারেন। আর একটি ছোট শহর হল নারায়ণ গড়। নারায়ণী নদীর ধারে এই শহর। নদীতে মাছ আছে, কুমীরও আছে। ইচ্ছা করলে কুমীর শিকার করতে পারেন, নৌকোয় বেড়াতে পারেন।

পুষ্করলাল এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এইবারে বললেন: গোপাল-বাবুর কি শিকারেরর শখ আছে?

কেন বলুন তো?

রাপ্তি ভ্যালির কথা জানতে চাইলেন কিনা, তাই মনে হচ্ছে হয়তো শিকারের শখ আছে।

হেসে বললুম: আমরা শিকার করি কলম দিয়ে। বন্দুক হাতে নিতে ভয় পাই।

কিন্তু পুষ্করলাল বললেন: শিকারের শখ থাকলে তার ব্যবস্থাও হতে পারে। সিংহ দরবার থেকে ফী দিয়ে লাইসেন্স পাওয়া যায়। আর যা শিকার করবেন তার জন্যেও দাম দিতে হয়।

দাম?

হ্যাঁ। এক এক জন্তুর জন্যে এক এক দাম। বাঘের জন্যে পাঁচ শো-ই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু হরিণের দাম কুড়ি থেকে তিনশো।

এ রকম কেন?

কস্তুরি মৃগ তিনশো টাকা, সোয়াম্প্ ডিয়ার বা সাম্বর দুশো টাকা, অথচ হগ ডিয়ার বার্কিং ডিয়ার অ্যান্টিলোপ এ সব কুড়ি টাকা। নীল গাই দশ টাকা। মনে হয়, যে প্রাণী কম আছে তার দাম বেশি।

বললুম: বোধহয় তাই।

এই সময়ে রামলালবাবু ফিরে এলেন। বললেন: একটা ভাল খবর নিয়ে এলাম।

কী খবর ?

আপনার হোটেলের সামনে দিয়ে আসছিলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, হোটেলে এখন আপনাদের দলের কেউ নেই।

অন্ধকার নেমেছিল অনেকক্ষণ আগেই। ঘরের বাতি জ্বেলেছিলেন পুষ্করলাল। হাবুলদাদের প্রোগ্রাম আমি জানি। তারা বাজারে যাবে টুকিটাকি জিনিস কিনতে। কিন্তু রামলাল বললেন: তাঁরা সোয়াল্‌টি হোটেলে ডিনার খেতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।

পুষ্করলাল বললেন: এটা তো খারাপ খবর।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: খারাপ খবর কেন ?

আপনি আমার এখানে আটকা পড়ে গেলেন, তা না হলে আপনিও তাদের সঙ্গে যেতে পারতেন!

কিন্তু তাহলে যে আমি বড় জিনিস হারাতুম।

সেটা কী ?

বললুম: যে কথা এতক্ষণ ধরে শুনেছি, আর এর পরেও যা শুনব বলে আনন্দ পাচ্ছি!

কৈলাসপতি বললেন: আপনি ঠিক এ কালের মানুষ নন।

বলবেন, পাগল। এই তো ?

না। পাগল বলব না। কারণ আমিও তো পাগল। তা না হলে এই পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে আনন্দ ছাড়া আর কী সঞ্চয় করেছি! কিন্তু আমার কাছে যা আনন্দ, অন্যের কাছে তো তা বিষাদ!

পুষ্করলাল বললেন: আর এক রাউণ্ড চা হোক, তারপর পোখরা ও মুক্তিনাথের কথা হবে।

২৮

ভিতর থেকে ঘুরে এসে পুষ্করলাল বললেন : বল এইবারে!

কৈলাসপতি বললেন : কিছু দিন আগেও কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরায় হেঁটে যেতে হত, তা না হলে এরোপ্লেনে। প্লেনে চড়বার পয়সা তো সকলের নেই, তাই হাঁটা ছাড়া অন্য গতি ছিল না।

আমি বললুম : হেঁটে যাতায়াতে কদিন সময় লাগত ?

পাক্কা পনর দিন।

দূরত্ব কত ?

তিরানব্বই মাইল। কিন্তু সমস্ত পথটা হাঁটতে হত না। এখান থেকে কাকনি হয়ে ত্রিশূলি পর্যন্ত মোটরের পথ ছিল। ত্রিশূলি এখান থেকে পঁচিশ মাইল, কিন্তু মোটরের পথ হল চুয়াল্লিশ মাইল। হেঁটে গেলে একটা ঐতিহাসিক শহর আমাদের দেখা হয়ে যেত।

কোন শহর ?

গোর্খা। রাজা পৃথ্বিথনারায়ণ শাহর রাজধানী। এখান থেকেই তিনি কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় এসে ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করে নেপালকে এত বড় করেছিলেন।

এখন সেখানে কী দেখবার আছে ?

কৈলাসপতি বললেন : কালিকা আর গোরখনাথের মন্দির। জানেন তো, গোরখনাথের নামেই শহরের গোরখা নাম হয়েছে, আর এখানকার লোকেরাও গোর্খা নামে পরিচিত হয়েছে।

বললুম : অনেকেই গুর্খা বলেন।

ও একই কথা। গোরখনাথ থেকে গোর্খা হওয়াই উচিত, গুর্খা

বললেও দোষ নেই। আর সাহেবরা ইংরেজীতে দেশী কথার বানান যা লিখে গেছেন, তার থেকে মূল শব্দটি বার করা আজকাল দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাই না?

বললুম: খুব ঠিক কথা। আমাদের দেশের শহরগুলোর নামও এমন পাল্টে যাচ্ছে যে কোন্ শহর তা বোঝা কঠিন হচ্ছে। এই ধরুন না, বরোদার নাম হয়েছে ভাদোদরা, উটাকামণ্ডের নাম উতগমণ্ডলম। বলে না দিলে কি কিছু বোঝা যাবে?

সত্যিই বিপদের কথা।

পুষ্করলাল বললেন: গোর্খায় আর কী দেখবার আছে বল।

মনকামনা নামে একটি তীর্থস্থান আছে নিকটে।

জানি জানি, নাম শুনেছি এই তীর্থের।

শুনবেই তো। তোমরা যে যাও নি, এটাই আশ্চর্যের কথা। তা না হলে এই মনকামনায় তীর্থ করে আসে নি, এমন লোক সে অঞ্চলে কম আছে। নাম শুনেই তো বুঝতে পারছ যে সে তীর্থে গেলে কোন মনকামনাই অপূর্ণ থাকে না।

আমি বললুম: কাঠমাণ্ডু থেকে গোর্খা শহরেব দূরত্ব কত?

কৈলাসপতি বললেন: ত্রিশূলি বাজাব থেকে সমরি ভঞ্জিয়াং আর কাটুঞ্জে হয়ে গোর্খা যেতে হবে। তিরিশ মাইলের মতো পথ। সোজা কথায় গোর্খা হল কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা যাবার প্রায় মাঝ পথে।

বললুম: সত্যিই সোজা হিসেব। এবাবে পোখরায় কী দেখবার আছে, তাই বলুন।

কৈলাসপতি বললেন: এরা সবাই পোখরা গেছে, এরাই বলুক।

বলে রামলালের দিকে তাকালেন।

রামলাল সেই পুরনো সুরে বললেন: আমি হলাম কারবারী মানুষ। পাহাড়ের শোভা বর্ণনা করব আমি!

পুষ্করলাল বললেন: একজনেরই বলা ভাল। ভনিতা না করে তুমিই বলে যাও।

কৈলাসপতি বললেন: পোখরা শব্দটির মানে বোধহয় জানেন! কথাটা পোখ্‌রা নয়, পোখরা বা পোখারা। পোখর আপনাদের পুকুর থেকে এসেছে। আসলে পুকুরও নয়, হ্রদ অর্থাৎ লেক। নেপালে তাকেই পোখরা বলে।

আমি বললুম: গোঁসাই কুণ্ডও তো লেক। তাকে তো পোখরা বলেন নি!

সে কথাও ঠিক। মনে হচ্ছে যে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় পোখরা শব্দটি তেমন প্রচলিত নয় বলেই গোঁসাই কুণ্ড বলা হয়েছে।

বাধা দিয়ে বললুম: কেন, ভাদগাঁওএ সিদ্ধ পোখরি দেখেছি, রাণী পোখরির নাম শুনেছি।

কৈলাসপতি সহাস্যে বললেন: হেরে গেলাম আপনার কাছে। দেখা যাচ্ছে যে হিমালয়ে এই হ্রদ বোঝাতে অনেক শব্দের ব্যবহার আছে। তিব্বতে পাশাপাশি দুটি লেক, তার একটির নাম রাক্ষস তাল আর একটির নাম মানস সরোবর।

বললুম: তিব্বতী ভাষায় কিন্তু মানস সরোবরের নাম সোমাভাং বা সো মাফ্‌ম। তবে কুমায়ুনে শুনেছি হ্রদকে তাল বলে— নৈনিতালের কাছে এই রকম অনেক তাল আছে।

কৈলাসপতি বললেন: পোখরাতেও লেককে তাল বলে —ফেওয়া তাল এই উপত্যকার সব চেয়ে বড় লেক, তারপর রূপা তাল, বেগনস তাল, খস্তে তাল, দেপাং তাল—আরও অনেক তাল আছে।

পুষ্করলাল হাঁ-হাঁ করে বললেন: থাক থাক, এক সঙ্গে অত তালে সব বেতাল হয়ে যাবে!

বলে ভিতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সস্ত্রীক ফিরে এলেন চা নিয়ে। সবার হাতে একটি করে পেয়ালা ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে স্ত্রীকে বিদায় দিলেন।

বললুম: পোখরা খুব আকর্ষণীয় স্থান বলে মনে হচ্ছে না।

কৈলাসপতি বললেন : এক রাত্রি বাস করলে বুঝতে পারবেন সকাল বেলায়।

কী রকম ?

এখান থেকে তো আর কষ্ট করে যাবার দরকার নেই। প্লেন আগে ছিল, এখনও আছে। নতুন পথও তৈরি হয়ে গেছে। মোটরে বা বাসে এক দিনেই পৌঁছে যাবেন—এখান থেকে সকালে বেরোলে বিকেলে গিয়ে চা খাবেন পোখরার হোটেলে। তারপর রাত্তে ঘুমিয়ে ভোরবেলায় হোটেলের জানালা খুলে দেখবেন। জীবন সার্থক হয়ে গেছে যদি না ভাবেন তো বুঝব যে হিমালয়ে আসবার আর আপনার দরকার নেই।

রামলাল বললেন : গোপালবাবুকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল।

বলছি। সাধারণত সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকে, আর সেই জন্যে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি খুব ভাল দেখা যায়। তারপর মেঘ জড়ো হয়ে ঢেকে ফেলে এই দৃশ্য। তবে সব দিন এক রকম নয়। কখনও সকাল বেলাতেই মেঘলা থাকে, আকাশ পরিষ্কার হয় পরে। তাই বিকেলে পৌঁছবার পরেও এই দৃশ্য দেখবেন ভাগ্যে থাকলে।

বললুম : কোন্ কোন্ চূড়া দেখা যায় ?

একেবারে পশ্চিমের দিকে ধৌলাগিরির খানিকটা, তারপর অন্নপূর্ণা এক আর তিনের মাঝে মচ্ছপুছরে, তারপর অন্নপূর্ণা চার আর দুই, লামজুং হিমল, পূবের দিকে মানসলুর, পাশে গণেশ হিমল ও ল্যাংটাংও অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। রূপে আপনাকে মুগ্ধ করবে মচ্ছপুছরে।

এই নামটি এ রকম অদ্ভুত কেন ?

শৃঙ্গটি দেখতে অনেকটা মাছের লেজের মতো—মৎস্যপুচ্ছ, চলতি কথায় মচ্ছপুছরে।

রামলাল বললেন : অন্নপূর্ণার চারটি শৃঙ্গ। কিন্তু এক এক জায়গা থেকে এক এক রকম দেখা যায়।

বললুম : তাইতো দেখছি।

রামলাল বললেন : আমি বোধহয় আপনাকে বলেছি যে দামন থেকে অন্নপূর্ণা তিন আর দুইএর মাঝখানে মচ্ছপুছরে, এক আর চার দেখা যায় না। আবার নগরকোট থেকে ধৌলাগিরি আর অন্নপূর্ণা একের মাঝে মচ্ছপুছরে।

কৈলাসপতি বললেন : কাছে থেকে দেখছি বলেই এই রকম হয়, দূরে গেলে বা উপরে উঠলে এ রকম দেখাবে না। অনেক সময়েই একটা পাহাড় আড়াল করে আর এক পাহাড়কে।

রামলাল বললেন : দামন থেকে আমরা সাগরমাতা লোৎসে মাকালু দেখি, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাই নে। অথচ নগরকোট থেকে এদের ঠিক পাশেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পাই।

কৈলাসপতি বললেন : দার্জিলিঙ থেকে যেমন দেখি, কাঞ্চনজঙ্ঘার সে রূপ কি আর কোনখান থেকে দেখতে পাই! পাগল করা রূপ। পোখরাতেও মচ্ছপুছরের রূপ এই রকমই। আরও একটা আকর্ষণ আছে তার। ফেওয়া তালে প্রতিবিম্ব পড়ে এই পাহাড়ের। জল যখন কাঁপে তখন এই পাহাড়ের ছবিও কাঁপে, ভেঙে ভেঙে যায় তার রূপ। এ সব কি আর বর্ণনা করে বোঝানো যায়! নিজের চোখে দেখে চোখ আর মন জুড়োতে হয় এক সঙ্গে।

বললুম : খাঁটি কথা।

কৈলাসপতি বললেন : পোখরা একটা শহর ভাববেন না, কাঠমাণ্ডুর মতো এ একটা বিরাট উপত্যকা, ধৌলাগিরি ও অন্নপূর্ণা হল এই উপত্যকার প্রহরা। ইচ্ছে করলে আপনি পায়ে হেঁটে আরও কাছে গিয়ে দেখতে পারেন এই দুটি শৃঙ্গ। পোখরার উচ্চতা মাত্র তিন হাজার ফুট। আর এই শহর থেকে অন্নপূর্ণা পঁচিশ মাইল দূরে। যে পথে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গে আরোহণ করতে হয়, সেই পথেই এগিয়ে গিয়ে খুব কাছে থেকে আপনি দেখতে পারেন।

বললুম : হিন্দুতীর্থ মুক্তিনাথে নাকি পোখরা থেকেই যেতে হয়?

কৈলাসপতি বললেন : ঠিকই বলেছেন। পোখরা থেকে পথ

মাত্র আটষট্টি মাইল, সময় লাগে ছ দিন। এই পথে সব চেয়ে বড় গ্রাম হল টুকুচে, চার দিন হেঁটেই আপনি সেখানে পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে মুক্তিনাথ তুদিনের পথ। টুকুচের উচ্চতা বেশি নয়, মাত্র চার হাজার সাতশো ফুট। সেখান থেকে কেবল চড়াই। তু দিনে আপনাকে বারো হাজার তুশো ফুট উঁচুতে উঠতে হবে। তার মানে আঠারো মাইলে সাড়ে সাত হাজার ফুট।

পথ কঠিন বলুন।

তেমন কঠিন হলে যাত্রীর ভিড় হত না, মেলা বসত না সেখানে।

পুষ্করলাল বললেন: পথে কিছু দেখবার নেই?

কৈলাসপতি বললেন: প্রথমে দেখবে রূপসে ছাহাবা জলপ্রপাত। এমন সুন্দব জলপ্রপাত সচরাচর চোখে পড়বে না।

কেন?

দিনেব বেলায় অনেকবাব তার জলের ধারায় ইন্দ্রধনুর রঙ দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যি।

পোখরায় গেলে দেখে এসো এই জলপ্রপাতটা।

তারপর?

তারপর তাতোপানিতে গরম জলের কুণ্ড।

আমি বললুম: মুক্তিনাথে দেখবার কী আছে?

প্যাগোডা স্টাইলে বিষ্ণুর মন্দির, তার ওপরে সোনার চূড়ো। আর একশো আট জলের ধারা। খানিকটা দূরে জওয়ালা মাইএর মন্দির। কিন্তু এটাই মুক্তিনাথের সব নয়। এই পথের সৌন্দর্যই সকলের তীর্থ। সমস্ত পথেই আপনি অন্নপূর্ণা মচ্ছপুছরে ও ধৌলাগিরির বরফে আচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গগুলি দেখতে পাবেন। আবার পোখরা থেকে দশ মাইল দূরে নৌদাণ্ডা পৌঁছেই পিছন ফিরে দেখবেন পোখরা উপত্যকা আর ফেওয়া তাল।

আমি বললুম: মুক্তিনাথের কথায় কিন্তু আমার মন ভরল না।

প্রতি বছর কত যাত্রী কত কষ্ট স্বীকার করে যায় সেখানে। শুধু কি দুটি মন্দির আর একশো আটটি ধারা দেখেই ফিরে আসে ?

রামলাল বললেন : খুব সংক্ষেপে বলার জন্যেই মন ভরে নি।

কৈলাসপতি হেসে বললেন : একটা রাত আপনাকে মুক্তিনাথের ধর্মশালায় থাকতে হবে। কষ্ট হবে খুবই।

কেন ?

যেমন নোংরা, তেমনি তার দুরবস্থা। মেঝে ভাল নয়, ছা..র ফুটো দিয়ে বরফ পড়ে, জানালার ফাঁক দিয়ে হিমেল হাওয়া ঢোকে সারাক্ষণ। আগুন জ্বেলে ঘুমোতে হয় রাতে। যা সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাই রেঁধেই খেতে হবে। কিন্তু চারি দিকের দৃশ্য অপরূপ, অন্নপূর্ণা ঘিরে রেখেছে মুক্তিনাথের ছোট উপত্যকাটি। পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ঝর্ণা নেমে এসেছে, নিচে কালী গণ্ডকাতে গিয়ে মিলেছে। এরই ধারা থেকে নালা কেটে এনে একশো আটটি মুখ বার করা হয়েছে মন্দিরের কাছে। পেতলের মুখ—কোনটি ড্র্যাগনের, কোনটি বা হাতি ঘোড়া বা উটের মুখ। মন্দিরে চতুর্ভুজ নারায়ণ, কিন্তু মুখ দেখে বুদ্ধের মূর্তি বলে মনে হবে। তাঁর দু দিকে দুটি স্ত্রী মূর্তি। লক্ষ্মী বামে, দক্ষিণে কে তা বলতে পারব না। তবে পেছনে সহস্র ফণা বিস্তার করে আছেন নাগরাজ বাসুকি। আমি বললুম : নারায়ণের মূর্তি বুদ্ধের মতো হল কেন ?

কৈলাসপতি বললেন : তার একটা কারণ আছে। মন্দিরে আসবার পথে সারি সারি ধর্ম চক্র সাজানো দেখা যায়। তাদের গায়ে লেখা ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। মন্দিরে যে দুজন পুজারী আছেন, তাঁদের একজন বৌদ্ধ বলে শুনেছি। গ্রামে যখন মেলা বসে দুর্গা পুজোর সময়, তখন তিব্বত থেকেও নাকি অনেক যাত্রী আসে এখানে। তারপর গ্রামবাসীরা আর এখানে থাকে না। মেলা ভাঙলে তারাও নিচে নেমে যায় শীতের ভয়ে। তারপর—

বলুন।

মুক্তিনাথের মন্দির থেকে অল্প দূরে জওয়ালা মাইএর মন্দির। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে পাতাল গঙ্গা।

তার মানে কি অন্তঃসলিলা, অর্থাৎ মাটির নিচে দিয়ে বয়ে গেছে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এক জায়গায় একটি গর্ত আছে, সেখান থেকেই জল পাওয়া যায়। আর যা বলছিলাম, জওয়ালা মায়ের মন্দির দেখে মনে হবে যে সেটি একটি বৌদ্ধ গোম্ফা। মন্দিরের ভেতরে পাথরের বেদীর ওপরে সোনার বুদ্ধ মূর্তি বিশাল আকারের। মূর্তির সামনে অনেকগুলি প্রদীপ জ্বলে। পূজারী একজন তিব্বতী বৌদ্ধ। দেওয়ালের ফ্রেস্কো আর অন্যান্য পট ও ছবি দেখেও এটি বৌদ্ধ গোম্ফা বলে মনে হবে।

তবে জওয়ালা মাইএর মন্দির বলে কেন?

খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। এরই অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি সেই বুদ্ধ মূর্তির বেদীর নিচে একটি গর্ত দেখতে পেয়েছিলাম, সেখানে কোন গ্যাস থেকে আগুন জ্বলছে।

বললুম: কাংড়া উপত্যকার জ্বালামুখী'তে এই রকম দেবী আছেন শুনেছি।

জ্বালামাতাই তো জওয়ালামাই। তাঁর ওপরে বসে আছেন বুদ্ধ। ব্যাপারটা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।

কী রকম?

এ অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধে কোন প্রভেদ নেই। দেবতা এখানে সবারই এক। যে শিল্পী মুক্তিনাথ গড়েছে, তার কাছে বিষ্ণু আর বুদ্ধে কোন পার্থক্য নেই।

বললুম: আমার আর একটি কথা জানবার আছে। এই অঞ্চলে শুনেছি নারায়ণ শিলা মানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। কথাটা কি ঠিক?

ঠিকই। এই শিলা কালীগণ্ডকীতে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় দামোদর কুণ্ডে।

সেই কুণ্ড কোথায় ?

কৈলাসপতি বললেন : মুক্তিনাথ থেকে উত্তরে চার দিনের পথ, পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে যেতে হয়। সেখানকার উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুট। গ্লেসিয়ারের জল থেকে এই কুণ্ডের উৎপত্তি। গোঁসাই কুণ্ডের মতো এটি নেপালের একটি বড় তীর্থ।

অন্দর মহল থেকে ডাক এসেছিল। পুষ্করলাল ঘুরে এসে সবিনয়ে বললেন : আমার স্ত্রী এক কেলেঙ্কারি করে বসে আছেন।

সে আবার কী !

অনুগ্রহ করে এই গরিবের ঘরেই কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

রামলাল চেঁচিয়ে উঠলেন : এ কী অন্যায় কথা !

আমি বললুম : আমার জন্যে কেন তিনি কষ্ট করলেন !

কিন্তু পুষ্করলাল কারও উত্তর না দিয়ে কৈলাসপতিকে বললেন : এই শালগ্রাম শিলা জিনিসটা কিসের ?

কৈলাসপতি বললেন : কালো অ্যামোনাইট ফসিল।

বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। তাই দেখে ভদ্রলোক বললেন : মেসোজয়িক এরায় এগুলি ছিল। তারপর মরে ফসিল হয়ে গেছে। এই জন্যেই লোকে বলে যে কোটি কোটি বছর আগে যেখানে সমুদ্র ছিল, সেখানেই এখন হিমালয়। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী এখন ফসিল অবস্থায় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বিশ্বকোষে আমি পড়েছি যে শালগ্রাম শিলা গণ্ডকী নদীতে জাত বজ্রকীটকৃত চক্রযুক্ত শিলা। পুরাণে আছে যে বিষ্ণু শিলাচক্র রূপে জগতে প্রকট হয়েছিলেন। তাই শালগ্রামের পূজা এ দেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে যে বিষ্ণু তুলসীর পতি শঙ্খচূড়ের বেশে তাকে সম্ভোগ করলে সেই সাধ্বী স্ত্রী তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন, তুমি পাষাণ হও। এরই উত্তরে বিষ্ণু বলেছিলেন, তোমার শাপে আমি গণ্ডকীর তীরে শিলা হয়ে থাকব। সেই সময়ে বজ্রকীট কৃমি ও বজ্রদংষ্ট্রেরা সেখানে

শিলাবৃহরে আমার চক্র কাটবে। কিন্তু পুরাণের এ সব কথা আমি এঁদের কাছে বললুম না। তার বদলে বললুম: এবারে আপনাদের দেশের একখানা গান শুনতে পেলে ধন্য হব।

রামলাল বললেন: গোপালবাবু যখন বলছেন, তখন একখানা গান শুনিয়ে দাও না।

পুষ্করলাল তাকালেন কৈলাসপতির দিকে। কৈলাসপতি সহাস্যে বললেন: তোমরা গান জানো, অথচ গাইতে চাও না। আমি গান জানি না, পথ চলতে গ্রামের লোকের মুখে শুনে শিখেছি কয়েকটা লোকগীতি। কিন্তু তা গাইতে আমি একটুও লজ্জা পাই নে।

আমি বললুম: বেশ তো, শোনান আমাদের।

কৈলাসপতি খালি গলায় গাইলেন—

সুন জাসতো নেপাল কে রম্‌রো দেখছ হ,
স্বর্গ ছহ সন্‌সারম্‌।
সুন জাসতো প্রেম্‌লে সুন জাসতো দেখছ হ,
মায়াকো সন্‌সারম্‌।

আমি বললুম: মানেটা খুব ভাল মনে হচ্ছে।

কৈলাসপতি বললেন: হ্যাঁ। আমাদের সোনার নেপাল দেখতে কত সুন্দর, এই পৃথিবীতে যেন স্বর্গ। আর প্রেমের জগতে আমার প্রিয়া যেন দেখতে ঠিক চাঁদের মতোই সুন্দর।

পুষ্করলাল হেসে বললেন: তোমার হিমালয়ের গান শোনাও না।

কৈলাসপতি হাসতে হাসতেই গাইলেন

হিমালই ছুলি তয়ো পরিবত
হিউন কাইলে জমিন্‌ ছহ?
বাগে কো পানি উরেকো চিত্ত,
কহস গয়ি থামিল্‌ ছহ?

এর মানে কী?

হিমালয়ের শৃঙ্গে কখন বরফ জমবে ? বেগবতী নদী আর উড়ন্ত চিত্ত, এরা কোথায় গিয়ে থামবে ?—

হিমালই ছুলি কে য়তি রুমরো, -
সর্পকে কাঞ্চুলি।
য়ো পাপী মন্‌ম বিরহ ছল্‌য়ো,
ন বাজাউ বান্‌স্থুরি।

সাপের খোলসের মতো হিমালয়ের শৃঙ্গ কত সুন্দর। আমার মনের দুঃখ ভারাক্রান্ত কবেছে এই পাপী। তুমি আব বাঁশরী বাজিও না।

গানের সুরের সঙ্গে তাল দিচ্ছিলেন পুষ্করলাল। কিন্তু এর পরেই খাবার ডাক এল অন্দর মহল থেকে। আমরা উঠে পড়লুম। আজকের সন্ধ্যাটি আমার কাছে পবম মূল্যবান বলে মনে হল।

২৯

পরমানন্দেব সঙ্গে হাবুলদা হোটেলেব সামনেব বাস্তায় পায়চারি করছিল। আমাকে দেখতে পেযেই বলে উঠল : তোব আজ এত দেরি হল! নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

বললুম : আমি খেয়েই এসেছি।

অ্যাঁ, কী খেয়েছিস! ছাইপাঁশ গিলিস নি তো!

বলে হাবুলদা আমাব কাছে এসে আঘ্রাণে কিছু অনুমানের চেষ্টা কবল, তাব পবে বলল : ছাং ফাং খেয়ে এসেছিস কিনা সত্যি করে বল্।

বললুম : ছাং আবাব কী?

হাবুলদা বলল : সে কি বে, এ দেশেব লোকের সঙ্গে এত ঘোরা-ঘুবি কবছিস আব ছাং কী তা জানিস নে! হোটেলেব ম্যানেজাবকে বলব এক গ্লাস দিতে?

বললুম : বুঝেছি।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, এ দেশের ধেনোব নাম ছাং। আব এতে কারও বিশেষ আপত্তি নেই। অনেক পবিবাবে সবাই খায়, এমন কি মায়ে তার কোলেব বাচ্চাকেও খাওয়ায়। আব তুই তা না চেখে চলে এলি, কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

পরমানন্দ বলল : জল খেয়েছিলে গোপালদাদা?

বললুম : নিশ্চয়ই খেয়েছি।

চা?

তাও খেয়েছি দুবার।

তবে তার সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছিল, তুমি বুঝতে পার নি।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : এ সব কথা তোমরা কোথায় শুনলে ?

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : ভাল জায়গায়।

পরমানন্দ বলল : বাজারে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর কাছেই আমরা অনেক কথা জানতে পারলাম।

হাবুলদা বলল : ওপরে চল্, তোকে সব বলছি। তোর কাজে লেগে যাবে।

আমি বললুম : তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

সেই বাঙালী পরিবারেই খেলে নাকি ?

তা খাব কেন! আমরা হোটেলে ফিরে এসে তোর জন্যে অপেক্ষা করলাম অনেকক্ষণ।

পরমানন্দ বলল : তারপর ভাবলাম, তুমিও হয়তো কোন শো দেখছ, তাই আমরা খেয়ে নিলাম।

বললুম : ভাল করেছ।

ওপরে এসে হাবুলদা আমাদের ঘরে ঢুকে বসল। বলল : তোর কথা আগে বল্।

বললুম : এক ট্রেকার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর কাছে হিমালয়ের অনেক কথা শুনলাম।

শুধু হিমালয়ের কথা ?

হ্যাঁ, তাও শুধু নেপালের হিমালয়, ভারতের বা ভুটানের হিমালয় নয়। তোমরা কী করলে ?

হাবুলদা বলল : প্রথমেই বাজারে গেলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, বাবা মার জন্যে নেপাল থেকে গরম চাদর কিনে নিয়ে যাব। দু একজনের গায়ে দেখেছিলাম, বেশ গরম জিনিস। ঐ হতভাগা ড্রাইভার না থাকলে এ সবের দোকানই খুঁজে পেতাম না। একটা সরু গলির ভেতর কাঠের দোতলায় উঠতে হল। তারপর স্টক দেখে অবাক। যত জিনিস, তত খদ্দের। আমি তো সস্তায় দুখানা কিনে

নিলাম। কিন্তু নীরার আর কিছুতেই পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত যেটা ওর পছন্দ হল, তার দাম শুনে চোখ উঠল চড়ক গাছে।

আমি বললুম : কত ?

পরমানন্দ্ বলে উঠল : দামেব কথা থাক না হাবুলদাদা !

হাবুলদা হেসে বলল : দামটা ও দিয়েছে বলেই লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু নিজের জন্যে ও কিছুই কিনল না।

পরমানন্দ্ বলল : আমি ভুবার কাববাবী, ও সব শৌখিন জিনিস কি আমার গায়ে মানায় !

বললুম : তোমাব বাবা মাব জন্যে নিতে পারতে।

তাহলে মার খেতে হত।

কেন ?

পরমানন্দ্ হেসে বলল : অপব্যয় করাব জন্যে। নিতান্ত দরকার না হলে কোন জিনিস কেনা ওঁরা পছন্দ করেন না।

আমি বিনয়ের কথা জানতে চাইলে হাবুলদা বলল : ও কয়েকটা বিদেশী সার্ট কিনেছে।

সে সব কি নিয়ে যাওয়া যায় ?

দোকানদার বলল : ব্যবহার করলে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই একটা সার্ট পরে নিল, একটা আজ রাতে পরে শোবে, কাল একটা পরে বাসে উঠবে, আর একটা দিয়ে জুতো পুঁছে নেবে সকালে। বাক্সগুলো দোকানেই ফেলে এসেছে।

হাবুলদা এবারে নিজের পকেট থেকে একটা কলম বার করে বলল : এটা তোর জন্যে।

পরমনান্দ্ বলল : জাপানী কলম।

কলমটা আমি কপালে ঠেকিয়ে খুলে দেখলুম। চমৎকার দেখতে। বললুম : তোমার নিজের জন্যে কী কিনলে হাবুলদা ?

হাবুলদা বলল : পরমানন্দ্ আমাকে একটা কলম উপহার দিতেই আমি তোর জন্যে এটা কিনলাম। কোথায় কিনলাম জানিস ?

এই হোটেলেরই দোকানে। বিনয়দের ডিনার খেতে পাঠিয়ে দিয়ে এখানে আমাদের কোন কাজ ছিল না। তো, তাই।

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল : তোর মন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল কেন ?

বললুম : কাল ভোরেই আমরা ফিরে যাচ্ছি, তাই না হাবুলদা ?

হ্যাঁ। কিন্তু তোর কি ফেরার ইচ্ছে নেই ?

না, তা নয়।

তবে ?

আমি যে তোমাদের কাউকে কিছু দিতে পারলুম না !

হাবুলদা একটা ধমক দিয়ে বলল : দূব পাগল ! এই যে তোকে একটা কলম দিলাম, এই কলমে তো তুই সবাইকে উপহার দিবি। বেশ জমিয়ে লেখ্ তো নেপালের কথা !

সে ক্ষমতা থাকলে কি আর জমিয়ে লিখতুম না হাবুলদা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখক হয়ে যেতুম।

হাবুলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এ আমাদের দুর্ভাগ্য রে ! পেটের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকতে হয় সারা জীবন। অথচ বিদেশে শুনেছি কেউ একখানা বই লিখছে খবর পেলে প্রকাশকরাই তার সব খরচ যোগায়। লেখকের আর রোজগারের ভাবনা থাকে না।

বললুম : আমাদের দেশে তা স্বপ্নের কথা।

হাবুলদা বলল : এইবারে তোকে একটা কাজের কথা বলি।

বল।

পরমানন্দের দিকে চেয়ে হাবুলদা বলল : কী রকম করে আরম্ভ করি বল্ তো পরমানন্দ্।

পরমানন্দ্ বলল : সরাসরি বল। 'লুকোছাপির দোরকার কী

দোরকার কি রে, দরকার বল্।

ও একই কথা হল।

হাবুলদা বলল : দূর গাধা, কাজের সময়েই তোর কথাগুলো মেড়োর মতো শোনায়।

পরমানন্দ্ বলল : এই তোমাদের দোষ হাবুলদাদা, বাঙলার বাইরের মানুষকে তোমরা মানুষ বলেই ভাবো না। উড়ে মেড়ো খোট্টা এই সব বল তাদের। কিন্তু তারা কি তোমাদের কিছু বলে!

হাবুলদা বলল : বললেই পারে। ঘটি বাটি বাঙাল বাহে এ সব নাম তো আমাদের আছে!

পরমানন্দ্ বলল : তোমরা নিজেরাই এই সব নাম দিয়েছ, তাই না গোপালদাদা?

আমি হাবুলদাকে বললুম : কী বলতে চাইছ তা বলে ফেল। সঙ্কোচ করলেই সঙ্কোচ বাড়বে।

ঠিক বলেছিস।

বলে হাবুলদা বলল : কী ভাবে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না।

আমি তাড়া দিয়ে বললুম : তুমি কি আমাকে তোমার প্রেমিকা ভাবছ নাকি, যে প্রেম নিবেদন করতে লজ্জায় মরে যাচ্ছ!

হাবুলদা বলল : ওরে গাধা, এ তার চেয়েও কঠিন কাজ! যে কাজ আমার মা ও মাসিরা পারে নি, সে কাজের ভার তারা আমার ওপরে দিয়েছে। তুই চুপ করে আছিস কেন?

বলে পরমানন্দের দিকে চাইতেই পরমানন্দ্ বলল : আমি তোমার মতো রেখে ঢেকে কথা বলতে ভালবাসি না।

তবে তুই বল্ না কথাটা!

পরমানন্দ্ বলল : বুঝলে গোপালদাদা, তুমি নীরাকে বিয়ে কর।

আমি!

হাবুলদা বলল : নীরার মতো ভাল মেয়ে হয় না।

আমি বললুম : সেই জন্যেই তো বলছি, সে আমার মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করবে কেন! আর বিয়ে করে বউকে বা আমি খাওয়াব কী! নিজেই তো খেতে পাই নে।

হাবুলদা বলল : বাজে কথা রেখে দে তো। আজ তোর অবস্থা ভাল না হতে পারে, কিন্তু চিরকাল তো এ রকম থাকবে না।

সে রকম দিন যদি আসে, তো নিশ্চয়ই বিয়ে করে সংসারী হব।

হাবুলদা বলল : আসবে রে আসবে। জীবনের শুরুতেই সবার সে দিন আসে না, ধৈর্য ধরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

তবে তোমরাও একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর না।

তুই নীরাকে বিয়ে করবি কথা দিলেই আমরা অপেক্ষা করব।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কী?

তোমরা কি অনির্দিষ্ট কাল নীরাব বিয়ে না দিয়ে আমার মতো একজন কেরানীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে?

তুই কথা দিলে কেন থাকব না!

নীরার নিজের কোন মত নেই?

নিজেব বিয়ের ব্যাপারে তার আবার মত কী থাকবে! আমরা যেখানে তার বিয়ে ঠিক করব, সে সেখানেই বিয়ে করবে।

তোমরা?

হাবুলদা বলল : আমরা মানে তার অভিভাবকরা। তার বাবা মা যা ঠিক করবেন, তাই হবে। তাঁরা এ ভার আমাকেই দিয়েছেন, তোর মত আদায় করতে পারলেই এ বিয়ে পাকা হয়ে যাবে।

আমি বললুম : একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব হাবুলদা?

কর্।

বললুম : তুমি এখনও বিয়ে কর নি কেন?

হাবুলদা সঙ্গে সঙ্গে বলল : পছন্দমতো মেয়ে পাই নি বলে।

তার মানে তোমারও একটা পছন্দ আছে, এই তো?

আছে বৈকি। কিন্তু তোর কি নীরাকে পছন্দ নয়?

না, সে কথা নয়। আমি তোমার কথাই জানতে চাইছি। কী রকম মেয়ে তোমার পছন্দ?

হাবুলদা বলল : দেখ, আমি মাস্টার মানুষ। একটা ছোট কলেজে লেকচারার হয়ে ঢুকেছি। এখান থেকে একটা বড় কলেজে যাবার ইচ্ছে। কিন্তু শুধু একটা এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে আর এগোনো যায় না। হয় একটা ডক্টরেট যোগাড় করতে হবে, নয় মামার জোর চাই। হঠাৎ বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়লে তা আর সম্ভব হবে না।

আমি বললুম : হাবুলদা তোমার বাবা মা আছেন, তবু তুমি এই রকম ভাবছ। কিন্তু আমার কে আছে বল! কোন্ জোরে আমি ওপরে ওঠার স্বপ্ন দেখব বলতে পার? সাধ কি আমারও নেই?

হাবুলদা গম্ভীর ভাবে বলল : ঠিক বলেছিস।

বললুম : তোমার কাছে নিজের অবস্থা আমি লুকোব কেন! তোমরাই তো আমার আপন জন।

না, তোকে আমি কিছু লুকোতে বলছি না।

বললুম : আমাদের মতো অবস্থার লোকের কী করা উচিত জানো? ঠিক নিজের মতো অবস্থার একটি মেয়ে ঘরে আনা। আমার মতোই একটা খেটে খাওয়া অনাথ মেয়ে। সংসারের জন্যে দুজনে সমান খাটব। ঠিক বলি নি পরমানন্দ ভাই?

পরমানন্দ বলল : তা না হলে আজকাল চলে না। দিনকাল দিন দিন খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছে।

একটা ঢোক গিলে বলল : এই আমাদের কথাই ধর না। আমার বাবার ভুরার কারবার। দু পয়সা আছে। কিন্তু আমার মাকে সারা দিন খাটতে হয়। না খাটলে চলে না। আমার মা বলেন, বাড়ির বউ হল লক্ষ্মী, একটা পয়সা বাঁচাবার জন্যে তাকে জান দিতে হবে, নিজের জন্যে খরচ করলে চলবে না।

হাবুলদা বলল : তোদের তো পয়সার কোন অভাব নেই রে! তুই বিয়ে করছিস না কেন?

পরমানন্দ বলল : আমি মূর্খ লোক, তার ওপর বাঙলা ভাল জানি না। বাঙালীরা আমাকে বাঙালী বলে মানে না, আর

গোরখপুরায়ারা বাঙালী বলে ঘৃণা করে। আমি কোথায় মেয়ে পাব বল হাবুলদাদা!

হাবুলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তিনজনেরই সমান অবস্থা দেখছি। নে, তোরা শুয়ে পড়্ তাহলে। কাল ভোরে আবার উঠতে হবে। প্রথম বাসটাই যে আমাদের ধরতে হবে তা জানিস তো?

বলে আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম: জানি।

কিন্তু আমি তো দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোতে পারব না, বিনয়দের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

কেন, কখন ফিরবে তারা?

তার কি কোন ঠিক আছে! বিনয়ের তো আবার একটু-আধটু চলে শুনেছি। নীরাকেও খাইয়ে না ছাড়ে! তারপর ফ্লোর শো। কত রাত অবধি চলবে তা ভগবানই জানেন।

বলে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাবুলদা বেরিয়ে গেল।

পরমানন্দ বলল: গোপালদাদা, তুমি বুদ্ধিমান লোক আছ, সমঝ্‌দার লোক!

কেন?

নীরাকে বিয়ে করলে তুমি ওর খরচা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাবে। ও ঘরের কাজ শিখল না, পড়া লিখা ভি করল না। হাবুল-দাদাকে সত্যি কথা বলে তুমি ভাল করেছ। তোমার কথাটা হাবুলদাদা বুঝেছে। তাই আর জোর করল না।

বলে জামা খুলে সে শুয়ে পড়ল। আমি একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ঘরের বাতি নিবিয়ে দিলুম। জামা খুলে শোবার সময় আমার স্বাতির কথা মনে এল। বারে বারে ঘুরে ঘুরে তার কথাই আমার মনে আসে। কিছুতেই তাকে আমি ভুলতে পারি না।

সেবারে দিল্লী থেকে আমি ফিরছিলুম একা। স্টেশনে পেঁ ৗছে দিতে এসেছিলেন মামা মামী। স্বাতিও এসেছিল। আমি প্রথম

শ্রেণীর টিকিট কাটি নি, কেটেছিলুম তৃতীয় শ্রেণীর। মামা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এখনও এই থার্ড ক্লাসে চড়বে!

বলেছিলুম, চিরদিন যাতে এই ক্লাসে চড়তে পারি সেই আশীর্বাদ আপনি করুন।

মামা আরও বিস্মিত হয়েছিলেন, আর স্বাতি বলেছিল, কোথাকার টিকিট কাটলে?

এলাহাবাদের টিকিট শুনে স্বাতি হেসেছিল। আর আমি বলেছিলুম, হাসলে যে?

স্বাতি এর উত্তরে বলেছিল, নিজের কর্তব্য স্থির করতে এত দেরি হয় তোমার!

এলাহাবাদে জ্ঞানশঙ্করবাবুর উত্তরাধিকারীরা একজনের পর একজন মারা গেছে। এ আমি জেনে এসেছি। বিশ্বাস করেছি যে তারা বাঁচে না। কিন্তু তাই বলে একে দৈব অভিশাপ বলে মানতে পারি নি। আমার কুসংস্কার নেই। তাই আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হতে ভয় পাই নি।

কিন্তু এর পরিণাম আমি জানি। স্বাতি আমাকে পরিত্যাগ করবে ঘৃণায়। আদর্শভ্রষ্ট পুরুষকে সে তো ঘৃণাই করে। তার বদলে হয়তো কিছু পাব—অর্থ প্রতিপত্তি, আর মিত্রা নামের সেই মেয়েটিকেও পেতে পারি। আর পাব একটা কৃত্রিম জীবন। যদি না নামি, যদি এ সমস্তকে অস্বীকার করে চলে যাই, তা হলে কী পাব তা জানি না। কিছুই কি পাব না?

কিন্তু ট্রেন এসে এলাহাবাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবার পর এ সব কথা ভাববার আর সময় ছিল না। কত লোক উঠছে আর কত নামছে, সে দিকে দৃষ্টি আমার গেল না। আমার শরীরে আর যেন শক্তি নেই, বেঞ্চির সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল দুর্বল দেহটা। বড় অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে, চারি দিকে চেয়ে কোনখান থেকে ভরসা পাচ্ছিলুম না।

দিল্লীতে গাড়ি ছাড়বার আগে স্বাত যেন কী বলেছিল আমাকে!

মনে আসছিল না। কিন্তু কেন মনে আসছিল না? ভাল লেগেছিল সেই কথাটি। মনে হয়েছিল, আমাব কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি, ভবিষ্যতের সমস্যা আমার সরল হয়ে গেছে।

বড় কর্কশ শব্দে ট্রেনের ঘণ্টা পড়েছিল, বাঁশি বেজেছিল। এলাহাবাদের আলোকিত প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন আবার অন্ধকারে যাত্রা করেছিল। স্বাতি ঠিকই বলেছিল, নিজের কর্তব্য স্থির করতে বড দেরি হয় আমার।

দিল্লী থেকে যাত্রার সেই ক্ষণটিও এখন মনে পড়ছে। ট্রেন ছাড়তে তখন আর দেরি ছিল না। মামা মামাকে প্রণামটা আমি সেরে নিলুম। স্বাতি একটু দূবে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে বলেছিলুম, তুমি কিছু বলবে না?

স্বাতি হেসেছিল।

আমি বলেছিলুম, হাসি নয় স্বাতি, তোমার কি কিছুই বলবার নেই? কিছু জানবার, কিছু শোনবার—

এর উত্তরেও স্বাতি হেসেছিল। ভারি মিষ্টি হাসি। কিন্তু আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে অস্পষ্ট ভাবে বলেছিল। তোমার মন কি কোনও কথা দেয় নি আমার মনের কাছে, যে আজও আমার মুখের কথার প্রয়োজন আছে!

কী আশ্চর্য! স্বাতি কি আমার মনটাও দেখতে পাচ্ছে, না নিজের মনের ছায়া দেখছে আমার মনের আয়নায়! সত্যিই কি আমার মন স্বাতিকে কোন কথা দিয়েছে!

৩০

পরদিন সকালের প্রথম বাসেই আমরা যাত্রা করলুম। বিনয়রা কত রাতে ফিরেছিল, আমরা তা জানতে চাই নি। পরমানন্দ্ই সবাইকে জাগিয়েছিল। হাবুলদা তার ওপরেই এ ভার দিয়ে রেখেছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে আমরা দেখেছিলুম যে পর পর কয়েকখানা বাস ছাড়বে। একটার পর আর একটা। কোম্পানী একটা নয় এবং প্রত্যেক কোম্পানীরই কয়েকখানা করে বাস আছে। গত রাতে যে বাস এসে পৌঁছেছে, তা আজ সকালে ছাড়ছে। আবার বিকেল বেলায় বীরগঞ্জে পৌঁছেও রাতে সেখানে বিশ্রাম নিয়ে সকালে ফিরবে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম। সেটা হল যে এই সব বাসের অবস্থা বেশ খারাপ। বাসগুলো পুরনো। ভিতরে অল্প জায়গায় বেশি আসন বলে বসার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তার উপর যান্ত্রিক গোলযোগ সারাবারও সময় নেই। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে বাস চলছে।

কাঠমাণ্ডু আসার পথে কে একজন বলেছিলেন যে পথে বিপদ আপদ না হলে বিকেলেই পৌঁছনোর কথা। বিপদ আপদ বলতে তিনি যান্ত্রিক গোলযোগ বুঝিয়েছিলেন। চলতে চলতে অনেক কিছুই ফেল করে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল। বাস পথে দেরি করেছিল কোন্ কারণে তা বুঝতে পারি নি, কিন্তু কোথাও আটকায় নি। এবারেও বোধহয় আটকাবে না, এই আশা নিয়েই আমরা দুর্গা নাম করে যাত্রা করলুম।

সেই একই পথে আমরা ফিরব—শহর ছেড়ে বিষ্ণুমতী নদী পেরিয়ে *ত্রিভুবন রাজপথ ধরে*। এবারে রামলাল আমাদের সঙ্গী

হন নি। চারি দিকে চেয়ে দেখলুম যে পরিচিত একজনও নেই। শুধু আমবাই আছি—আমরা পাঁচজন।

বিনয় নাকি প্লেনে ফিরতে চেয়েছিল। এখানে আসার সময় তার নাকি খুবই কষ্ট হয়েছে। তাই হাবুলদাকে বলেছিল, সে প্লেনে ফিরবে কাঠমাণ্ডুর গৌচার এআরপোর্ট থেকে বীরগঞ্জের সিমরা এআরপোর্ট পর্যন্ত। তারপর রক্সৌল থেকে আমাদের সঙ্গে ট্রে ই ফিরবে। নীরারও ভাল লেগেছিল এই প্রস্তাব। সে বলেছিল যে বিনয়েব সঙ্গে সেও প্লেনে ফিরবে। তাতে উপরি লাভ হবে তাদের, অর্থাৎ নেপালের আশ্চর্য সুন্দর গিবিশৃঙ্গগুলিও দেখা হয়ে যাবে। তারা টেলিফোনে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ প্লেনে জায়গা নেই, আগামী দু সপ্তাহ পর্যন্ত স্থানাভাব। তাই তাদের নিরস্ত হতে হয়েছে এবং এখন খুবই বিমর্ষ ভাবে বসে আছে।

এক সময়ে বিনয় বলল: এ সব ভদ্রলোকের জায়গা নয়।

হাবুলদা আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন?

পৃথিবীর সর্বত্র যখন ডিলাক্স বাস, তখন এখানে এই ব্যবস্থা!

বলে নিজেব হাঁটু দেখাল। সেটা সামনের সীটে লেগে আছে বলে সে পা ছড়াতে পারছে না।

পবমানন্দ আমাব পিছনে উবু হয়ে বসেছিল। বলল: আমাদের বেশ চলে যায়।

বেশ চলে যায়!

বলে বিনয় আশ্চর্য হয়ে তাকাল পরমানন্দের মুখের দিকে।

পরমানন্দ বলল: সাবা দিন তো আমরা আরামে বসে থাকতে পারি না, মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের রোজগাব করতে হয়।

বিনয় বলল: বোজগাবের জন্যে সবাইকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। কিন্তু তাই বলে আরাম করে বসতে কী বাধা আছে!

পরমানন্দ বলল: আমাদের দেশেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন, তা তোমার মনে আছে তো বিনয়দাদা?

কী বলেছেন ?

আরাম হারাম হ্যায়।

ওটা সব দেশনেতারই মুখের কথা, নিজেরা কখনও এ কথায় বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু পরমানন্দ বলল: তা ঠিক নয় বিনয়দাদা, পণ্ডিতজী কাজ না করে আরাম করতেন, এ কথা তাঁর শত্রুতেও বলবে না। আমি দেখেছি তাঁকে। আমার আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, আর শুতে গেছেন সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর। হ্যাঁ, আমার মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভুরা তিনি কখনও তৌলেন নি।

হাবুলদা বলল: তৌলেন নি নয়, ওজন করেন নি।

পরামানন্দ বলল: দুটোই কিন্তু একই কাজ হাবুলদাদা। আমরা তৌল করি, তোমরা ওজন কর। আর পণ্ডিতজী এই গরিব দেশটার জন্যে ভেবে ভেবেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। হ্যাঁ, তাঁর ঘরে হয়তো ঠাণ্ডা মেশিন ছিল, আর মাথার ওপরে পাখাও চালিয়েছেন একই সঙ্গে। কিন্তু তাঁরও মাথার ঘাম পায়ে পড়েছে, দুঃখে কষ্টে তাঁরও চোখের জল পড়েছে। সে নিজের দুঃখে কষ্টে নয়, এই গরিব দেশের মানুষের দুঃখে কষ্টে। দেশের মানুষের দুঃখই তাঁর নিজের দুঃখ ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে এই দুঃখ দূর করতে হলে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দেবতার পূজা করলে চলবে না, মেহেনৎ করতে হবে। কাজে ফাঁকি দিলে চলবে না, যার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুই তার কাজ। কানে রাম চন্দ্রজীর মন্ত্র না দিয়ে তিনি দিয়েছিলেন দেশ গড়ার মন্ত্র —আরাম হারাম হ্যায়।

হাবুলদা সবিস্ময়ে বলে উঠল: এ সব তুই কী বলছিস পরমানন্দ ?

পরমানন্দ বলল: আমি তো মূর্খ আছি হাবুলদাদা, লেখাপড়া শিখি নি। আমার বাবা বললেন, এ দেশের কটা লোক লেখাপড়া জানে রে, যে লেখাপড়া না শিখলে তুই বাঁচবি না! এ দেশের লোকে

খেতে পায় না, তাদের পেটে ক্ষিধে। কী ভাবে বাঁচতে হবে তাই শেখাতে হবে এদের। মানুষকে কাজ করে খেতে হবে, কাজ করে খাওয়া শেখাতে হবে সবাইকে। কাজে কখনও ফাঁকি দিস না। বাবার কথাটাই আমি মেনে নিয়েছি।

হাবুলদা বলল : এ সব কথা তো তোর মুখে কোনদিন শুনি নি।

পরমানন্দ বলল : এ সব তো বলবার মতো কথা নয় হাবুলদাদা, তাই বলি নি। আমার বাবাকে তোমরা চেন না, আমরা চিনি বলে তাঁর কথা আমরা ঠেলতে পারি না। দেশে তাঁর বাবা মা ছিল না, অনাথ ছিলেন তিনি। দুবেলা খেতে পান নি কোন দিন। তারপর মারধোর করে তাঁকে বার করে দিয়েছিলেন তাঁর জ্যাঠা কাকারা। সেই ছেলে পেটের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে গোরখপুরে এসেছিলেন। একটা ভুবার দোকানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। এখন তিনিও একটা দোকানের মালিক। পুরনো মালিককে ঠকিয়ে তিনি মালিক হন নি। মেহেনৎ করে মালিক হয়েছেন। তিনিও বলেন, আরাম হারাম হ্যায়। আজও আমরা তাঁকে আরাম করতে দেখি না।

একটু থেমে বলল : তবে হ্যাঁ, কতগুলো ব্যাপারে তাঁর খুব গোঁড়ামি আছে। তিনি নিজেও আরাম করবেন না, অন্যকেও আরাম করতে দেবেন না। এটা আমার ভাল লাগে না।

কেন ?

মানুষের একটা স্বাধীনতা থাকা ভাল। নিজের মতটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোটা আমার ঠিক মনে হয় না। তাই না গোপালদাদা ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে বললুম : কাল কি রকম দেখলে বিনয় ?

বিনয় বলল : টেরিফিক। মনে হচ্ছিল, কোন বিদেশী হোটেলে এসেছি। যেমন সুন্দর ব্যবস্থা, তেমনি আবহাওয়া। তাই না নীরা ?

নীরা বলল : আমাদের পুরনো ট্যাক্সিটা না নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করেছিলে। ওটা ওখানে খুবই বেমানান হত।

আমি বললুম : তোমবা কি হেঁটে গিয়েছিলে ?

বিনয় বলল : পাগল নাকি ! একটা জাপানী ট্যাক্সি ধরেছিলাম, লাল রঙের ঝকঝকে গাড়ি। তাতে মিটার ছিল না। গিয়ে দেখলাম, দেশী বা পুবনো গাড়ি একখানাও নেই। সব গাড়িগুলোই বিদেশী। যেমন বড়, তেমনি সুন্দর।

বললুম : তোব কথা শুনে একটা মজাব কথা মনে পড়ছে।

হাবুলদা বলল : কী কথা ?

বললুম : গাড়ি কিনতে বেরিয়ে ইংবেজ নামী গাড়ি দেখে, জর্মনবা দেখে গাড়ির কলকব্জা, ইতালীয়নরা হর্ণ বাজিয়ে দেখে, আব অ্যামেবিকানবা নাকি গাড়িব আকার দেখে, বড় হলেই তাদের পছন্দ।

বিনয় হা-হা করে হেসে বলল : এখানে বোধহয় সবই দেখে। তাই গাডিব দাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমাদের দেশেব গাডি খুব কম। দেশটা সত্যিই বডলোকের দেশ। আর সেই জন্যেই তো বলছিলাম, বাসগুলো এ রকম বিশ্রী কেন !

আমি বললুম : এর উত্তর তো আমাদের জানা আছে ভাই। যাদের ঐ বকম গাড়ি আছে, তাবা এই বাসে চডবে না। নিজের গাড়িতে যাবে, নয় যাবে প্লেনে। এই বাস আমাদেব জন্যে, যাদেব গাড়ি নেই আর পয়সাও নেই উড়ে যাবাব। যাঁরা এই সব বাস চালাচ্ছেন, তাঁবা এ কথা জানেন বলেই ভাবেন যে একশো কুডি মাইল পথ পায়ে হাঁটতে হল না বলেই আমবা কৃতার্থ বোধ কবছি।

হাবুলদা বলল : তোরা দুজনেই আজ এক সুবে কথা কইছিস।

বললুম : হাবুলদা, সবাব সুব যদি এক হত তাহলে পৃথিবীটা অনেক সুখেব হত। যাঁরা এই বাস চালাচ্ছেন, তাঁদের অন্য সুব। জনকল্যাণেব নামে তাঁরা নিজেব কল্যাণের কথা ভাবছেন। জনতার সরকারের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা না এলে এই অবস্থার উন্নতি হবে না।

কিন্তু এ সব অবান্তর আলোচনা ছেড়ে কাল কাঠমাণ্ডুর বাজারটা কেমন দেখলে তাই বল।

এ কথার উত্তর দিল বিনয়, বলল : পকেটে যথেষ্ট পয়সা নিয়ে এখানে আসতে হয়। কলকাতায় যা পাওয়া যায় না, তা এখানে পাবি।

কী রকম ?

যে কোন ভাল ক্যামেরা এখানে পাবি, যে কোন দামী ঘড়ি, জাপানী ট্রান্সিস্টাব, আর টু-ইন-ওয়ানের ছড়াছড়ি। কোন্ দেশের জামা কাপড় কিনতে চাস ? টেবিলিন টেরিউল নাইলন স্ট্রেচ্লন কোন কিছুব অভাব নেই এখানে।

নীরা বলল : বিদেশী শাড়ি এখানে একটার চেয়ে একটা ভাল। কোন্টা ছেড়ে কোন্টা কিনব ?

পরমানন্দ্ বলল : বিদেশে শাড়ি তৈরি হয়, এখানে এসেই তা জানতে পারলাম গোপালদাদা। কিন্তু বিদেশে তো মেয়েরা শাড়ি পড়ে না ! আমাদের দেশের মেয়েদেব জন্যেই কি তৈরি হয় ?

ভারতে তৈরি শাড়িই এখানে বিদেশী ছাপ দিয়ে বিক্রি হয় কিনা জানি না। শুনেছি, সিঙ্গাপুর হংকং প্রভৃতি বড় বড় জায়গা থেকেও ভারতীয়রা শাড়ি কিনে আনেন।

পবমানন্দ্ বলল : নীরা তো শাড়ি কিনেছে, গোরখপুরে এ জিনিস পাওয়া যায় কিনা আমি খুঁজে দেখব।

গল্পগুজব করতে করতেই আমরা অগ্রসর হচ্ছিলুম। সকালের আলোয় মন আমাদের প্রসন্ন। যাত্রা কবেছি প্রথম বাসে, সকলের আগে বীবগঞ্জে পৌঁছে যাব এই আশা আছে মনে। আমাদের সঙ্গে স্থ একটি নেপালী পরিবারও চলেছে। বাসের পিছনের দিকে তারা এক সঙ্গে বসেছে জড়োসড়ো হয়ে। তারা যে শহরের লোক নয়, তা তাদের জামা কাপড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মনে হল, তারা শেষ পর্যন্ত যাবে না, কাছেই কোনখানে নেমে যাবে।

বিনয় আফসোস করে বলল : আমাদের কলকাতার কোন উন্নতি হবে না। এত দলাদলি থাকলে কি দেশের উন্নতি হয়!

এক বুড়ো ভদ্রলোক গরম চাদরে তাঁর মাথা ঢেকে বসেছিলেন বিনয়ের কাছাকাছি। তিনি যে তার সব কথা শুনছিলেন তা বোঝা গেল তাঁর উত্তর শুনে। পরিষ্কার বাঙলায় বললেন: ঠিকই বলেছেন। এই জন্যেই বাঙালী ছেলেরা আজকাল নেপালের সঙ্গে চোরাচালানের কাজে উঠে পড়ে লেগে গেছে। দেখতে পান না, নেপালের সব শহর থেকে তারা আপনাদের পছন্দ মতো জিনিস নিয়ে কলকাতার ট্রেনে চাপছে। কত নাম হয়েছে বাঙালী ছেলেদের! এমন কোন নেশার বস্তু নেই যা তারা পাচার করছে না।

একটু থেমে বললেন: হ্যাঁ, তবে নেপালীদের কাছেও একটা জিনিস শেখার আছে। নিজের পাপ পরের ঘাড়ে চাপানোর প্রথাটা। খবরের কাগজে পড়েন নি?

হাবুলদা উত্তর দিল: না তো!

ভদ্রলোক বললেন: নেপালের প্রয়াত রাজার শ্রাদ্ধ করে পুরোহিত কী উপহার পেয়েছিলেন জানেন না?

না।

এক ব্যাগ টাকা, তাতে কত হাজার ডলার ছিল তা কেউ জানে না। পরলোকগত রাজার সোনা ও রূপোর মুকুটের মতো মুকুট একটি করে, একটি হাতি একটি ঘোড়া ও নতুন গাড়ি একখানা। এরই সঙ্গে বাকি জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটতে পারে তার উপযোগী কয়েক বস্তা খাদ্য দ্রব্য। কিন্তু কেন এই উপহার জানেন?

হাবুলদা সুবিস্ময়ে বলল: না তো!

ভদ্রলোক বললেন: উপহারের সঙ্গে মৃত রাজার সমস্ত পাপ ঘাড়ে নিলেন সেই পুরোহিত। আর সেই সঙ্গে তিনি অস্পৃশ্যও হলেন। এক বছর তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হবে। এই সময়ে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি অস্পৃশ্য হয়েই যমরাজের দরবারে যাবেন শাস্তি নিতে, কিন্তু

কোন রকমে এই সময়টা পার করে দিতে পারলেই ফিরে এসে সমাজে বাস করতে পারবেন। তবে অস্পৃশ্য হয়েই তাঁকে থাকতে হবে, আর পাপের বোঝাও বইতে হবে সারা জীবন।

আমি বললুম: তিনি আর কারও ঘাড়ে এই পাপ চাপাতে পারেন না? এর কোন বিধান থাকলে বলুন, আমরাও সে চেষ্টা করি।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন: উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: উকিল এর বিধান দেবেন!

কেন! ডক্টর ফাউস্টের গল্প মনে নেই? ক্ষমতা ও জ্ঞানের লোভে দার্শনিক তাঁর আত্মাকে বিক্রি করেছিলেন শয়তানের কাছে। তারপর উকিলের বুদ্ধিতেই তো সেই আত্মা আবার ফিরে পেয়েছিলেন!

হাবুলদা হেসে উঠল হা-হা করে।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল। তারপরেই আমাদের বাস পথের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। একজন স্থানীয় যাত্রী বলে উঠলেন: শুরু হল।

কী শুরু হল, তা কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলুম। ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর নেমে চাকা বদলের কাজে লেগে গেল এবং আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করবার আগেই দু তিনখানা বাস পিছন থেকে সামনে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণের চেষ্টায় আমাদের নতুন চাকা ঠিক মতো লাগল। সেই স্থানীয় যাত্রী নিচে নেমে সব দেখাশুনো করছিলেন। বাস ছাড়বার আগেই তিনি উঠে মন্তব্য করলেন: কপালে আজ আরও দুঃখ আছে।

কেন?

বাড়তি চাকা তো একটিই। এটা মেরামত করে নিতে অনেক সময় লাগবে।

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। একটা লোকালয়ে সেই চাকাটা মেরামত করে নেওয়া হল। সেই অবকাশে আমরা কিছু খেয়ে নিলুম। তারপর বিকেলের দিকে আর একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেল।

এটা বদলানো গেল অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, অনেকক্ষণ ধরে। ইতিমধ্যে সমস্ত পিছনের বাস আমাদের দুর্দশা দেখে সামনে এগিয়ে গেল।

বিনয় বারে বারে ঘড়ি দেখছিল। বাস ছাড়তেই বলে উঠল: রক্সৌলের ট্রেন আর ধরা যাবে না।

সেই বাঙালী ভদ্রলোক বললেন: আজকের ট্রেন, না আগামী কালের ?

হাবুলদা হেসে উঠতেই তিনি বললেন: হাসবেন না। তরাই-এর জঙ্গলে যদি আর একটা চাকা ফাটে, তাহলে আজ রাতেই বাঘের পেটে যেতে হতে পারে। এ চাকা তো আর মেরামত হবে না, সকাল পর্যন্ত বনের মধ্যেই কাটাতে হবে।

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। এই চাকাটি বদলি করবার পরে ড্রাইভার খুব ধীরে খুব সতর্ক ভাবে এগোতে লাগল। লোকালয় তখন শেষ হয়ে গেছে, অন্ধকার নামছে অল্প অল্প করে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা তরাইএর জঙ্গলে প্রবেশ করব। আর একবার আমরা দুর্গানাম করলুম।

বাসে স্থানীয় যাত্রী আছেন অনেক। নানা স্থানে তাঁরা ওঠানামা করছেন। মাঝে মাঝে পিছন থেকে একটি শিশুর কান্নার শব্দ পাচ্ছিলুম। পিছন ফিরে দেখেছিলুম তাকে। তার মায়ের চেহারা দেখেই চিনেছি, সে নেপালের শিশু। সেও আমাদের সঙ্গে চলেছে তার মায়ের কোলে শুয়ে। পাশে বসে আছে তার যুবক পিতা। প্রসন্ন মুখশ্রী তাদের, ভালো লাগে দেখে। কিন্তু তাদের বেশভূষায় অভাবের চিহ্ন বড় প্রকট।

এক সময়ে অন্ধকার নামল ঘন হয়ে। চারিদিকে চেয়ে মনে হল, এ রাতের অন্ধকার নয়। আমরা বোধহয় বনের মধ্যে সহসা ঢুকে পড়েছি। এ তারই অন্ধকার। তরাইএর বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমরা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ এক সময়ে আমাদের বাস থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্ক দেখা দিল সবার মুখে। ব্যাপার কী? আবার চাকা বদলাতে হবে? কিন্তু আর তো তার উপায় নেই।

যাত্রীরা নেমে পড়লেন অনেকেই। আমিও নামলুম। সেই অভিজ্ঞ স্থানীয় যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম: বনের মধ্যেই কি আমাদের সারা রাত কাটাতে হবে?

তিনি বললেন: ভাগ্য ভাল থাকলে ব্যবস্থা একটা হবে।

কী ব্যবস্থা?

অনেক কষ্টে জেনেছি, পেছনে এখনও একটা বাস আছে। তার কাছে যদি একখানা চাকা পাওয়া যায় তো আমরা এগোতে পারব।

তা না পেলে

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বীরগঞ্জ থেকে বাস আসবে, তার কাছে সাহায্য পাব।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম দেখে ভদ্রলোক বললেন: এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন! রাতে বীরগঞ্জে পৌঁছে গেলেই আশ্চর্য হবেন।

কিন্তু অবস্থা এমন করুণ কেন?

ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন: দোষ নেই কারও। রাণাদের আমলে তাঁদেরই পরিবারের অনেকে এই সব বাস চালিয়েছিলেন। এখন জনতা শাসনে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন যে আজ বা কাল দেশের সরকার এ দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। তাই তাঁরা আর খরচ করতে নারাজ।

এ কথা সত্য কিনা তা আমার জানা নেই। এ তাঁর অনুমানের কথাও হতে পারে। তাই আমি অন্য দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলুম যে হাবুলদা নীরাকে পাঠালেন আমার কাছে। সে এসে বলল: এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?

বললুম: সময় কাটাচ্ছি।

একটু এগিয়ে চলুন।

বলে নীরা আমাকে বাসের পিছনের দিকে ট্রেনে নিয়ে গেল। দেখলুম, খানিকটা তফাতে বসে আছে সেই নেপালী দম্পতি তাদের শিশুকে নিয়ে। প্রসন্ন মুখে তারা গল্প করছে।

নীরা বলল ঃ একটা কথা বলবার জন্যেই ডেকে আনলাম।

বললুম ঃ বেশ তো।

নীরা ভাবল এক মুহূর্ত, তারপরে বলল ঃ আচ্ছা, আপনি কী করে ভাবলেন যে আপনি রাজী হলেই আমি আপনাকে বিয়ে করব?

প্রশ্নটা শুনে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হেসে উঠলুম। নীরা আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ হাসছেন যে?

বললুম ঃ হাসবার মতো কথা বলেই হাসছি। আমি কাউকে বিয়ে করতে চাইব কেন? আমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই?

আপনি বিয়ে করতে চান না?

বনের পাখি কি কখনও ইচ্ছে করে খাঁচায় ঢোকে? না নিজের পায়ে নিজেই বেড়ি পরে?

তবে সবাই আমার পেছনে লেগেছে কেন বলতে পারেন?

আমি জানব কী করে!

ঠিক এই সময়ে দূরে একটা গাড়ির হেড্‌লাইট দেখা গেল। যেন একটা বাঘ দুই জলন্ত চোখ নিয়ে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। যাত্রীরা যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ঝিমিয়ে পড়লেন সবাই। বাস নয়, একখানা বিদেশী মোটর গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বহু চেষ্টা করেও আমাদের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর গাড়িটা থামাতে পারল না।

গাছতলার সেই শিশু আবার কাঁদছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার কান্না থেমে গেল। বুঝতে পারলুম যে মা তার সন্তানের মুখ নিজের খোলা বুকে চেপে ধরেছে। অমৃতের আস্বাদ পাচ্ছে শিশু। এই অমৃত এখনও শুকিয়ে যায় নি। অবিচারে অভাবে অনটনেও মায়ের

বুকে এখনও এই অমৃতের সঞ্চার হয়। এই অমৃতের আস্বাদ পেয়েই মানুষ বড় হয়, বাঁচিয়ে রাখে এই জরাগ্রস্ত পৃথিবীকে।

নীরা বলল: শুনেছি, আপনি বই লেখেন। কিন্তু আমার কথা আপনি লিখবেন না।

কেন?

আমার সম্বন্ধে ভাল কিছু আপনি লিখতে পারবেন না জানি। তাই না লেখাই ভাল।

বললুম: তোমার বিয়ের খবর পাবার পর আমি নেপাল ভ্রমণের কথা লিখব তোমার নাম পাল্টে দিয়ে। দরকার হলে পরমানন্দের নামটাও পাল্টে দেব।

কথা দিলেন তো?

দিলুম।

আর এই কথা রাখবার জন্যেই নেপাল ভ্রমণের কথা আমি চেপে গিয়েছিলুম।

৩২

স্বাতি বলল : তারপব ?

তাবপব সত্যিই একটা বাস এসেছিল পিছন থেকে। আমাদেব দুর্দশা দেখে ড্রাইভাব নিজে থেকেই দাঁড়াল। তাব গাড়িব যন্ত্র বিগড়েছিল বলে সে পিছিযে পড়েছিল। সেই বাসেবই একখানা চাকা ধাব কবে আমবা বীবগঞ্জে এসে পৌঁছেছিলুম অনেক বাতে।

তাবপব কলকাতায় ফিবেছিলে, এই তো!

বললুম : হ্যাঁ। আব সেদিন সেই অবণ্যেব অন্ধকাবে একান্তে নির্জনে নীবাকে যে কথা দিযেছিলুম, সে কথা আমি বেখেছি। ফিবে এসে নেপালেব কথা লিখি নি। মগধেব কথা লিখতে বসেও সত্য কথা লুকোবাব জন্যেই মিথ্যা বলেছিলুম। সে বোধ হয় নিজেব প্রতিশ্রুতি বাখতে। আজ আব তা লুকোবাব কোন প্রয়োজন নেই। খবব পেযেছি, নীবা বিয়ে কবেছে পবমানন্দ্‌কেই।

এত দিন পবে ?

হ্যাঁ, তাব বাবা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন পবমানন্দ্‌ নীবাকে বিয়ে কবতে পাবে নি। তাঁব মৃত্যুব পবেই বিয়েটা হল। হাবুলদাব চিঠিতে জেনেছি, সেবিব্রাল থ্রম্বসিসে তিনি মাবা গেছেন।

সবাইকে নিয়েই জীবনটা ভাল, কাউকে বাদ দিয়ে নয়।

বললুম : তাব উপায় নেই। আমাদেব শিক্ষায় একটা গলদ ঢুকে পড়েছে। আমবা সবাইকে ভালবেসে একজনকে পাচ্ছি না, অথচ একজনকে ভালবেসে সবাইকে হারাচ্ছি। ভালবাসায় স্বার্থপরতা থাকে বলেই এমন হয়।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নেপাল পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণ-কাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণ-কাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্রপুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাংলার ভ্রমণ সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটা শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্লাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গল-

গিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম বর্কলা পেরিয়ার অভয়ারণ্য। যমজ শহর এর্নাকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত পরিহাস-প্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদা বোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জীর সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে মামা মামী ও স্বাতির কথা স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে এসেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বর ও কোনারকে গোপাল শূন্যতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে**

শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে, তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউসবোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রার সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর পাওয়া যাবে কিছু স্বল্পপরিচিত অঞ্চলের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে বাঙলা দেশের বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাংলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দু বেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব…

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীব ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তাব বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তবাখণ্ড হল হিমালয়েব হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রাব প্রণামে নন্দিত কেদার-বদবীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

মরুভারত পর্বে ভারতের বিখ্যাত থব মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল —বিকানেব থেকে যোধপুর ও জয়সলমেব, তাবপরে আরব সাগবের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীব কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তেব পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবাব জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহবে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর **কিষ্কিন্ধ্যা পর্বে** রামায়ণের যুগ থেকে শুরু করে বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত হায়দ্রাবাদের গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে বিদর, বিজাপুর ও গুলবর্গার ইতিহাস, বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গুহামন্দিরের পরিচয় এবং প্রাচীন বিদর্ভের পৌরাণিক কথাও আলোচিত হয়েছে।

অরণ্য পর্বে সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চলের কথা আলোচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ভ্রমণের পথে। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও কুর্গের অধিবাসী কোডাভাদের জীবন চিত্র এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ।

তারপর নেপাল পর্ব নয়, নেপাল পর্ব তার আগের ঘটনা। মগধ পর্বের পর যে কেন লেখা হয় নি, সেই কথা বলা হয়েছে নেপাল পর্বেই। ব্যক্তিগত কারণে লেখক এই ভ্রমণের কথা গোপন রেখেছিলেন। এতে আছে আদি কবি বাল্মীকির নায়িকা সীতার জন্মস্থান জনকপুর ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, আছে শৈবতীর্থ পশুপতিনাথ ও বৈষ্ণবতীর্থ মুক্তিনাথ এবং কাঠমাণ্ডু ও পোখরা উপত্যকার দর্শনীয় স্থানেব সঙ্গে অপার মহিমান্বিত হিমালয়ের কথা।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক